ডঃ হানাফী রাযী

ডঃ হানীফা রাযী

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর ফিকাহ্

আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর ফিকাহ্
মূল ডঃ হানীফা রাযী
অনু ঃ আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন ঃ ৫৯
ইফাবা. প্রকাশনা ঃ ১৫৫৬
ইফাবা. গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৩৯৫
যিলকাদ ১৪০৮
জুলাই ১৯৮৮

প্রকাশক
মুহম্মদ মুনসুর উদদৌলাহ্ পাহ্লোয়ান

সম্পাদক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা

মুদ্রণে
আদর্শ মুদ্রায়ণ
৯/১০ নন্দলাল দত্তলেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বাঁধাইকার
হাতেম এন্ড সন্স
রূপচাঁদ দাস লেন, ঢাকা

প্রচ্ছদ অংকনে
সরদার জয়নুল আবেদীন

মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা

HAZRAT ABDULLAH IBN MASUD (R.) O TAR FIQAH
Written by Dr. Hanifa Raji in Urdu and translated by Abul Bashar Muhammad Syful Islam into Bengali and Published by Islamic Foundation Bangladesh Dhaka.

Price Tk.35.00 U.S. Dollar 2.00 July-1988

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর ফিকাহ্‌

সূচীপত্র

আমাদের কথা

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রথম স্তরের সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ইসলামের আদর্শের প্রতি উজ্জীবিত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আরবের আকাশ-বাতাস, মরু বিয়াবান, যখন মূর্তি পূজা ও হাজারো অনাচারে লিপ্ত; অত্যাচার-পীড়নের ভয়াল পরিবেশ প্রতিমা পূজার নিন্দাবাদ করাটা তখন ছিল নিজকে মৃত্যুর কঠিন হস্তে অর্পণ করার নামান্তর। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহচর্যের দীপ্ত পরশে ঈমানী তেজে বলীয়ান হয়ে উঠেন, মক্কার কাফিরদের সামনে আল-কুরআনের চিরন্তন বাণী তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানী দীপ্তি প্রদর্শের এক জ্বলন্ত নজীর স্থাপন করেন।

বস্তুত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী হওয়ার সাথে সাথে দীনের বিভিন্ন আহকামাত সম্পর্কে তাঁর ছিল সীমাহীন বুৎপত্তি। বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা ছাড়া, সৎকর্মে সাহসী পুরুষ সর্বোপরি একজন অভিজ্ঞ ফকীহ্ হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বজন-বিদিত। দীনের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া হলো বুনিয়াদীভাবে, কুরআন, সুন্নাহ্, ইজ্‌মা ও কিয়াস। সাহাবায়ে কিরাম দীনের বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকায় এসে ইজ্‌তিহাদ ও কিয়াসের বা আইনসমূহের প্রবর্তন করেছেন। দীন সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদ ও প্রজ্ঞা-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান সাহাবী। ফিকাহ্ সম্পর্কে তাঁর সীমহীন ব্যুৎপত্তি ছিল বলেই দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে কূফার প্রধান বিচারপতি ও গভর্নরের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করে ছিলেন। কুরআন-হাদীস

ও ফিকাহ্‌র ক্ষেত্রে ইবনে মাসউদ (রাঃ) যে অভূত পূর্ব অবদান রেখেছিলেন, বর্তমান গ্রন্থটিতে এ সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। "হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও তাঁর ফিকাহ্‌" বইটি অনুবাদ করেছেন আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। অনুবাদ কর্ম অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অনুবাদের দিক থেকে বইটি কতটুকু সার্থক হয়েছে তার দায়িত্ব পাঠকদেরই। তবে বিষয় বস্তুর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রকাশনার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। বইটি অধ্যয়ন করে পাঠক সমাজ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের (রাঃ) ফিকাহ্‌ সম্পর্কে উপলব্ধি লাভে সক্ষম হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রচেষ্ট কবুল করুন। আমীন।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ও তাঁর ফিকাহ্

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম, আবদুল্লাহ্।[১] পিতার নাম, মাসউদ।[২] বংশ পরম্পরা এরূপ- আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বিন গাফিল বিন হাবীব বিন শামাখ বিন মাখজুম বিন ছাহেলা বিন কাহিল বিন আল-হারিছ বিন তামীম বিন সা'দ বিন হুজাইল[৩] বিন মুদরিকা বিন ইল্‌ইয়াস বিন মুদার বিন নিজার বিন মায়াদ বিন আদনান। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর মাতার নাম উম্মু আব্‌দ। তাঁর

১. প্রাক ইসলামী যুগে আরবে এ নামটির বহুল প্রচল ছিল। এ নামের প্রায় চারশত সাইত্রিশ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ মহানবী (সা)-এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাঁদের অন্যতম। এ ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিনুল আ'স (রা) ও প্রিয়নবী (সা)-এর সাহাবী হিসাবে অধিক খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

(আল ইসাবা ৪০০ পৃঃ)

২. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা জাহবী ২০১ পৃষ্ঠা। আত্তবাকাতুল কুবরা—ইবনে সা'দ। মুস্তাদরাক হাকীম ৩য় খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা।

৩. সেকালে আরবে কাব্য চর্চা ছিল সমাজে প্রতিপত্তি লাভের অন্যতম উপায়। যে ব্যক্তি সাহিত্য চর্চা ও কাব্যে সমধিক প্রভাবশালী হ'ত কেবল সে ব্যক্তিই অবিসম্বাদিত গোত্রীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হ'ত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বংশেও অনেক প্রথিতযশা কবির জন্ম হয়েছিল। তাদের রচিত কবিতামালার একটা সংকলিত কাব্য গ্রন্থ বহু কাল ধরে আরবী পাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল। ইমাম আছমায়ীর মত প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নিকট ধারাবাহিক ভাবে হুজালী (হুজাইল গোত্রীয়) কবিদের রচনাসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। (—দেখুন, ইবনে খাল্লিকান কৃত তাবাকিয়াতু ইমাম শাফেয়ী) প্রাচীন সাহিত্যিকগণ ঐসব কবিতার বিভিন্ন শরাহ বা ভাষ্য লিখেছেন। সম্প্রতি ইউরোপ থেকে হুজলী কবিদের বিভিন্ন কবিতা ও তার ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। শরহু আশআ'রিল হুজালিয়্যীন নামক একখানা গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বংশের একশত সাইত্রিশ জন কবির কবিতা ও কাছিদা সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৮৫৪ সালে ইউরোপে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু সাঈদ হাসান বিন হাসান আস্কারী কর্তৃক রচিত আশআ'রুল হুজালিয়্যীন নামের হুজালী

মাতৃকুল পরিক্রমা এরূপ—উম্মু আব্দ বিনতে আব্দে উদ্দ বিন ছাওয়া বিন কুরাইম বিন ছাহেলা বিন কাহিল বিন হারিছ। এ হিসাবে তাঁর মাতৃকুল পরিক্রমার পঞ্চম স্তর তাঁর পিতৃকুল পরম্পরার সপ্তম ধাপের সাথে মিলিত হয়েছে। অনেকে তাঁর মাতা সম্পর্কে এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, তিনি বনু জুহরা গোত্রীয়া ছিলেন। অবশ্য এ ভ্রান্তির কারণ হ'ল এই যে, তাঁর মাতার মাতৃকুল বনু জুহরা থেকে উদ্ভূত। মূলতঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর পিতৃ ও মাতৃকুল একই বংশের ভিন্ন দুই শাখার সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর পরদাদা গাফিল আইয়ামে জাহেলিয়াতে স্বীয় নানা শ্বশুর আব্দ ইবনুল হারিছ বিন জুহরার সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে[১] মক্কায় বসবাস শুরু করেন। হযরত আবদুল্লাহর নানী ছিলেন জুহরার প্রপৌত্রী। সে হিসাবে তাঁর মাতা উম্মু আবদের মাতৃকুল জুহরা বংশোদ্ভূত। মাসউদ বিন গাফিল মক্কায় বসবাস শুরু করলে পরবর্তীতে সকলের নিকট মক্কাই তাদের মৌল নিবাস হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। উম্মু আবদের মাতার নাম ছিল হিন্দা বিনতে আবদ ইবনুল হারিছ বিন জুহরা বিন কিলাব।[২] হারিছ বিন জুহরাকে যারা (উম্মু আবদের পিতৃ কুলীয়) হারিছ বিন তামীম থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেননি তারাই হযরত আবদুল্লাহর মাতা উম্মু আবদকে জুহরা বংশোদ্ভূত সাব্যস্ত করেছেন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেই আবদুল্লাহর পিতৃ বিয়োগ ঘটে।[৩] মাতা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মহানবী (সা)-এর কাছে যে সব ভাগ্যবতী রমণী বায়'আত করে চির ধন্যা হয়েছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ

কবিতার ব্যাখ্যা সম্বলিত বইখানা প্রকাশ পেয়েছিল। বাগদাদে আহমদ বিন-নাজী খালীজা আবদুর রায্যাক উক্ত গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ প্রণয়ন করত التمام فى تفسير اشعار هذيل مما اغفله ابو سعيد العسكرى নামে প্রকাশ করেছেন। আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বনু লাহইয়ান বনু হুজাইলেরই একটা শাখা। তাদের কবিতা ও সাহিত্যের কদর গোটা আরব জুড়ে ব্যাপৃত। সে হিসাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বংশটি আরবে একটি সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান বংশ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

১. তারীখে বুখারী, ইউরোপ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা ৫০৮১। তবকাতে ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড, মুস্তাদরাকে হাকীম ২য় খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠা।

২. তবাকাতে ইবনে সা'দ।

৩. ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা।

(রা)-এর জননী ছিলেন তাদের শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন প্রিয়নবী (সা)-এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের একনিষ্ঠা সেবিকা।[১] তবরী এবং ইস্তিয়াব গ্রন্থে ইবনে আবদিল বার বর্ণনা করেন[২]—

و روت انها باتت عندهم ليلة فقام النبى صلى الله عليه وسلم فرأته قنت فى الوتر قبل الركوع ۔

তিনি (উম্মি আব্দ) বর্ণনা করেন, এক রাতে তিনি নবী গৃহে অবস্থান করলে দেখতে পান যে প্রিয় নবী (সা) বিতরের নামাযে রুকুর পূর্বে দুআ কুনুত পাঠ করছেন।[৩]

তাঁর গোত্রে অন্যান্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর গোত্রে তাঁর ভাই উতবা ব্যতীত আরো সাত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতঃ মহানবী (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তারা হলেন—

১. উসামা আল হুজালী। ইনি হযরত আবুল মালীহ্-এর পিতা হুনায়নের যুদ্ধে বৃষ্টি বর্ষিত হলে তিনি বলেছিলেন —صلوا فى رحالكم তোমরা নিজ নিজ হাওদায় নামায আদায় করে নাও। এ ঘটনা তিনি নিজেই বিবৃত করেছেন। একদা তিনি মহানবী (সা)-এর সাথে একই সওয়ারীতে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। পথে উষ্ট্র হোঁচট খেয়ে পড়লে তিনি আচম্বিত বলে ফেললেন تعس الشيطان "শয়তান ধ্বংস হোক।" নিখিল বিশ্বের শিক্ষক মহানবী (সা) সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপদেশ দিলেন। ওহে! পদস্খলনের মুহূর্তে অভিসম্পাত করেও শয়তানের নাম নিও না। বরং বিসমিল্লাহ বল।

২. আবুল মালীহ আল হুজালী। তার পূর্ণ নাম আবুল মালীহ আমের বিন উসামা। পরবর্তীতে স্থানান্তরিত হয়ে তিনি বছরায় বসবাস করেছিলেন। صلوا فى رحالكم বা হাওদায় নামায পড়া সম্পর্কিত এ হাদীসটি তারই সূত্রে বর্ণিত।

৩. সালমা বিন মুহাবিক আল হুজালী জুন বিন কাতাদা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে পিতার নাম সখর। মুহাবিক একটি শব্দ সংকেত

---

১. তিরমিযী, বুখারী
২. তারীখে বুখারী
৩. কিতাবুল ইলাল—ইমাম তিরমিযী।

সূচক নাম, এমন বাহাদুর পুরুষের উপর এর ব্যবহার হয়ে থাকে যে ব্যক্তি স্বীয় শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতঃ তাকে নাজেহাল করে ফেলে। সে শত্রু অনন্যোপায় হয়ে বলতে থাকে انه يفرط اعداءه "নিশ্চয় এ ব্যক্তি দুশমনকে নাজেহাল করে দেয়" হুনায়নের সমর ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন। এ মুহূর্তে তাকে সংবাদ দেয়া হ'ল যে তার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে, সিনান নামের এ পুত্রের জন্ম সংবাদে তিনি আনন্দাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন—

بسم الله ارامية فى سبيل الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
احب الى مما يبشرونى به -

আল্লাহর শপথ! তোমরা যে জিনিসের শুভ সংবাদ দিচ্ছ তার চেয়ে মহানবী (সা)-এর পক্ষ হয়ে আল্লাহর পথে একটা তীর নিক্ষেপকে আমি অধিক ভালবাসি।

৪. আবু সিনান সাওয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল হুজালী।[১]

৫. মা'কাল বিন খুয়াইলিদ বিন ওয়াছেলাহ বিন আমর বিন আবুদে ইয়ালিল আল হুজালী।

৬. আবু গুররাহ বিন ইয়াহার বিন আবদুল্লাহ আল হুজালী[২], তিনি বসরায় জীবন যাপন করেন। বা'আতুর রিদওয়ানে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। خمسة لا يعلمها الا الله "পাঁচটি জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানেনা" এ হাদীসটি আবু গুররাহ বিন ইয়াহারের বর্ণিত।

৭. সুফিয়ান আল হুজালী, ইনি আবুযাহয়ানের জনক। আবদুল মুত্তালিব যখন আবরাহার নিকট গিয়েছিলেন তখন সুফিয়ান তার সঙ্গী হয়েছিলেন। ইনি একজন উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। একদা স্বীয় কবিতায় তিনি কুরায়শদেরকে ব্যঙ্গ করলে রাসূল করীম (সা) তাকে বারণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের অগ্রজ উতবা বিন মাসউদ একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সঙ্গে ছিলেন। এর পরে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন উহুদ ও তার পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

---

১. উসদুল গাবাহ ওয়াল আনছাব।

২. আল আদাবুল মুফরাদ

হযরত উত্‌বার ইন্তিকালের পর লোকেরা ইবনে মাসউদের নিকট তার সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি উত্তরে বলেন, উতবা আমার সহোদর হওয়ার সাথে সাথে ইসলামে আমার শ্রেষ্ঠতর বন্ধু ছিলেন। হযরত উমরের পর তিনিই আমার সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন।

সীরাতে মুহাম্মাদিয়ায় বলা হয়েছে যে, উতবা বিন মাসউদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। আলকামা বলেন যে, আমি হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে তদীয় অগ্রজ উত্‌বার রোগ সজ্জায় উপস্থিত হলাম। হযরত আবদুল্লাহ দেখলেন যে, অসুস্থতার দরুন উতবা সিজদা করতে পারছেন না বলে একটি পাখা উঁচিয়ে ধরে তার উপর সিজদা করছেন। হযরত আবদুল্লাহ তার হাত থেকে পাখা নিয়ে বললেন, "সম্ভব হলে যমীনে সিজদা করবেন অন্যথায় কেবল ইশারা দ্বারা সিজদা আদায় করবেন।" তবে সিজদার ইশারার রুকুর ইশারার চেয়ে অধিক নত হওয়া প্রয়োজন।

পিতৃ পদবী

রাসূল করীম (সা) তাঁর পিতৃ পদবী বা পারিবারিক নাম রেখেছিলেন আবু আবিদুর রহমান। সে অনুসারে হিজরী সত্তর সনে তাঁর একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর নাম রাখা হয় আবদুর রহমান। পূর্বে বলা হয়েছে যে, তাঁর মায়ের নাম ছিল উম্মু আবদ। এ জন্য তাঁর দ্বিতীয় পদবী ছিল ইবনু উম্মি আবদ আর এ দ্বিতীয় পদবীতেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন।[১]

গঠন প্রকৃতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বেঁটে আকৃতির এবং হালকা পাতলা গড়নের অধিকারী ছিলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল তাঁর গায়ের রং। তিনি খেজাব ব্যবহার করতেন না। তার ভ্রাতৃ পৌত্র উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন—

كان عبد الله رجلا آدم نحيفا قصيرا اشد الا دمة وكان لا يغير -

হযরত আবদুল্লাহ অতিশীর্ণ ও বেঁটে আকৃতির ছিলেন।[২] উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল তাঁর গায়ের। তিনি কখনো খেজাব লাগাতেন না।

---

১. মুস্তাদরাক হাকীম ৩য় খণ্ড ৩১২ পৃঃ। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ 'ইবনে উম্মি আবদ পদবীতে রাসূল করীম (সা) এবং সাহাবাদের যুগে অধিক পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আবু আবদির রহমান নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

২. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ১ম খণ্ড ২৩৩ পৃঃ।

ইবনে খুজাইমার ভাষায়—

كان عبد الله رجلا آدم عليه مسحة اعرابى لطيف الجسم خفيف اللحم
(كتاب الحج)

হযরত আবদুল্লাহ গৌরবর্ণের ছিলেন। তাঁর আকৃতিতে ছিল গেঁয়ো আরাবীর ছটা। অতি শীর্ণ দেহ ও হালকা ছিল তাঁর শরীর।[১]

তাঁর অলক গুচ্ছ ছিল অতি মোলায়েম-সৌন্দর্যের বাহার। কান পর্যন্ত তা এভাবে ঝুলে থাকত যে, কখনো তা অসংবৃত্ত হতনা। একটি চুল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে ডানে-বামে ছড়িয়ে পড়ত না। যুবাইর বিন ইব্রাহিম বলেন—

كان لعبدالله بن مسعود شعر مرفوعه على اذنيه كانما جعل بعسل ·

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চুল কান পর্যন্ত লটকে থাকত। দেখলে মনে হত যে এ গুলোকে মধু দিয়ে জমাট করা হয়েছে।[২]

মাঝে মাঝে তাঁর ঝুঁটি দীর্ঘায়িত হয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসত। নামাযের সময় তিনি এগুলোকে কর্ণদ্বয়ের পিছনে চেপে রাখতেন।

كان شعر عبد الله بن مسعود يبلغ ترقوته فرئيته اذا صلى يجعله وراء اذنيه ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের চুল কান পর্যন্ত ঝুলে পড়ত নামাযের মুহূর্তে তিনি এ গুলোকে কর্ণযুগলের পিছনে ভেজিয়ে রাখতেন।[৩]

তুলনামূলক ভাবে তার ভূঁড়ি কিছুটা স্থুল ছিল। পায়ের গোছা ছিল অতি ক্ষীণ। নিজের দৈহিক কৃশতা ও ক্ষীণ গোছার উপলব্ধিতে তিনি কখনো অনাবৃত হতেন না। উম্মু মূসা বলেন—

سمعت عليا يقول آمر النبى صلى الله عليه و سلم ابن مسعود ان يصعد شجرة فياتيه بشئى منها فنظر اصحابه الى حموشة ساقيه فضحكوا منها فقال النبى صلى الله عليه و سلم ما تضحكون لرجل عبد الله يوم القيامة فى الميزان اثقل من احد ـ

১. ইত্তিহাদুল মাহরাহ ফি আতরাকিল আশারাহ।
২. তবাকাতুল কুবরা কৃত ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড, ১১১ পৃঃ।
৩. তবাকাতুল কুব্রা কৃত ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ।

একদা হুযূরে আকরাম (সা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে একটি বৃক্ষ হতে কিছু (মিসওয়াক) পেড়ে আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি গাছে ওঠলে সাথীরা তার ক্ষীণকায় গোছা দর্শনে হাসাহাসি করছিলেন। মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, তোমরা হাসছ ? জাননা যে, কিয়ামতের দিন মীযানে আবদুল্লাহর গোছাদ্বয় উহুদ পর্বতের চেয়ে ভারী হবে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আনন্দোৎফুল্ল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মেধা ছিল অতি প্রখর। তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা।[২]

পোশাক

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাক পরিধান করতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার পরিচ্ছদ সর্বদা নির্মল ও নিদাগ থাকত। তার খাদিম নাফী বর্ণনা করেন—

كان عبد الله بن مسعود من اجود الناس ثوبا ابيض من اطيب الناس ريحا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং শুভ্র ফেনিল পোশাক পরিধান করতেন। উন্নত মানের সুগন্ধী তার খুবই প্রিয় ছিল।

আহার

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সাধারণ খাবার খেতে ভাল বাসতেন। আহারান্তে তিনি সাধারণতঃ খর্জুর ভিজান পানি পান করতেন। একদিন তার শিষ্য আলকামা বললেন, হযরত ! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর রহম করুন, জানতে চাচ্ছি যে, আপনি উম্মতের নেতৃস্থানীয় ও অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়েও খেজুরের পানি পান করেন কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, দেখ ! আমি মহানবী (সা)-কে খর্জুরাদ্রীত পানি পান করতে দেখেছি। যদি তাঁকে এরূপ করতে না দেখতাম তবে আমি কখনো এ পানি পান করতাম না।[৩]

চরিত্র

হযরত আবদুল্লাহ ধীর গম্ভীর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর গাম্ভীর্যতায় নীরস ও রুক্ষতার ছাপ ছিলনা বরং তাতে জ্ঞানী সুলভ ভারসাম্যতা ও আলিমানা বৈভব উৎকলিত থাকত। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও পর-

---

১. তবাকাতুস কুব্‌রা কৃত ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা।
২. সীরাতে আ'লামুন্‌নুবালা।
৩. মুসনাদে ইমাম আযম ২০১ পৃষ্ঠা।

নিন্দাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। এ ব্যাপারে কেবল মানুষই নয় নিকৃষ্ট পশুকেও অবহেলা করতেন না। তিনি বলতেন—

لو سخرت من كلب لخشيت ان اكون كلبا ـ

আমার সতত এ ভয় হয় যে, একটা কুকুরকেও যদি আমি বিদ্রূপ করি তবে হতে পারে সে পরিণামে আমাকেও কুকুর বানিয়ে দেয়া হবে।[১]

অথবা হাসি ঠাট্টা নিষ্ফল খেলাধুলা এবং অর্থহীন বাকবিতণ্ডাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যারা এসবে লিপ্ত হয় তাদের উপর নাখোশ হয়ে যেতেন। বলতেন—

انى لاكره ان ارى الرجل فارغا ليس فى عمل الأخرة ولا فى عمل الدنيا ·

যারা দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কাজে লিপ্ত না হয়ে বেকার সময় অপচয় করে আমি তাদেরকে পছন্দ করি না[২]

সুগন্ধীর প্রতি আকর্ষণ

প্রকৃতিগত সৌন্দর্য প্রীতির ফলে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অত্যধিক সুগন্ধী ব্যবহার করতেন। দিন-রাতে তিনি কোন পথ অতিক্রম করলে পরিবেশের সৌরভ মদিরতা মানুষকে জানিয়ে দিত যে, এ পথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পদ ছোয়া লেগেছে। এ বাতাস ইবনে মাসউদের পরশ পেয়েছে। হযরত তালহা (রা) বলেন - كان عبد الله يعرف بالليل بريح الطيب আঁধার রজনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে তাঁর সুগন্ধী দ্বারাই চেনা যেত।

মহানবী (সা)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

মহানবী (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভের কিছু পূর্বেই হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে উসমান বিন মুগীরা যায়দ বিন ওহাব থেকে ইবনে মাসউদের নিজ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, "আমি আমার পিতৃব্যগণের (বা গোত্রীয় কারো সাথে) সাথে খোশবু ক্রয়ের জন্য মক্কায় আসলাম। এখানে হযরত আব্বাস (তখন তিনি আতরের ব্যবসা করতেন) এর সাথে যমযমের কিনারে বসে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কীয় আলাপ আলোচনা করছিলাম। অকস্মাৎ দেখতে পেলাম যে, বাবুচ্ছফা থেকে এক সৌম্য মূর্তির

---

১. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ৩৫৪ পৃষ্ঠা।
২. হুলিয়াতুল আউলিয়া ১৩০ পৃঃ।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণীয় দীপ্তিমান পুরুষ এগিয়ে আসছেন। তার শুভ্র ধবল বর্ণে রুধীরাক্তের বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সম্মুখের দন্তরাজিতে আলোকজ্জ্বল ছটা। বুক থেকে নাভী পর্যন্ত দীর্ঘ একটি ক্ষীণ রোমজ রেখা অংকিত রয়েছে। পরিপুষ্ট হস্তদ্বয় ও ঘণ দীর্ঘ শমশ্রু বিশিষ্ট সে আগন্তুকের দেহে শুভ্র পরিচ্ছদ শোভা পাচ্ছিল। চতুর্দশী রজনীর প্রোজ্জ্বল চন্দ্র তার মুখাবয়বের কাছে হার মানছিল। তার ডান পার্শ্বে স্বল্প বয়সের একটি সুদর্শন বালক আর পিছনে-ছিল অবগুণ্ঠিতা এক রমণী। তাঁরা তিন জনেই হাজরে আসওয়াদের নিকটে এসে পালা ক্রমে উহাকে চুম্বন করলেন। অতঃপর সাত বার কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করতঃ রুকনে ইয়ামানীর সামনে এসে হাত তুলে দু'আ করলেন। তাঁদের মুখে তাকবীর ধ্বনী গুঞ্জরিত হচ্ছিল। তাদের নামায দর্শনে আমি বিমোহিত হচ্ছিলাম। মক্কায় এসে আমি এই এক অভিনব জিনিস দেখলাম। হযরত আব্বাসের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, এই সৌম্য মূর্তীর লোকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ এবং সাথের ছেলেটিও আমার আরেক ভাতিজা আলী বিন আবি তালিব। আর মহিলাটি হলেন বিবি খাদীজা—মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর সতী-সাধ্বী স্ত্রী। এরা তিন জনই হলেন সারা পৃথিবীতে নবতর ধর্মের অনুসারী।[১]

ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (সা)-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের আলোচনা এবং দ্বিতীয় সাক্ষাতের বিবরণ তিনি নিজেই বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন—

كنت غلاما يافعا ارعى غنما لعقبة بن ابى معيط فجاء النبى صلى الله عليه و سلم و قد فرا من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا فقلت انى ولست ساقيكما فقال النبى صلى الله عليه و سلم هل عندك جذعة لم ينز عليها الفحل قلت نعم فاتيتهما بها فاعتقلها النبى صلى الله عليه و سلم ومسح

---

১. মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃঃ, মুসনাদের বাক্যটি এরূপ انك عليهم معلم "তুমি তাহাদের শিক্ষক হবে।" সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা তবাকাতুল কুবরা কৃত ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড ১০৬ পৃঃ "আ'লামুল মুয়াক্কিঈন" নামক গ্রন্থে আল্লামা ইবনে কাইয়িম বলেন وشهد رسول الله عبد الله ابن مسعود انك عليهم معلم রাসূলে করীম (সা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে সুসংবাদ দিলেন যে, তুমি তাদের শিক্ষক হবে। ১ম খণ্ড ১৭১৬ পৃঃ।

الضرع و دعا فحفل الضرع ثم اتاه ابو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب ابوبكر ثم شربت ثم قال للضرع اقلص فقلص قال فاتيته بعد ذالك فقلت علمنى من هذا القول قال انك غلام معلم -

আমি এক উদীয়মান যুবক ছিলাম। উকবা বিন মুঈত্-এর বকরীপাল দেখা-শুনা (করে জীবনের ব্যয় তার নির্বাহ) করতাম। এক বার রাসূল করীম (সা) এবং আবু বকর (যাত্রাপথে) আমার নিকট আগমন করেন। তাঁরা উভয়ে মুশরিকদের অগোচরে পলায়ন করছিলেন। তাঁরা আমার নিকট দুধ চাইলে বললাম, (আমি ত বকরীর মালিক নই) এগুলো আমার নিকট আমানত রাখা হয়েছে, انى مؤتمن অতএব আমি আপনাদেরকে দুধ পান করাতে অক্ষম। হুযুর আকরাম (সা) বললেন, তোমার কাছে এমন কোন বকরি আছে কি যা এখনো নরের সাথে মিলিত হয়নি? বললাম আছে। আমি এ ধরনের একটি বকরী রাসূল করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে আসলে, তিনি উহা বেঁধে নিলেন এবং তার স্তনে হাত বুলিয়ে দু'আ পড়তে লাগলেন। ফলে স্তন দুদ্ধ পূর্ণ হয়ে উঠল। হযরত আবু বকর (রা) একটি গহ্বর পূর্ণ পাথর নিয়ে আসলেন। রাসূল পাক (সা) তাতে দুধ দোহন করলে প্রথমে আবু বকরও পরে আমি দুধ পান করলাম। অতঃপর রাসূল করীম (সা) স্তনকে লক্ষ্য করে বললেন, কুঞ্চিত হও। ফলে উহা সকুঞ্চিত হয়ে গেল। শেষে আমি রাসূল করীম (সা)-এর সমীপে আরজ করলাম হযরত আমাকে এই দু'আ শিখিয়ে দিন (যদ্বারা আমিও এই অলৌকিকতা দেখাতে সক্ষম হব)। মহানবী (সা) আমাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন - انك غلام معلم তুমি মহাগুরু হবে।

ঘটনাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তিনি পনর বিশ বছরের নবীন যুবক।

সাহাবীদের তালিকায় তাঁর স্থান

ইস্তিয়াব নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে—

كان اسلامه قديما فى حين اسلام سعيد بن زيد و زوجته فاطمة بنت الخطاب قبل اسلام عمر بزمان -

ইসলামের ডাকে যারা প্রথম সাড়া দিয়েছেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁদেরই একজন। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খাত্তাব তনয়া ফাতিমা

ও তাঁর স্বামী সাঈদ বিন যায়েদের ইসলাম কবুলের যমানায়ই তিনি ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নেন।[1]

মুস্তাদরাকে হাকীম ও তবাকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) যে দিন দ্বারে আরকামে প্রবেশ করেন তার পূর্বেই ইবনে মাসউদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।[2] তিনি নিজেই গৌরব দীপ্ত কণ্ঠে বলতেন "আমি ৬ষ্ঠ

---

১. মুস্তাদরাক ৩য় খণ্ড ৩১২ পৃঃ। তবাকাতুল কুব্রা ৩য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ

২. (দ্বারে আরকাম অর্থ আরকামের বাড়ী। নও মুসলিমের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে কোরেশদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তাই মুসলমান-দেরকে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য কোরেশদের অগোচরে মহানবী (সা) দ্বারে আরকামকে বেছে নেন। গোপনে গোপনে মুসলমানগণ এখানে জমায়েত হলে রাসূল করীম (সা) তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতেন। এভাবে আরকাম-গৃহ ইসলামের প্রথম মাদ্রাসা বা শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে—অনুবাদক)

আরকাম-গৃহে মহানবী (সা)-এর পদার্পণের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন প্রসঙ্গত সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দেয়া হ'ল। উল্লেখ্য যে, আরকাম ইসলামের ৭ম বা ১১ শ মুসলিম। সাফা পর্বতের পাদদেশে তিনি অবস্থান করতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তার গৃহেই মহানবী (সা)-এর মজলিস বসত। মহানবী (সা) এর দু'আর ফলে হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত পূর্ণ তিন বছর এখানে ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন করা হত—ইসাবা ১ম খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

(১) হযরত আবু বকর (রা) (২) হযরত আলী (রা) (৩) যায়দ বিন হারেছা (রা) এরা তিনজন সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন—তারীখে কামেল, তবাকাতুল কুব্রা। (৪) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। তিনি দাবী করতেন যে রাসূল করীম (সা)-কে নিয়ে আমিই তৃতীয় মুসলিম। (৫) আমর বিন উত্বা (রা) (৬) আবু জর গিফারী (রা) (৭) যুবায়র বিন আউয়াম ও (৮) খালিদ বিন সা'দ (রা)।

ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ গবেষণা অনুসারে এ চতুষ্ঠয়ের প্রত্যেককেই ৪র্থ বা ৫ম মুসলমান বলে উল্লেখ করেছেন। তারা এ কথাও বলেছেন যে, হযরত বিলাল (রা) এদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। (৯) আম্মার বিন ইয়াসির (রা) (১০) মিকদাদ (রা) (১১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) (১২) খাব্বাব ইবনুল আরাত। এ চতুষ্ঠয়ের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পর্কে এ দাবী উত্থাপন করতেন যে, আমিই ৬ষ্ঠ মুসলিম। হাফিয ইবনে হাজার অবশ্য ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে ইবনে হাব্বানের এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে, "তিনি পাঁচ জনের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (১৩) আর-কাম ইবনুল আরকাম (রা)। ইনি মতভেদে ৭ম অথবা ১১শ মুসলিম। (১৪) উসমান বিন আফ্ফান (রা) (১৫) আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) (১৬) আবু উবায়দা (রা) (১৭) সাঈদ বিন যায়দ (রা) (২০) কুদামা বিন মাজউন (রা) (২১) আব্দুল্লাহ

মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে মাসউদকে ৩৩ তম মুসলমান বলে উল্লেখ করেছেন। সিয়ারে আ'লা-মুন্নুবালা নামক গ্রন্থে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের তালিকায় ইবনে

বিন মাজউন (রা) (২২) আবু হুজাইফা (রা) (২৩) আমের বিন ফুহাইরা(রা) (২৪) আ'মার ইবনুল হারিছ (রা) (২৫) উবাদা ইবনুল হারিছ (রা) (২৬) আবু সালমা বিন আব্দুল্লাহ (রা) (২৭) খুনাইছ বিন হুজাফাহ (রা) (২৮) ওয়াকা বিন আব্দুল্লাহ (রা) (২৯) আমের বিন সাঈদ বিন মালিক (রা) (৩০) আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা) (৩১) আবু আহমদ বিন জাহাশ (রা) (৩২) আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রা)। এদের সকলের সম্পর্কে ইবনে সা'দ তাঁর তবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে বলেছেন যে,

اسلـــم قبـــل ان ىدخل صلى الله عليـــه و سلـــم دار ارقـــم -

দারে আরকাম মহানবী (সা)-এর আগমনের পূর্বে (এরা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আল্লামা জাহবী তার "সিয়ারে আ'লাম্মুন্নুবালা গ্রন্থে প্রাথমিক মুসলিমদের তালিকায় তিপ্পান্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। তাতে হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা) কে যথাক্রমে ৫২ ও ৫৩ তম মুসলিম হিসাবে পরিগণিত করেছেন। অবশ্য তিনি ঐসব সাহাবিয়ার নাম তালিকাভুক্ত করেননি যারা ইসলামের প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়েছিলেন। তাদের মাঝে আটজন তো এমনও রয়েছেন ইসলাম গ্রহণ হিসাবে যাদের উল্লেখিত সাহাবাদের অনেকেরই পূর্বে। তারা হলেন—(১) হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) (২) আসমা বিনতে আবি বকর (রা) (৩) আসমা বিনতে সালামা (রা) (৪) আসমা বিনতে আমীস (রা) (৫) ফাতিমা বিনতে আল-মুহাল্লালুল আমেরিয়্যাহ (রা) (৬) ফাকিহা বিনতে ইয়াছার (রা) (৭) রমালা বিনতে আবি আওফ (রা) (৮) আমীনা বিনতে খালফ খুজাইয়া (রা)। রাসূল করীম (সা)-এর মেয়েদের নাম এর সাথে সংযোজন করা হলে আরো চারটি সংখ্যা বেড়ে যাবে। সীরাতে মুহাম্মদীয়ায় প্রাথমিক মুসলমানদের তালিকায় আরো অনেক মহিলার নাম উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের সূচনা লগ্নের মুসলমানদের তালিকায় তাদেরকেই উল্লেখ করা হয় যারা দারে আরকামের বাহিরে মুসলমানদের পদচারনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আল্লামা জাহ্বী তাঁর সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠা হতে ১০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাদের একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার হযরত আবুবকর (রা)-এর ১ম মুসলিম হিসাবে আলোচনার প্রেক্ষিতে লিখেছেন—

ولـكن مراد عمار بـذالـك ممن اظهـر حيـنئذ اسلامه والا لـقـد
كان جماعة ممن اسلم لكنهم يخفونه من اقاربـهم وموالى اول سعد
انـه كان ثـلـث الاسلام و ذالـك بـالنسبة الى من اطـلـع على
اسلامه ممن سبـق اسلامـه -

মাসউদকে ১৭ তম মুসলিম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের সূচনালগ্নে যারা মহানবী (সা)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাদের মাঝে ইবনে মাসউদের স্থান কোথায়।

ইসলাম গ্রহণোত্তর উদ্যম ও প্রেরণা

ভয়াবহ এক পরিস্থিতিতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের হাতে কোন শক্তি ছিলনা। মক্কার মুশরিকদের নির্মম অত্যাচার—পীড়নের ভয়াল ঝুঁকিকালে প্রকাশ্য ভাবে মূর্তি পূজা অস্বীকার করা বা প্রতীমা পূজার নিন্দাবাদ করা নিজকে মৃত্যুর কঠিন হস্তে অর্পণ করারই শামিল ছিল। মহানবী (সা) ছাড়া আর কারুর সাহস হত না যে অগ্নি স্বভাব আরব কাফিরদের কর্ণ গহ্বরে পৌঁছে দেবে ইসলামের বাণী বা তাদেরকে শুনিয়ে দেবে বুতপরস্তির মুজাম্মাত। কিন্তু নবী সাহচর্যের দীপ্ত পরশে হযরত আবদুল্লাহ্‌র ঈমান বলীয়ান হয়ে উঠল। সত্য কথনের তীব্র প্রেরণা তাঁর অন্তরকে ভয় শূন্য করে দিল। একদা কথোপকথন প্রসঙ্গে মুষ্টিমেয় মুসলমান একমত হয়ে বলল যে, আমাদের কেউ উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে মক্কার কোরেশদেরকে শুনিয়ে দেবে। এ দুঃসাহসিক কাজটি কে সমাধা করবে? এ প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হল, তখন ঝট্ করে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্মুখে এগিয়ে এলেন, বললেন আমি এ কাজের জন্য নিজকে উৎসর্গ করলাম। সমস্ত মুসলমান আবদুল্লাহ (রা)-এর এ নির্ভীক ঈমানী দীপ্তি প্রদর্শনে হতভম্ভ হয়ে গেল। তারা সকলে বলে উঠল, তোমার এ প্রাণান্তিক কাজে

"কিন্তু আম্মার প্রথম মুসলিম দ্বারা যারা খোলাখুলি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কেবল তাদেরকেই বুঝাতে চেয়েছেন। অন্যথায় প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে এরূপ অনেকেই রয়েছেন যারা স্বীয় আত্মীয় স্বজনের কাছে নিজ ইসলামের কথা গোপন রাখতেন। ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ১৩ পৃঃ

মাওঃ কারামত আলী (রা) প্রণীত সীরাতে মুহাম্মাদীয়ায় ৫৩ জন প্রথম মুসলমানের তালিকা স্পষ্টভাবে প্রথিত হয়েছে। তবে প্রত্যেকেই যে নিজ সম্পর্কে তৃতীয় বা চতুর্থ মুসলিম বলে দাবী করতেন এর মূল কারণ হল যে, কোরেশদের অত্যাচারে জর্জরিত ইসলামের সূচনা কালে যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন তারা স্বীয় ঈমানের পরিপক্কতা সাধন পর্যন্ত ইসলামের কথা প্রকাশ করতেন না, ফলে মুসলমানগণ ও পরস্পরকে চিনতে পারত না তাই প্রত্যেকেই নিজ সম্পর্কে ধারণা করতেন যে, আমিই প্রথম ঈমান এনেছি। সামান্য চিন্তা করলেও ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হবে না।

অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয় বরং এ কাজ মক্কার প্রভাবশালী বংশের কারো হাতে সোপর্দ করা যেতে পারে। কেননা বিপদ মুহূর্তে স্বগোত্রীয়রা তার সাহায্যে এগিয়ে এসে মুশরিকদের অত্যাচার থেকে তাকে বাচাঁতে পারবে। কিন্তু দ্বীনি ব্যাপারে এই যথাযোগ্যতা ও যুক্তি বিচার আবদুল্লাহ-এর দুর্বার প্রেরণার বাঁধ সাধতে পারল না। তেজ দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "কাফিরদের অত্যাচার অবিচার থেকে সংরক্ষণের জন্য আমি আল্লাহ-কেই বেছে নিয়েছি। আল্লাহর কসম! তোমরা আমাকে এ সৌভাগ্য লাভে বারণ করো না।" পরদিন সূর্যোদয়ের পর মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জোড়ালো কণ্ঠে তিনি সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করতে লাগলেন। অদূরেই মুশরিক-দের এক মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, আবদুল্লাহ'র তেলাওয়াত তাদেরকে হতচকিয়ে দিল। পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "ইবনে উম্মি আবদ চিৎকার করে এ সব কি বলতে চাচ্ছ? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যারা অবহিত ছিল তারা উত্তর দিল "মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা-ই পাঠ করে শুনাচ্ছে। এ কথা যেন মজলিসে অগ্নি উৎক্ষেপণ করল। সীমাহীন রাগে তারা ফেটে যাচ্ছিল। উত্তেজিত বোলতার ন্যায় তারা ইবনে মাসউদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঘাতের পর আঘাত করে তাঁর গোটা শরীর চুরচুর করে দিল। তাঁর মুখমণ্ডল রুধীরাক্ত হয়ে গেল। মুশরিকরা অবিরাম ভাবে তাঁকে মেরে যাচ্ছিল কিন্তু তাঁর মহা সত্যের তেজ দৃপ্ত রসনা তবুও শুব্ধ হল না। অবশেষে অসহ্য পীড়নে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁর লহু রঞ্জিত দেহকে একটা রক্তাক্ত মাংস পিণ্ডের মত মনে হচ্ছিল। এভাবে বদবখ্‌তরা তাঁকে মৃত ভেবে ছেড়ে দিল। এক্ষণে হানাদারদের রোষ নিবৃত্ত হল। কিন্তু ঐশীলোকের ইলম আহরণে প্রোজ্জ্বল হ'ল যে পিদিম, তার আলো বিচ্ছুরণে এখনো ত এ বিশ্ব ঝলকিত হয়নি, তাই আল্লাহ তাঁকে নির্বান হতে দিলেন না, তিনি বেঁচে থাকলেন।

পাষণ্ডরা তাঁকে অচেতন অবস্থায় রেখে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসলে কোন রকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সঙ্গীদের নিকট পৌঁছলেন। সাথীরা কৃত্রিম গোস্বার সাথে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, এমন হতে পারে জেনেই তোমায় যেতে বারণ করে ছিলাম। কিন্তু শুনলে না, আল্লাহ্ তোমায় রহম করুন, দেখ তো ওরা তোমার সর্বনাশ ঘটিয়েছে। তিনি যদি দুর্বল ঈমানের অধিকারী হতেন বা ক্ষণিকের উত্তেজনায় বশবর্তী হয়ে নিজকে

এভাবে বিপদাপন্ন করতেন তা'হলে প্রিয়জনদের এ বন্ধু সুলভ তিরস্কারের জবাবে বলে উঠতেন, তোমরা ঠিকই বলেছিলে আমার এরূপ দুঃসাহস দেখান উচিত হয়নি। তোমাদের কথা মানলে আমার এ পরিণতি হতনা। কিন্তু ইসলামের এই নিষ্ঠাবান মুজাহিদ প্রিয়জনদের সহানুভূতিতে আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠলেন, বীরোচিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ। ওরা আজ আমার চোখে যেরূপ নিকৃষ্ট ও হেয়তর প্রতীয়মান হচ্ছে এরূপ আর কখনো ছিলনা। বলো তো আগামী কাল আরো উচ্চ কণ্ঠেকে কুরআনে পাক তেলাওয়াত করে ওদেরকে শুনিয়ে দেব। মাসউদের এই সঙ্গীন অবস্থা সত্ত্বেও তার ঈমানী জবা দেখে সাথীদের মুখে উচ্চকিত হল স্বতস্ফূর্ত মারহাবা, কিন্তু তাদের বন্ধু বৎসল হৃদয় তাঁর করুণ পরিণতির স্মরণ করে আরো ব্যথা বিদগ্ধ হয়ে উঠল। বললেন, রেখে দাও ইবনে উম্মি আব্দ। এই ত অনেক যে ওরা যা শুনতে চায়না তুমি নিজকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তা-ই ওদের কর্ণ কুহরে পেঁছিয়ে দিয়েছ।[১]

এই হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ইসলামী জীবনের প্রথম ধাপ। এতে তিনি যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ ছিল তাঁর সতত সঙ্গী।

মহানবী (সা)-এর একনিষ্ঠ খাদিম

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সর্বদা রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমত ও সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। রাসূলে পাক (সা)-এর গোটা জীবনে ইবনে মাসউদ ছিলেন তার নিষ্ঠাবান খাদিম। ইবনে সা'দ তাঁর তবাকাত গ্রন্থে লিখেছেন—[২]

عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان عبد الله يستر رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا اغتسل يمشى أمامه بالعصا حتى اذا بلغ مجلسه نزع نعليه فادخلهما فى ذراعيه واعطاه العصا فاذا اراد رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقوم البسه نعليه ثم مشى بالعصا امامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم

১. সীরাতে ইবনে হিশাম।

২. আত্-তবাকাতুল কুবরা কৃত ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

মহানবী (সা)-এর অবগাহন কালে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) পর্দায় আড়াল দিতেন। রাসূল করীম (সা)-এর সম্মুখে তিনি যষ্টি নিয়ে হাঁটতেন। রাসূল পাক (সা) মজলিসে পৌঁছে পাদুকা স্খলন করলে তিনি তা বগলে চাপা দিতেন। নসীহত করবার সময় তাঁর হাতে যষ্টি ফিরিয়ে দেতেন। নসীহত শেষে রাসূল করীম (সা) যাওয়ার ইচ্ছা করলে সম্মুখে পাদুকা সাজিয়ে দিতেন এবং যষ্টি নিয়ে সম্মুখে হাঁটতেন। এমন কি রাসূল করীম (সা)-এর হুজরায় ও ইবনে মাসউদ (রা) প্রথমে প্রবেশ করতেন।[১]

আবুল মালীহ বলেন, মহানবী (সা) নিদ্রা গেলে শেষ রাত্রে নামাযের জন্য জাগরিত করার দায়িত্ব ইবনে মাসউদের উপরই অর্পিত থাকত।[২] রাসূল করীম (সা) একাকী সফরে বের হলে তিনি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁর সাথে যেতেন। তিনি রাসূল পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে নবী করীম (সা) পারিবারিক আলোচনায় ও তাঁকে বসবার অনুমতি দিতেন। বলতেন, আমি নিষেধ না করলে তুমি যে কোন কথা শ্রবণ করতে পার। হাফিয ইবনে হাজার এ কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এ হলো ইবনে মাসউদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যদ্বারা তাঁর মর্যাদা ও কবূলত প্রমাণিত হয়। ঘরে বাইরের এই সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও সান্নিধ্যের প্রেক্ষিতে নবাগত সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে নবী পরিবারেরই একজন সদস্য মনে করতেন। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) তদীয় ভ্রাতার সাথে যখন ইয়ামান থেকে প্রথমবার মদীনায় এসে দরবারে নবুবীতে হাজির হলেন তখন ইবনে মাসউদের অত্যধিক আনাগোনা দর্শনে তিনি ভেবেছিলেন যে, ইনি হয়ত নবী পরিবারেরই একজন। পরবর্তীতে ইবনে মাসউদের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বর্ণনা করেন। মহানবী (সা)-এর এই সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের ফলে যে ব্যাপকতর ইলম ও জ্ঞান তার ভাগ্যে জুটেছিল তা-ই তার শিষ্যবৃন্দকে অন্যান্যদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছিল।

---

১. উমদাতুল কারী কিতাবুল ঈমানের بنی الاسلام علی خمس অধ্যায়ে বর্ণিত আছে

وهو صاحب رسول الله كان يلبسه فاذا جلس ادخلها فى ذراعيه

তিনি ছিলেন রাসূলের পাদুকাধারী, রাসূলের পায়ে তা পরিয়ে দিতেন এবং খুললে তা বগল দাবা করতেন।

২. আবুল মালীহ এর ভাষা এরূপ।

ويوقظه اذا نام و يمشى معه فى الارض وحشا

প্রথম হিজরত

মুসলমানদের উপর কাফিরদের অত্যাচারের মাত্রা যখন আরো বেড়ে চললো এবং তাদের নির্যাতনের ভয়ে পথে ঘাটে খোলাখুলি চলাফেরা মুশকিল হয়ে পড়ল, তখন রাসূল করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে হাবশার পথে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, "হাবশা রাজ অতি দয়ালু ও ন্যায় পরায়ণ। তোমরা সেখানে নির্বিঘ্নে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করতে পারবে। হুকুম পেয়ে মুসলিম নর-নারীর একটি মুষ্টিমেয় দল হযরত উসমান বিন মাজউন (রা)-এর নেতৃত্বে হাবশার পথে রওনা হয়ে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও এ দলের সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। নববী প্রদীপের এই আশেকান কে সেখান থেকে বহিস্কার করবার জন্যে মক্কার মুশরিকগণ হাবশা রাজের কাছে এদের অনেক নিন্দাবাদও করেছিল। কিন্তু ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ্‌র কাছে তাদের কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হয়নি। তিনি মুসলমানদেরকে সেখানে নিরাপদে থাকবার সুযোগ দিলেন। মুসলমানদের এ হিজরত নবুওতের পঞ্চম বৎসর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শা'বান ও রমযান এ দু'মাস তাঁরা সেখানে অবস্থান করেন। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ-তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তাঁরা সেখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন। ভেবে ছিলেন দুঃখ দুর্দশার দিন বুঝি শেষ হয়ে গেল। কাফিরদের হস্তক্ষেপ হতে নিরাপদ থেকে এক্ষণে শান্তিতে বসবাস করতে পারব। নির্বিঘ্নে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করবার সুযোগ পাব। কিন্তু পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আরো যোগ্যতর করে তুলতে চাইলেন। একটি বৃহত্তর জাতি সত্তার জন্য যে সব ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য এবং যোগ্যতার প্রয়োজন সে সবের পূর্ণতর বিকশনের জন্য তাদের আরো ট্রেনিং নিতে হবে। তাই পরিবেশের আনুকুল্যতা সৃষ্টিতে বিলম্ব হতে লাগল। মুসলমানদের হাবশায় অবস্থানের কিছু দিন অতিক্রান্ত হলে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। তাঁরা শুনতে পেলেন যে, মক্কার সমস্ত মুশরিক দীনে মুহাম্মদির উপর ঈমান এনেছে। এ জন শ্রুতির একটা কারণ এই ছিল যে, রমযান মাসে একদিন রাসূল পাক (সা) সূরা আন্‌নাজ্‌ম তেলাওয়াত করছিলেন এ সূরার একটা আয়াত—

افرئيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى الكم الذكر
ولـه الانثى تلك اذا قسمة ضيزى -

(তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত্ ও উজ্জা এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত[১] সম্পর্কে ? তবে পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে এবং আল্লাহর ভাগে কন্যা সন্তান ? এতো একটি অসংগত বণ্টন) এর মাঝে লাত্, মানাত এবং উজ্জার কথা উল্লেখ আছে আর সূরার শেষ ভাগে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, সবকিছু পরিত্যাগ করে তোমরা এক আল্লাহকেই সিজদা কর। তাঁরই উপাসনা কর। এ নির্দেশ পালনার্থে রাসূল করীম (সা) সাথে সাথে সিজদা করলেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁর অনুসরণার্থে সিজদাবনত হলেন। আল্লাহ পাক মুশরিকদের উপর এর প্রভাব বিস্তার করলে অথবা তাদের উল্লেখিত দেব দেবীর উদ্দেশ্যে তারাও সিজদায় পতিত হল।[২] দূর-দূরান্তে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পরবর্তীতে ইহা একটি গুজবের রূপ নেয় যে, মক্কায় মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। হাবশাবাস্থিত মুসলিমগণ এ গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। তাঁরা বিবেচনা করলেন যে, মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়েই আমাদের এ হিজরত। এক্ষণে ত তারা মুসলিম, অতএব এখন আমাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়। মোট কথা নেক স্বভাব ও সরলতার কারণে সাহাবায়ে কিরাম ঘটনার যাচাই ও সত্যানুসন্ধান করলেন না। তাঁরা নির্বিধায় মক্কায় রওনা হলেন মাহে শাওয়ালে। তাঁরা মক্কায় নিকটবর্তী হলে জানতে পারলেন যে ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। গত্যন্তর না দেখে তাঁরা পুনর্বার হাবশার পথ ধরলেন এবং কয়েকজন কারো কারো নিরাপত্তায় মক্কায় রয়ে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) চুপিসারে কিছুদিন মক্কায় কাটিয়ে পুনরায় হাবশায় চলে গেলেন।

দ্বিতীয় হিযরত

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত সম্পর্কে বর্ণনা করেন—

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشى ثمانين
رجلا انا وجعفر و ابو موسى و ابن هشام و عبد الله بن عرفطة
وعثمان بن مظعون و بعثت قريش عمرو و ابن العاص وعمارة
بن الوليد بهدية فقدما على النجاشى فلما دخلا سجدا له و

১. ইহা প্রাচীন আরবের তিনটি দেবীর নাম, এগুলোকে তারা আল্লাহর কন্যা সন্তান ভেবে পূজা অর্চনা করত—অনুবাদক।

২. ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৪২০ পৃষ্ঠা তাফসীরে সূরা আন্ নাজম।

ابتدراه فقعد واحد عن يمينه والآخر عن شماله فقالا ان نفرا من قومنا نزلوا بارضك فرغبوا عن ملتنا قال اين هم قالوا بارضك فارسل فى طلبهم فقال جعفر انا خطيبكم فاتبعو فدخل فسلم فقالوا مالك لاتسجد للملك ؟ قال انا لانسجد الالله قالوا ولم ذالك قال ان الله ارسل فينا رسولا وامرنا ان لانسجد الا الله وامرنا بالصلاة والزكاة فقال عمرو انهم يخالفونكم فى ابن مريم وامه قال جعفر نقول كما قال الله روح الله وكلمة القاها الى العذراء البتول التى لم يمسها بشر قال فرفع النجاشى عودا من الارض وقال يامعشر الحبش والقسيسين والرهبان مايزيدون مايسوءنى فى هذا اشهد انه رسول الله وانه بشربه عيسى فى الانجيل والله لولا ما انا فيه من الملك لاتيته فاكون انا الذى احمل نعليه واوضئه وقال انزلوا حيث شئتم وأمر بهدية الآخرين فردت عليهما – قال و تعجل ابن مسعود فشهد بدرا ۰

রাসূলে করীম (সা) আমাদের আটজনের একটি জামা'আতকে সম্রাট নাজ্জাশীর (দেশ হাবশায়) নিকট প্রেরণ করলেন। এ দলে আমি, জাফর, আবূ মূসা, ইবনে হিশাম, আবদুল্লাহ বিন আরাফাজাহ এবং উসমান বিন মাজউন (রা) অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কোরেশ নেতারা উমারো বিন্ অলীদ এবং আমর ইবনুল 'আসকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকনসহ সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণ করে। তারা সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করতঃ তাকে সিজদা করল এবং ঝটপট করে একজন সম্রাটের ডান পার্শ্বে অন্য জন তার বাম দিকে বসে পড়ল। আমাদের সম্পর্কে তারা নাজ্জাশীর নিকট অভিযোগ করল যে, রাজন ! আমাদের স্বজাতীয় একটি ক্ষুদ্র দল স্বধর্ম পরিত্যাগ করতঃ আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁরা এখন কোথায় ? তারা বলল আপনারই রাজ্যে। নাজ্জাশী তাঁদেরকে দরবারে উপস্থিত করবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন। হযরত জাফর (রা) সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি তোমাদের পক্ষ থেকে সম্রাটের সাথে আলোচনা করব।" তাঁরা এ কথা মেনে নিলেন। হযরত জাফর সঙ্গীদেরকে নিয়ে

রাজ দরবারে প্রবেশ করে সালাম দিলেন। প্রশ্ন করা হল "আপনারা বাদশার 'সম্মানার্থে' সিজদাবনত হলেন না কেন? হযরত জাফর (রা) উত্তর দিলেন যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করিনা। তারা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুক সিজদা করবনা। এ ছাড়া তিনি আমাদেরকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আমর ইবনুল 'আস বলে উঠল যে, ঈসা (আ) এবং তাঁর মাতৃ সম্পর্কে এদের বিশ্বাস আপনাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী। বাদশাহএ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হযরত জাফর (রা) বললেন, "আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যা বলেছেন আমরা তাই বলে থাকি। ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহ তা'আলার রূহ এবং তার কালিমাহ। আল্লাহ পাক তাঁকে (পার্থিব জীবনে অনীহ এবং নরের স্পর্শ বিবর্জিতা) কুমারী মায়ের নিকট প্রেরণ করেছেন। নাজ্জাশী মাটি থেকে একটা শুষ্ক কাঠ হাত নিয়ে (আবেগাপ্লুত কণ্ঠে) বললেন, শোন হে হাবশার জনতা! ওহে হাবশার জ্ঞানী গুণী, ধর্মগুরু ও ছুফী সাধক-বৃন্দ! তোমরা আপন আপন অভিমত ব্যক্ত কর। আমি জাফরের কথায় দূষণীয় কিছু পাইনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি (মুহাম্মদ (সা), আল্লাহ তা'আলার রাসূল। এত সেই মহাপুরুষ হযরত ঈসার ইঞ্জিলে যার সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী রয়েছে। আল্লাহর শপথ রাজ্যের অষ্টোপাশ যদি আমায় জড়িয়ে না ধরত, তবে আমি তাঁর পাদুকাধারী হয়ে এ জীবন ধন্য করতাম। আমি তাঁকে অজু করিয়ে দিতাম। সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "আপনারা আমার রাজ্যের যেথায় ইচ্ছা বসবাস করুন।" এর পর তিনি মুশরিকদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অতি শীঘ্রই হাবশা ছেড়ে মদীনায় আসেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।[১০] ফতহুল বারী কিতাবুত্তাফসীরের, সূরা আন্-নাজ্‌মের তাফসীরে ইবনে হাজার আস্কালানী বলেন:

قد جزم الـواقـدى بـأنـها كانت فى رمضان سنة خمس وكانت المهاجـرة الاولى الى الحبـشة خرجت فى شهر رجب فلما بـلـغهم ذالـك رجعوا فـوجدوهم على حالهم من الكفر فها جروا الثانـيـة -

১০ মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকীম, কিতাবুচ্ছাহাবা। সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা

ওয়াকেদী অতি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, ৫ম হিজরীর রমযান মাসে হাবশায় মুসলমানের দ্বিতীয় হিজরত সংঘটিত হয়। মক্কার মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কীয় একটি গুজব শুনে তাঁরা হাবশা ছেড়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কিন্তু মক্কায় ফিরে যখন তারা কাফিরদের কে পূর্বাবস্থায় বহাল দেখলেন তখন পুনর্বার হাবশায় হিজরত করেন।[১] (এটাই হাবশায় মুসলমানদের দ্বিতীয় হিজরত)।

ফতহুল বারীর অন্যত্র ইবনে হাজার আসকালানী বলেন—

فكانوا فى المرة الثانية اضعاف الاولى ولى و كان ابن مسعود مع الفريقين

হাবশার প্রথম হিজরতের তুলনায় দ্বিতীয় হিজরতে লোকসংখ্যা অনেক বেশী ছিল এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা) উভয় দলেই শরীক ছিলেন।[২]

তৃতীয় হিজরত

মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাফিরদের উৎপীড়ন অবর্ণনীয় ভাবে বেড়ে গেল। ইত্যবসরে আল্লাহ তা'আলা মদীনাধামে হিজরতের নির্দেশ দিলেন। রাসূলে করীম (সা)-সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় রওনা করতে বললেন। যাতে সেখানে বসে তারা নিশ্চিন্তে দ্বীনি দায়িত্ব আনজাম দিতে পারে। রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে সাহাবায়ে কিরাম চুপিসারে মদীনায় চলে গেলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যদি জীবিত থাকি তবে মদীনারই মাটিতে থাকব আর যদি আয়ু ফুরিয়ে যায় তবে সেখানেই সমাহিত হব মক্কার মাটিতে আর নয়।

মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের খবর শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মদীনাকে নিজ আশ্রয় ও আবাসভূমি বরণ করার জন্য তাঁর মন পাগলপারা হয়ে উঠল। তাই অতি শীঘ্রই তিনি হাবশা ছেড়ে মদীনাভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মদীনায় তিনি জাবাল্লে ইলম বা জ্ঞান-গিরি হযরত মুয়ায বিন জাবালের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এটা ছিল ইসলামের জন্য তাঁর তৃতীয় ও শেষ হিজরত।

---

১. ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৪৭৩ পৃষ্ঠা।
২. ফতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে

মক্কায় থাকা কালে রাসূলে করীম (সা) হযরত ইবনে মাসউদকে যুবায়র ইবনুল আউয়ামের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববী ও আযওয়াজে মুতাহ্হারাত (মহানবীর সতী সাধ্বী স্ত্রীগণ)-এর পৃথক পৃথক গৃহ নির্মাণসহ বিভিন্ন কর্ম ব্যস্ততায় রাসূলে করীম (সা)-এর দীর্ঘ পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়। (এবার তিনি আনসার ও মুহাজিরদের পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন ও বাৎসল্য পূর্ণ জীবন গড়ে তোলার প্রতি মনোনিবেশ করলেন) তিনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সূত্রে গেঁথে দিলেন। এভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং মুয়াব বিন জাবালের সাথে বন্ধন বা ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

বাড়ী তৈরী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বাড়ী বাঁধবার জন্য মসজিদে নববীর সংলগ্ন পশ্চাতের একখণ্ড জমি দেয়া হল। রাসূল করীম (সা) সকলের সাথে তার বাড়ির চৌহদ্দী নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা উত্‌বা বিন মাসউদ সেখানে বাড়ী তৈরী করেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন জা'দাহ বর্ণনা করেন যে, মদীনায় হযরত ইবনে মাসউদকে বাড়ী নির্মাণের জন্য যে জমি দেয়া হয়েছিল তার সন্নিকটে বনু জুহরার লোকজন বাস করত। তাদের কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদকে (তাচ্ছিল্য ভরে) বলল যে, ওহে ইবনে উম্মি আব্দ! তুমি আমাদের এ পাড়া ছেড়ে চলে যাও। এ কথা রাসূল করীম (সা)-এর কানে পৌঁছলে তিনি ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন যে, ইহা কক্ষণো হতে পারে না যে, আল্লাহ আমাকে নবুওতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখবেন আর আমি তোমাদের এই ঔদ্ধত্য এবং জুলুমকে বরদাশ্ত করে নেব। আল্লাহ তা'আলা সে জাতির কোন কল্যাণ করেন না যারা দুর্বলের হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মদীনা, কুফা এবং রমাদায় মোট তিনটি বাড়ী ছিল। তাঁর মদীনায় বাড়ীতে ইমাম মালিক স্বীয় যুগে ভাড়া থাকতেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি কুফাস্থিত বাড়ীতে বসবাস করতেন। রমাদার বাড়ীকে তিনি মেহমান খানা হিসাবে ব্যবহার করতেন।

ধর্মীয়-প্রীতি

ইলম ও পরিচালনা বিষয়ক সব ব্যাপারে তাঁর মশগুলিয়াত ও কর্ম-ব্যস্ততার কথা সম্মুখে আলোচিত হবে। এ ব্যাপক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে তিনি কখনো বিন্দুমাত্র অবহেলা করতেন না। ফরয নামায কাযা হওয়া ত অবান্তর ছিল। উপরন্তু তিনি অত্যধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় করতেন। নামাযের দিকে তাঁর মনের আকর্ষণের কথা এ বইয়ের অন্যত্র বর্ণিত হবে। যথা সময়ে নামায আদায়ের প্রতি তাঁর যত্নবান হওয়ার মূল কারণ ছিল রাসূল করীম (সা)-এর ঐ হাদীস যা তারই প্রশ্নের জবাবে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছিলেন, তিনি রাসূল পাক (সা)-কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ইরশাদ হয়েছিল الصلاة عن ميقاتها (সর্বোত্তম আমল হল) নামাযকে তাঁর যথা সময়ে আদায় করা। শ্রেষ্ঠতম আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়ার পর এ-ত কক্ষণো হতে পারে না যে, (রাসূল পাক (সা)-এর একজন সেরা সাহাবী হয়ে) তিনি নামাযের মাঝে ত্রুটি—বিচ্যুতি ঘটাবেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট আমল থেকে নিজ জীবনকে বঞ্চিত রাখবেন। তাই তো দেখি যে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা সংরক্ষণে তিনি জীবনে কোন দিন কারো পরোয়া করেননি।

সাহসিকতা

একদা কুফার আমীর অলীদ বিন উকবার মসজিদে আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। এ দিকে নামাযের সময় উপস্থিত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) আমীরের অপেক্ষা না করে নির্ভিকভাবে নামায পড়িয়ে দিলেন। এ কথা আমীরের কর্ণগোচর হলে তিনি ইবনে মাসউকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, একাজ কি আপনি সেচ্ছায় করেছেন না আমীরুল মু'মেনীনের অনুমতি ক্রমে ? এর জবাবে তিনি কোন অজুহাত না দেখিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বললেন যে, ইহা আমি আমীরুল মু'মিনীনের অনুমতি বা ইচ্ছা হয়েছে বলে করেছি এমন নয়। আল্লাহ তা'আলার কাছে ইহা খুবই নিন্দনীয় যে, তুমি নিজ প্রয়োজন সমাধায় লিপ্ত থাকবে আর এ দিকে মানুষ নামায না পড়ে অপেক্ষা ও ইন্তেজারের ক্লেশ ভোগ করবে।

নফল ইবাদতের প্রতি তাঁর উৎসাহ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অত্যধিক পরিমাণ নফল নামায পড়তেন। রাতের অধিকাংশ সময় তাঁর নামাযের মাঝেই অতিক্রান্ত হত। দিবসের বিভিন্ন

কর্ম ব্যস্ততা সত্ত্বেও নফল নামাজের জন্য তিনি সময় বের করে নিতেন। তাঁর এ নামাযে প্রীতি কেবল বৃদ্ধ বয়সেই ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর সেই নওজোয়ানীর কাল থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে নফল নামায পড়তেন। চাশ্‌ত নামায সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন مانمت الضحى منذ اسلمت ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো চাশ্‌তের নামায ছাড়িনি। নফল রোযার ও তাঁর এ মনোযোগিতা বহাল ছিল। তবে নফল নামাযের তুলনায় তিনি নফল রোযা কিছুটা কম রাখতেন। নফল নামাযের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তিই ছিল এর কারণ। আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বলেন—

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) কম রোযা রাখতেন, এমন আর কোন ফকীহকে আমি দেখিনি। আমি একবার তাঁর কাছে শুধালাম যে হযরত ! আপনি এত কম রোযা রাখেন কেন ? তিনি বললেন, আমি নামায অধিক ভালবাসি। রোযা রাখলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। তাতে আমার নামাযে ব্যাঘাত হয়।

مارئيت فقيها اقل صوما من عبد الله بن مسعود - فقيل له لم لا تصوم ؟ فقال انى اختار الصلاة عن الصوم فاذا صمت ضعفت عن الصلاة -

এতদসত্ত্বেও তিনি রমযানের রোযা ব্যতীত প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আশুরার রোযাও নিয়মিত ভাবে রাখতেন। তাঁর এই ধর্মপ্রীতি এবং ইবাদতের প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগিতার প্রভাবে গোটা পরিবার ধর্মীয় আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। সুবহে সাদিকের পূর্বে পূর্বে পরিবারের সকলেই জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যেত। ইবনে মাসউদ (রা) নিজেও সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকর আযকারে মশগুল থাকতেন। আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন—

একদা ফজরের নামাযান্তে আমরা ইবনে মাসউদের খিদমতে হাযির হলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা অনুমতি সূচক সালাম দিলে ভিতর থেকে সালামের জবাব ও প্রবেশের অনুমতি মিলল। আমরা ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থাকলে ভিতর থেকে এক বাঁদী এসে বলল, ভিতরে আসুন এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? আমরা তাঁর গৃহের ভিতরে প্রবেশ করলে দেখতে পেলাম যে, ইবনে মাসউদ (রা) আল্লাহ্‌র যিকরে লিপ্ত আছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে অভি-নন্দন জানালেন। বললেন অনুমতির পরেও দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? আমরা

বললাম, ভেবেছিলাম যে ভিতরে হয়ত কেউ শুয়ে থাকবে তাই অপেক্ষা করতেছিলাম। তিনি বললেন, ইবনে উম্মি আবদ-এর পরিজনকে আপনারা গাফিল ভাবছেন? পুনরায় তিনি যিকরে লিপ্ত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বাঁদীকে বললেন, দেখত সূর্য উঠেছে কিনা? সে উত্তর দিল যে, এখনো সূর্য উদয় হয়নি। তিনি পুনরায় যিকরে বসলেন। অতঃপর সূর্য উদয় হলে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। রমযান মাসে তাঁর ইবাদত ও যিকরের মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেত। শেষ দশ দিন তো কেবল নামায, তেলাওয়াত এবং যিকরের ভিতরই অতিবাহিত করতেন।

আবু আকবর বর্ণনা করেন যে, একদিন প্রত্যূষে আমি ইবনে মাসউদের খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখলাম, তিনি ছাদের উপর বসে আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলছেন "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যথার্থ বলেছেন" জিজ্ঞাসা করলাম সে-কি? তিনি বললেন মহানবী (সা) ইরশাদ করেছিলেন যে, রমযানের শেষ দশ দিনে তোমরা লায়লাতুল কদরকে সন্ধান করবে। আর চিহ্ন হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে, সে দিনের প্রভাত রবিতে প্রখরতা থাকবে না। আমি আজ স্বচক্ষে তা দর্শন করেছি।[১]

পারিবারিক জীবন

দ্বীন ও দুনিয়ার সঠিক ক্ষেত্রে তিনি পরিবার পরিজনকে স্বীয় রংয়ে-রাঙ্গিয়ে নিয়ে ছিলেন। ফলে তাঁর গৃহাভ্যন্তরে একটা পূর্ণতর দ্বীনি পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। নামায রোযা, সদকা যাকাত ও যিকর ছাড়াও উঠা-বসা, আহার আচ্ছাদন তথা সব ব্যাপারে তিনি নিজে যেরূপ আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নতের পায়রবী করতেন তদরূপ পরিবারের সবাইকে সে আলোকে চলবার দিক নির্দেশনা করতেন। স্ত্রী পুত্র সহ সকলের হক আদায়ে বিন্দু মাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করতেন না। তাদের সাথে বাৎসল্য সুলভ ব্যবহার করতেন। গৃহে প্রবেশকালে গলা কেশে নিতেন যাতে তাঁর আগমন সম্পর্কে সবাই সচেতন হতে পারে। কোন কিছু বলবার হলে স্বশব্দে বলতেন। এ সম্পর্কে আবু উবায়দা বর্ণনা করেন—

كان عبد الله مسعود بن اذا دخل الدار استانس و رفع كلامه كى يستانسوا ۔

"গৃহে প্রবেশের সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) অনুমতি চেয়ে

১. মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড ৪০৬ পৃঃ

নিতেন এবং উচ্চ আওয়াযে কথা বলতেন যাতে সবাই বুঝতে সক্ষম হয় যে তিনি অনুমতি চাচ্ছেন।[১]

মহানবী (সা) একবার মহিলাদেরকে দান-খয়রাত করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তা শুনে ইবনে মাসউদের স্ত্রী হযরত যয়নব (রা) তাঁকে বললেন যে, আপনার আর্থিক অবস্থা ত সচ্ছল নয়, কাজেই আপনি রাসূল পাক (সা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে, কোন স্ত্রী তার স্বামীকে দান খয়রাত করলে তা বৈধ হবে কি না? কেননা আমি যে সদকা করব ইচ্ছা করেছি যে তা আপনাকেই দেব। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) (সম্ভবত লজ্জা বোধের কারণে) অস্বীকার করলেন। বললেন তুমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নাও। হযরত যয়নব প্রিয় নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে দেখলেন যে, সেখানে এ প্রশ্ন নিয়ে আরো অনেক মহিলা উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আবু মাসউদের স্ত্রী যয়নব ও ছিলেন। তাঁরা হযরত বেলাল (রা)-এর মাধ্যমে রসূল (রা)-এর কাছে এ প্রশ্ন উত্থাপন করলে রাসূল করীম (সা) উত্তর দিলেন যে, বৈধ ত বটেই পরন্তু এতে দ্বিগুণ সওয়াব হবে, একতো সদকার সওয়াব এবং দ্বিতীয় হল আত্মীয় স্বজনের প্রতি হৃদ্যতার সওয়াব।[২]

অতিথি পরায়ণতা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) খুব অতিথি পরায়ণ ছিলেন। মেহমানের আগমনে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হতেন। তাদের আরাম ও শান্তির জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর মহৎ চরিত্র ও অভূদ আতিথেয়তায় অতিথিগণ সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। এর ফলে তার বাড়ীতে সর্বদা মেহমানের ভীড় জমত। রমাদা পাড়ার বাড়িটিকে মেহমান খানা হিসাবে ব্যবহার করা তার আতিথেয়তার এক বিরাট নিদর্শন।[৩]

বিনয় ও নম্রতা

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইলম ও আমলে শীর্ষ স্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যজনক বিনয় ও নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অগণিত শিষ্য

---

১. আত্তাবাকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ

২. মুসলিম শরীফ, কিতাবুয যাকাত।

৩. বুখারী ২৮৪২ পৃষ্ঠা।

ও ভক্তবৃন্দ যখন পিছনে পিছনে চলত তখন তিনি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠতেন। তিনি বলতেন, তোমরা যদি আমার গুনাহ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে তাহলে তোমাদের কেউ আমার পিছনে চলতে না বরং আমার মাথায় মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে যে যার পথে চলে যেতে। (তোমাদের এই সুধারনার কারণে) আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন।[১]

لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان ولحثيتم التراب على رأسي ولوددت ان الله غفرلي ذنبا من ذنوبي .

হারিস বিন সুয়াইদ বলেন যে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের খিদমতে তাঁর অগণিত ভক্ত জমায়েত হয়। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

والله الذي لا اله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي .

"ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তোমরা যদি আমার ইলমী যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে, তবে তোমরা আমার মস্তকে ধুলো নিক্ষেপ করতে।[২]

ইস্তিগনা ও মুখপেক্ষিহীনতা

দুনিয়া থেকে বেপরোয়া, অল্পে তুষ্টি এবং খোদা নির্ভরতায় ও হযরত ইবনে মাসউদের কোন উদাহরণ ছিল না। হযরত উসমান গণী (রা) তাঁর খেলাফত কালে ইবনে মাসউদের পরিত্যক্ত অজীফাকে পুণর্বার জারী করতে চাইলে তিনি অত্যন্ত বেনিয়াজীর সাথে তাতে অস্বীকৃতি জানান। পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর অনীহ ভাব এবং আল্লাহ তা'আলার উপর চরম নির্ভরশীলতাই এ অজীফা বর্জনে প্রেরণা জোগাচ্ছিল। তিনি আমীরুল মু'মিনীনকে বিনয়ের সাথে বললেন, আপনি হয়ত আমার বংশধরদের আগাম দৈন্যতার কথা ভেবে চিন্তিত হচ্ছেন। তবে শুনুন, আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি যে, (দারিদ্রতার জন্য ভয়-ভাবনা না করে) তোমরা প্রতি রজনীতে সূরা ওয়াকিয়াহ পাঠ করবে, কখনো অভুক্ত থাকবেনা।

১. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

২. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা।

দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধা

সত্যিকার একজন মু'মিনের কাছে এ পৃথিবী পরকালীন জীবনের শস্য ক্ষেত্র বৈ কিছুই নয়। হযরত আনাস বিন মালিক (রা) বলেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর ইন্তিকালের সময় হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর শয্যা পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। তাঁদেরকে দেখে হযরত সালমান ফারসীর গণ্ডদ্বয় বেয়ে অশ্রু ধারা নেমে আসে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ওগো রাসূল সহচর! কি-সে ব্যথা যা আপনাকে এভাবে কাঁদাচ্ছে? তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, হুযূর আকরাম (সা) আমাদের থেকে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছিলেন। আমি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারিনি। (হযরত সালমান ফারসী (রা) তাদেরকে নসীহত স্বরূপ সে প্রতিজ্ঞার কথা এভাবে ব্যক্ত করেন—

ليكن بلاغ احدكم من الدنيا كزاد الراكب واما انت ياسعد
فاتق الله فى حكمك اذا حكمت وفى قسمك اذا قسمت ·

"হে সা'দ! দুনিয়ার ধনসম্পদ থেকে তোমরা এতটুকু গ্রহণ করতে পার যা একজন পথিক তার পথ-খরচের জন্য সাথে নিয়ে থাকে। আর হে সা'দ! তুমি স্বীয় মীমাংসা ও ভাগ বণ্টনের মুহূর্তে আল্লাহ্‌র ভয়কে জাগরূক রেখ।"

মানুষকে উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন—

من اراد الاخرة اضر بالدنيا ومن اراد الدنيا اضر بالاخرة
ياقوم فاخروا الفانى للباقى -

যে ব্যক্তি পরকালের সফলতা কামনা করে সে দুনিয়ার জিন্দেগীতে ক্ষতি-গ্রস্ত হয় আর যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধি খুঁজে বেড়ায় সে পরকালীন জীবনের ক্ষতি সাধন করে। হে আমার স্বজাতি! তোমরা অনন্ত জীবনের কামিয়াবীর লক্ষ্যে ধ্বংসশীল এ দুনিয়ার সফলতাকে পিছনে রেখে দাও।

হযরত হান্জলাহ (র) বলেন যে, আমি অধিকাংশ সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদকে যেরূপ দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং পরকালের প্রতি যত্নবান পেয়েছি এমন আর কাউকে দেখেনি।[২]

---

১. ইসাবা—তাজকিরাতু আব্দিল্লাহিবনি মাসউদ। হুফ্ওয়াতুচ্ছফওয়াহ।
২. আত্ত্বাবাকাতুল কুব্‌রা ৩য় খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠা।

খোদাভীতি

আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং কিয়ামতের স্মরণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) অনুক্ষণ অস্থির উতলা থাকতেন। এ ভয় মাঝে মাঝে তাঁর অন্তরে এতবেশী জাগরূক হত যে, তিনি দিশেহারা ও সংকুচিত হয়ে যেতেন। একদিন এর কম ভয়-কাতর মুহূর্তে তিনি বলে উঠলেন—

وددت انى اذا مت لم ابعث

মৃত্যুর পর যদি আমি পুনরুত্থিত না হতাম তবেই ত আমার ভাল হত।

ক্রন্দন ও হৃদয়ের কোমলতা

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। আখিরাত, হিসাব-নিকাশ, শাস্তিও পুনরুত্থানের আলোচনা হলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন। তিনি এত অধিক ক্রন্দন করতেন যে প্রায়শঃই তাঁর নয়ন যুগল দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেত। তাঁর ক্রন্দনাধিক্য সম্পর্কে হযরত যায়দ বিন ওহাব বলেন—

رأيت بعينى عبد الله اثرين اسودين من البكاء

"আমি হযরত আবদুল্লাহর দু'চোখে দুটি কালো দাগ দেখিছি যা তাঁর অতিরিক্ত কান্নার ফলে চিহ্নিত হয়েছিল।"

মহানবী (সা)-এর যুগে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)

হযরত ইবনে মাসউদের ইলম আহরণ ও ইলমের প্রচার প্রসারে তাঁর কর্মলেখ্য একটি স্বতন্ত্র পাঠে তুলে ধরা হবে। এখানে তাঁর জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করা হল।

ইসলামী দায়িত্ব-কর্তব্য ও হুকুম আহকামের মধ্য সব চেয়ে কঠিন হল জিহাদ। কিন্তু হকের সহযোগিতা এবং বাতিলের উৎপাটনের জন্যে তরবারী উত্তোলনের সময় উপস্থিত হলে দুর্বল ও কৃশ দেহের অধিকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এ মহান কার্য সম্পাদনে কারো পিছনে থাকতেন না। বদরের লড়াইয়ে তিনিই কাফিরদের নেতা আবু জাহিলের দেহ দিখণ্ডিত করেছিলেন। বদরের এ ঘটনাকে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ এভাবে বর্ণনা করেন—

"বদরের যুদ্ধ কালে আমি নিজ সারিতে দণ্ডায়মান ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, আমার ডান ও বাম পার্শ্বে দু'টি নবীন কিশোর। তাদের

একজন চুপিসারে আমাকে জিজ্ঞাসা করল চাচাজান! আবু জাহেল কে? তাকে একটু আমায় দেখিয়ে দিন! স্নেহ ভরে বললাম, ভ্রাতুষ্পুত্র! তাকে দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? ছেলেটি উত্তর দিল যে, শ্রদ্ধেয়! আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আবু জাহেলকে পেলে তাকে হত্যা করে ছাড়ব। এতে যদি আমার প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তবুও পিছ পা হব না। এভাবে দ্বিতীয় কিশোরও আমার কানে কানে ঐ কথা বলল। আমি তাদের উভয়কে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম যে, আবু জাহিল ওই যে হোথা দাঁড়িয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ ছেলে দু'টি দুরন্ত বাজের মত ডানা ঝাপটে তার নিকটে চলে গেল। আবু জাহিলকে বুঝাবার সুযোগ না দিয়ে তারা অকস্মাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাল সামলাতে না পেরে আবু জাহিল মাটিতে পড়ে গেল। এ ছেলে দু'টি ছিল আফ্রা'র সন্তান। এদের নাম ছিল যথাক্রমে মুয়ায ও মুআউয়ায। যুদ্ধ জয়ের পর মহানবী (সা) বললেন, তোমাদের কেউ গিয়ে আবু জাহিলের পরিণাম দেখে আস। নির্দেশের সাথে সাথে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) দ্রুতবেগে ময়দানে চলে যান। তিনি সেখানে আবু জাহিলকে মৃত্যু প্রায় অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তাঁর দাড়ি মুষ্টি বদ্ধ করে বললেন, তুমিই কি আবু জাহিল? انت ابوجاهل ؟ আবু মুয়ায বলেন যে, আবু জাহিল তখন দুঃখ করে বলে ছিল, হায়! এ কৃষ ছাড়া অন্য কেউ যদি আমার শিরোচ্ছেদ করত! হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "আমি তাকে শ্বাস ওঠা অবস্থায় পেয়েছিলাম। মক্কায় অবস্থান কালে একবার সে আমার ঘাড়ে চেপে ধরেছিল এবং গায়ের জোরে ঘুসি মেরে ছিল।[১] তার শোধ কল্পে আমি এবার প্রবল ভাবে পা দিয়ে তার ঘাড় চেপে ধরলাম, এতে সে কাঁপিয়ে উঠে বলল, রে বকরীর রাখাল! তুই ওখানে পা চেপে চরম আস্পর্ধা দেখালি বৈ কি! আমি এর প্রতি উত্তরে বললাম, ওরে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ্ই কি তোকে লাঞ্ছিত করেননি?" সে বলল, বল তো তোরা এর পূর্বে কখনো আমার মত কোন মান্যবরকে হত্যা করেছিস কিনা? ক্ষণিক পরে আবার বলল, বলতো সময়ের প্রবাহ আজ কা'দের অনুকূলে? বললাম, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুকূলে! অনন্তর আমি তার মস্তক ছিন্ন করে ফেললাম। রাসূল করীম (সা)-এর সম্মুখে সে মস্তক হাযির করে বললাম হুযুর! এই আল্লাহ্র দুশমন আবু জাহিলের শির!" রাসূল করীম (সা) তখন

১. সীরাতে ইবনে হিশাম। ১২শ খণ্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা।

তকবীর ধ্বনি দিয়ে বললেন الله الذى لا اله غيره আল্লাহ্ তো ঐ সত্তা যিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণতর বান্দা নবী মুস্তফা (সা)-এর মুখে তখন নিজ ও উম্মতের স্বদর্প নিনাদ উচ্চারিত না হয়ে উচ্চকিত হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার মহিমা গাঁথা।

বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া ও খয়বর সহ প্রতিটি যুদ্ধে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ে তিনি মহানবী (সা)-এর সমারোহী হয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূল করীম (সা)-এর ইন্তিকাল গুজব ছড়িয়ে পড়ল তখন ও তিনি অটল অবিচল থেকে যুদ্ধরত ছিলেন।[১]

উহুদের যুদ্ধ শেষে শ্রান্ত বিক্ষত মুজাহিদদেরকে তরবারী কোষাবদ্ধ করতে বারণ করা হল। পুনর্বার যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ হল। তখন অন্যান্য সাহাবার মত হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও বীরোচিত ভাবে আনন্দে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহানবী (সা)-এর সমারোহী হয়ে তিনি হামরাউল আসাদে পৌঁছেছিলেন। হুনায়নের যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলমানদের বিপর্যয় হলে দশ হাজার মুজাহিদদের অধিকাংশ পলায়ন পর হয়েছিলেন। মাত্র আশিজন জান নিসার সাহাবী এতটুকু পিছপা না হয়ে রাসূল পাক (সা)-এর চার পাশে তরবারী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও প্রাণ বিসর্জনের অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি বলেন, "মুশরিকদের সে অকস্মাৎ আক্রমণের টাল সামলাতে না পেরে আমরা আশি-জন মুজাহিদ পিছনে সরে আসলাম। কিছু দূর এসে আমরা পুনরায় মৃত্যু পণে অস্ত্র পরিচালনা করলাম। এক বার রাসূল করীম (সা) কিছুটা অবনত হলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)। আপনি মস্তক উত্তোলন করুন (আমার এ দেহ-ঢাল তো সম্মুখে রয়েছে) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উন্নতশির করেছেন।" রাসূল পাক (সা) তখন আমার কাছে এক মুষ্টি ধূলো চাইলেন। আমি মাটি থেকে এক মুঠো ধূলো তুলে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সে ধূলো মুশরিকদের চোখে মুখে নিক্ষেপ করলে তারা ক্ষণিক অপ্রস্তুত হল সে মুহূর্তে তিনি আমাকে বললেন আবদুল্লাহ! আনসার ও মুহাজির-গণ কোথায়? আমি ইঙ্গিতে তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাদেরকে ডাক দাও। আমি উচ্চঃস্বরে তাদের আহ্বান করলাম। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুজাহিদগণ নব উদ্যমে জেগে উঠলেন। রাসূল করীম

---

১. জাওয়ায়েদে ইবনে হাব্বান, কৃত ইবনে হাজার আস্কালানী।

(সা)-এর জন্য প্রাণ-বিসর্জনের প্রেরণায় তাঁরা দুর্বার বেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের তরবারী চমকে যেন বিদ্যুত খেলছিল। প্রবল আক্রমণের ঘনঘটায় দিশেহারা হয়ে শত্রু সেনা ময়দান ছেড়ে দিক বিদিক ছুটে পালালো। মুহূর্তের মধ্যে তাদের বিজয় জীবন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্র মুসলিম মুজাহিদদের করতলগত হল। মুসলমানগণ বিজয় ও সফলতা লাভ করলেন।[১]

হিজরতের পূর্বের কথা। ইসলামের আহ্বান চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মক্কার চতুসীমানা ছেড়ে কোরেশদের বাইরেও এর চর্চা হতে লাগল। দূর দূরান্তের এক দু'জনও ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়া শুরু করল। এতে মক্কার নেতৃবৃন্দ খুবই চিন্তিত হয়ে উঠে। উতবা বিন রবিয়া ও শায়বা সহ অন্যান্য সর্দারগণ পরামর্শ ক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে আসছে হজ্জ মওসুমে বহিরাগতদেরকে যাতে ইসলামে দাখিল করতে না পারে সে জন্য আমাদেরকে এখনই সতর্ক হওয়া উচিত। এ জন্য তারা বিভিন্ন কর্ম কুশল চতুর লোকদেরকে নিয়োজিত করল। তারা রাসূল (সা)-এর নিন্দাবাদ করে মানুষকে তাঁর সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে। তাদের মন থেকে রাসূল (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ বিনষ্ট করে দেবে। সে অনুসারে হজ্জের মওসুমে কোরেশের নির্বাচিত কুট কুশলীরা রাস্তার বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে মানুষকে ডেকে ডেকে বুঝাতে লাগল যে, তোমরা এ নতুন ধর্মের প্রবক্তার সাথে মিলোনা। তাঁর কথায় কর্ণপাত করোনা। কেউ তাকে জ্যোতিষী বলে আখ্যায়িত করল। কেউ তাঁর উপর কাবিয়ের অপবাদ দিল। কেউ তো তাকে পাগল পর্যন্ত বলে ফেলল। মোট কথা তারা অপবাদ ও অপপ্রচারের কিছুই অবশিষ্ট রাখলনা। তাদের এ অপচারের জবাব ও মিথ্যা প্রকাশ করে দেবার জন্য রাসূল করীম (সা) কয়েকজন সাহাবীকে নিয়োগ করলেন। তাঁরা বহিরাগতদেরকে বললেন যে, আপনারা রাসূল পাক (সা)-এর নিকট চলুন। তাঁর কথা শুনে যাচাই করে দেখবেন যে, এরা কতটুকু সত্য বলছে। কুরআনুল করীমে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوربك
لنسئلنهم اجمعين عما كانوا يعملون

"আমরা বিভক্তকারীদিগের উপর শাস্তি নাযিল করব। যারা কুরআনকে

---

১. মুস্তাদরাকে হাকীম ২য় খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা। মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা।

বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করেছে। সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করব, যেসব তারা করে থাকে।[১]

কাফিরদের অপপ্রচারের জবাব দেবার জন্য রাসূল করীম (সা) যাদেরকে নির্বাচন করেছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও তাদের ভিতর ছিলেন। তিনিও এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের মিথ্যা কথনের মোকাবেলা করেন।[২]

যে সব সাহাবী শাক্কুল কামারের (চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার) ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাদের অধিকাংশই কম বয়সী যেমন—হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস* (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ও হযরত আনাস (রা)। প্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এঘটনা বর্ণনা করেন তাদের অনেকেই ঘটনা সংঘটিত হবার সময় ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। এঘটনাকে তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এর বহু পূর্বেই তাঁর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত ইবনে মাসউদের বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনার ভাষা এরূপ।

انشق القمر و نحن مع النبی صلی الله علیه و سلم فصار فرقتین فقال لنا اشهدوا

"আমরা তখন মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (তিনি অঙ্গুলী ইশারা করলে) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

আবদুল্লাহ্ তনয় হযরত আবু উবায়দা বলেন যে, আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন যে,

اخلائی من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر و عمر وابو عبیدة ۔

---

১. এর পরেই বলা হয়েছে فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناك المستهزئین "অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর আর মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর। তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই যথেষ্ট। সূরা হিজর—অনুবাদক।

২. সিয়ারে আ'লামুন্নাবালা, আলজুজরি, ৬০ পৃষ্ঠা।

৩. বুখারী।

* ৩—

"মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে তিনজন আমার সবচেয়ে বন্ধু ছিলেন, তাঁরা হলেন, হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দা।[১]

প্রথম খলীফার যুগে

রাসূল করীম (সা)-এর তিরোধানের পর চারিদিকে ধর্মত্যাগীদের ফিত্না ছড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় যাকাতের নির্দেশ মুলতবী করার জন্য প্রথম খলীফা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদের আবেদন নাকচ করে দেন। তিনি বীরোচিত কণ্ঠে বললেন, যারা নামায ও যাকাতের মাঝে বিভেদের সৃষ্টি করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। এতে তারা অতি রুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তারা মদীনায় গিয়ে দেখতে পেল যে, হযরত উসামা ইবনে যায়দের নেতৃত্বে সাহাবাদের এক বিরাট বাহিনী যুদ্ধে রওনা হয়ে গেছেন। মদীনা প্রায় জনশূন্য। মাত্র কয়েকজন সাহাবী সেখানে অবশিষ্ট রয়েছেন। ইহাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অতি শীঘ্রই তারা মদীনা আক্রমণের সংকল্প করল। দূরদর্শী খলীফা হযরত আবু বকর (রা) পূর্বে ইহা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই পূর্বেই তিনি প্রবীণ সাহাবীদের তত্ত্বাবধানে মদীনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে চৌকি নির্মাণ করেছিলেন। এসব সাহাবীদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন আওফ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, তালহা বিন আবদুল্লাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের[২] নাম উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর দৃঢ় সংকল্পজনিত খোদা নির্ভরশীলতার বরকতে দূর দূরান্ত থেকে নানাহ গোত্রের মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাকাতের মালামাল নিয়ে মদীনায় আসতে লাগলেন। যে পথে হযরত আদী[৩] মদীনায় আসছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন সে পথের ঘাঁটি প্রধান। তিনি আনন্দোৎফুল্ল হয়ে খলীফাতুল মুসলিমীনের কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।[৪]

---

১. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা, ১৫১ পৃষ্ঠা।
২. সিদ্দীকে আকবর ১৭৪ পৃষ্ঠা। সম্ভবত হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক তাঁর যুদ্ধে প্রেরিত না হয়ে রাজধানীতে থাকার এও এক কারণ হবে যে, রাসূলে করীম (সা) তাঁর বিচক্ষণতা ইলমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তার রাজধানীতে অবস্থান খলীফা ও সর্বসাধারণের উপকার সাধন হবে। অনুবাদক—
৩. ইনি বিখ্যাত দাতা হাতিম তাঈ এর পুত্র।
৪. তারিখে তবারী।

দ্বিতীয় খলীফার যুগে

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ইন্তিকালের সময় উমর ফারুক (রা)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তাঁর খিলাফত কালে চারিদিকে মুসলমানদের জয়জয়াকার পড়ে গেল। পার্শ্ববর্তী সব এলাকা বিজিত হয়ে ইসলামী খিলাফতের চৌহদ্দী সম্প্রসারিত হতে লাগল। হযরত উমরের এই বিজয়ী অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য হযরত ইবনে মাসউদ (রা) প্রেরণাদীপ্ত হয়ে উঠলেন। সুতরাং তিনি হিজরী ১৫ সালে সংঘটিত ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। এযুদ্ধে তিনি অদ্ভুত বীরত্ব ও তরবারি চালনার নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। হিমসের[১] যুদ্ধে জয়লাভ করলে তিনিই এর খুমুছ (বিজয় লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) নিয়ে মদীনায় খলীফা উমর ফারুক (রা)-এর সমীপে পেঁাছেন। আবু উবায়দা বলেন যে, এক সফরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) পানির অভাব বোধ করেন। এতে তাঁর খুবই কষ্ট হয়। লোকেরা একথা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

فهو ان يفجر الله له عينا ليسقوه منها واصحابه اظن هذى من ان يقتله عطشا -

তাঁর সম্পর্কে আমাদের আশা আছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পানির অভাব দূর করবার জন্য নহর জারী করে দেবেন। তাঁকে ও তাঁর সাথীবৃন্দকে পিপাসায় নিঃশেষ করবেন না।

বিচার বা কাজী নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে লক্ষণীয় হ'ল তার মীমাংসা গত যোগ্যতা ও ধর্মীয় একাগ্রতা কতটুকু। অযোগ্য ও অধার্মিক লোক কখনো এ গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হতে পারে না। (বিচারক ও গভর্ণর নিয়োগের মাঝেই হযরত উমরের বিচক্ষণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক প্রমাণিত হয়েছে।) যোগ্যতা ও ধর্ম-নিষ্ঠার ভিত্তিতে হযরত উমর (রা) যাদেরকে কাজী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাদের অন্যতম। হিজরী বিশ সনে যখন আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে কুফার গভর্ণর হিসাবে প্রেরণ করা হয় তখন হযরত উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে তাঁর সঙ্গে বিচারক করে পাঠিয়ে দেন। একই সঙ্গে তাঁকে কুফার বায়তুল মালেরও

---

১. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দেন। এ ছাড়া কূফার প্রধানমন্ত্রীর বা গুভর্ণরের প্রধান সহকারী ও ধর্মীয় শিক্ষক এবং দীনী উপদেষ্টা হিসাবেও তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এদের দু'জনকে কূফায় প্রেরণ কালে তিনি কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ লিখে পাঠান তাতে উভয়ের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। তিনি তাতে লিখেন :

اني بعثت اليكم عمار بن ياسر اميرا وابن مسعود معلما ووزيرا قد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم وانهما لمن النجباء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من اهل بدر فاسمعوا لهما واطيعوا هما

আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে তোমাদের গভর্ণর (আমীর) এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে শিক্ষক ও উযীর হিসাবে প্রেরণ করলাম। এ ছাড়া বায়তুল মালের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও ইবনে মাসউদের উপর অর্পণ করলাম। এরা দু'জন মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠতম সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। তোমরা তাদের নির্দেশ মেনে চলবে এবং তাদের অনুসরণ করবে।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) পরিপূর্ণ দশ বছর ইলমী ও শাসনতান্ত্রিক কাজে ন্যস্ত থাকেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও যশ খ্যাতির সাথে তিনি এ দায়িত্বত্রয় (ইসলামী প্রশিক্ষণ দান, বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়নও বিচার-মীমাংসা) সম্পাদন করেন। তিনি এত নিষ্ঠা ও যত্নের সাথে ইলমের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন যে, মক্কা ও মদীনার মত কূফা ও মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বিদ্যাপীঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বীয় তাকওয়া ও ইলমী খিদমত বলে তিনি কূফাবাসীর হৃদয়ে প্রিয়তমের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কাট খোট্টা বলে পরিচিত কূফাবাসীরা কোন আমীর ও কাযীকে কখনো আপন করে নিতে পারেনি। অভিযোগের ভরমারে খলীফা আমীর বা কাযীকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হয়ে যেতেন। কিন্তু ইবনে মাসউদ সম্পর্কে খলীফার দরবারে তারা কখনো কোন অভিযোগ তুলেনি। কেননা তাঁর উপস্থিতিকে তারা নিজেদের জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণকর বলে ধারণা করত।

হযরত উমরের ইন্তিকালের সংবাদে তিনি ব্যথা বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি

১. আ'লামুল মু'কিঈন, ৮৬ তম অনুচ্ছেদ, উসদুল গাবাহ, ৩ খণ্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা।

জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। সমাধিস্থ করার পর তাঁর কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে উচ্ছল কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। এতে তিনি এত অস্থির হয়ে পড়তেন যে, তাঁর শরীর থেকে চাদর খসে পড়ত। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলতেন ওগো প্রিয়তম! ওগো খলীফাতুর্ রাসূলে! আমি তোমার জানাযায় শরীক হতে পারিনি। তাই বলে কি তোমার প্রশংসাও করতে পারব না? তুমি সত্যের সম্মুখে ছিলে চির বিনয়—মুক্ত, উদার। কিন্তু অসত্যের বিরুদ্ধে ছিলে ইস্পাত কঠিন। খুশীর মুহূর্তে তুমি আনন্দ বিগলিত হতে। আর যেখানে নারাজ হবার সেখানে অসন্তুষ্টিই ছিল তোমার স্বভাব। কারো দোষ খুঁজে বেড়াতে না, কারো লৌকিক প্রশংসায়ও তুমি লিপ্ত হতে না! ইসলামের হে একনিষ্ঠ সেবক! আল্লাহ তোমাকে সর্বোত্তম পুরস্কারে অভিষিক্ত করুন।[১]

হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে

হিজরী ২৪ সনের জিলহজ্জ মাসে হযরত উমর (রা) শহীদ হন। হযরত উসমান (রা) পরবর্তী খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হলেন। হযরত উমরের খিলাফত কালে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়। গভর্ণর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাঝে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ রদবদল করেন। কেবল অভিযোগের উপর নির্ভর করেও তিনি অনেককে ছাটাই করেছেন। কিন্তু এসব রদবদলে তাঁর শাসনক্ষমতায় কোন আঘাত আসেনি। তবে হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে রাজনৈতিক প্রবাহে ইনকিলাবের ছাপ পরিলক্ষিত হল। এর ফলে মানুষের অন্তরে আমীরের আনুগত্যের জযবা শিথিল হতে থাকে। কুফায় একে একে অনেক গভর্ণরের নিয়োগ ও পদচ্যুতি ঘটল। এসব রদবদল যে তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ছিল এমন নয়। অত্যধিক সহনশীল মনোভাব এবং বাৎসল্যতা তাঁর কঠোরতা অবলম্বনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে তিনি আমীর ও হাকিমদের রদবদলে বাধ্য হয়ে যেতেন। এই বৈচিত্রময় ইনকিলাব ও পরিবর্তন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর সুদীর্ঘ বিচারক জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

হযরত সা'দ (রা)-এর পদচুতি

হযরত ইবনে মাসউদের বিচারক জীবনে কুফায় যেসব গভর্ণরদের রদবদল হয়েছে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রা) তাদের অন্যতম। হযরত উসমান

১. ইকদুল ফরীদ, ২য় খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা।

(রা) তাঁকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। গভর্ণর থাকাকালে তিনি একবার প্রয়োজন বশতঃ বায়তুল মাল থেকে কিছু অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কুফার কিছু লোক তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করেন যে, বায়তুল মালের তত্ত্বাবধান আপনার দায়িত্বে। অন্য দিকে হযরত সা'দ (রা) একজন মর্যাদাশালী ও কুফার সর্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। বায়তুল মালের ঋণ পরিশোধে তিনি অযথা শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন। সুতরাং আপনি তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা করুন। এদিকে হযরত সা'দ (রা)-এর অমাত্যবর্গ তাঁকে বলল যে, সাহাবাদের প্রথম সারিতে আপনার স্থান। আপনি নিজ প্রয়োজনে বায়তুল মাল থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। কুফার জনগণও বর্তমানে সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করছে। অতএব এত শীঘ্র বায়তুল মালের ঋণ পরিশোধের কোন আবশ্যকতা নেই। আপনার প্রয়োজন সমাধা করতে থাকুন। হযরত সা'দ ও ইবনে মাসউদ (রা) দু'দিকের এ পক্ষপাত সম্পর্কে পরস্পর অবিহিত ছিলেন না। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলে একদিন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হযরত সা'দকে ঋণ পরিশোধের তাগিদ করলেন।[১] আরো একদিন একথা উত্থাপিত হলে উভয়ের মাঝে কিছুটা বচসা ও কথা কাটাকাটির[২] সূত্রপাত হয়। হযরত সা'দ তখন ক্রোধান্বিত হয়ে স্বীয় লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে হযরত ইবনে মাসউদের উপর বদ দু'আ করতে লাগলেন। যখন "ওগো আকাশ যমীনের সৃষ্টিকর্তা" বলে অভিসম্পাত শুরু করতে যাচ্ছিলেন তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁকে ক্ষান্ত হওয়ার জন্য করুণ আবেদন জানালেন। হযরত সা'দ শান্ত হয়ে জবাব দিলেন যে, আমার যদি আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকত তবে বিশ্বাস কর আমি তোমাকে কঠিন অভিশাপ দিতাম। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। হযরত উসমান (রা)-এর কর্ণে এ সংবাদ পৌছলে তিনি উভয়ের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং হযরত সা'দকে কুফা থেকে মদীনায় ডেকে পাঠান।[৩] ইহা ছিল হিজরী ২৬ সনের ঘটনা।

---

১. ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

২. ফতহুল বারী, ঐ।

৩. ফতহুল বারী; ঐ, তবারী, ২৮১১ পৃষ্ঠা।

খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর প্রতি চরম আনুগত্য

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব কুরআনের কপিটি চেয়ে পাঠালেন। কুরআনের প্রতি সাহাবায়ে কিরামের চরম আসক্তি ছিল। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) আরেক এক কদম সম্মুখে ছিলেন। কাজেই নিজস্ব কুরআনের কপি খানা হাতছাড়া করতে তার খুবই বাঁধ ছিল। অধ্যবসায় জনিত তিলাওয়াতের আমল তাঁর ব্যাহত হয়ে যাবে ইহা তিনি কিছুতেই বরদাশত করতে পারছিলেন না, তাই খলীফার কাছে তিনি মনকষ্টের কথা জানালেন। কিন্তু কুরআন লিপিবদ্ধের মহত্তর কাজের জন্য তিনি ইবনে মাসউদের (রা) প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারেননি। কপিটি পাঠিয়ে দেবার জন্য তিনি পুনারায় নির্দেশ দিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা মতানৈক্যের ফিত্‌নার কথা ভেবে অবিলম্বে খলীফার নির্দেশ মান্য করলেন। তাঁর প্রিয় কুরআনের কপিখানা তিনি পাঠিয়ে দিলেন। আনুগত্যের এ কঠিন পরীক্ষায় তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলেন।

হিজরী ২৯ সালের কথা। হযরত উসমান (রা) হজ্জের মওসুমে মিনায় দু'রাকাআতের স্থলে চার রাকআত নামায আদায় করেন। এ আমল যেহেতু রাসূলে করীম (সা) এবং পূর্ববর্তী দুই খলীফার নিয়ম বিরোধী ছিল তাই ইহা সাহাবাদের মনে রোষের সৃষ্টি করল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, (রা) আবু যর (রা) এবং আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) পরস্পর এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের (রা) মুখে বারংবার উচ্চারিত হচ্ছিল

حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان

আমার এ চার রাক'আতের স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা দু'রাকাআতকেই কবুল করুন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি ঈমানী দূরদৃষ্টির আলোকে খলীফার আনুগত্য-কে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিলেন। দু'রাকাআতের স্থলে চার রাক'আত নামায আদায় যদিও তাঁর মনপুত ছিল না কিন্তু খলীফার অনুসরণার্থে তিনিও মনকষ্ট প্রচ্ছন্ন রেখে চার রাক-আতই আদায় করলেন। পরবর্তীকালে এর উপর দুঃখ প্রকাশ করলে হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ তাঁকে বললেন, এ কেমন কথা যে, খলীফার আমল আপনার অপছন্দ সত্ত্বেও আপনি তাঁর অনুসরণ করলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ বললেনঃ

الخلاف شر فالذى بلغنى انه صلى اربعا فصليت مع اصحابى اربعا
মতানৈক্য অত্যন্ত নিকৃষ্টতার কাজ। তাই আমি যখন শুনলাম যে খলীফা চার রাকাআতে নামায আদায় করেছেন তখন আমিও তাঁর আনুগত্যার্থে চার রাকাআতই পড়ে নিলাম।[১]

অলীদ বিন উকবার গভর্নরী

হযরত উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতের শেষ যুগে কূফায় তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র সরগরম হয়ে ওঠে। যার ফলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে (রা) ও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অলীদের গভর্নর থাকাকালে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর আদালতে এক যাদুকর সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত যে, সে গভর্নরকে যাদুর ভেল্কী দেখাচ্ছিল। মামলা দায়েরকারীদের মূলত উদ্দেশ্য ছিল এ দ্বারা গভর্নরকে লোক সম্মুখে অপদস্ত করা। যাদুকরকে শাস্তি দেয়া তাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। আমীরের প্রতি তাদের এ বিদ্বেষের মূল কারণ ছিল যে, ২৯ হিজরী সনের শেষার্ধে অথবা ৩০ সনের প্রথম ভাগে কিছু লোক এক বাড়ীতে সিঁদ কেটে ছিল। সিঁদ কাটার মুহূর্তে গৃহ কর্তার নিদ্রা ভঙ্গ হলে সে একাকী কোন পদক্ষেপ নেয়ার সাহস করল না। সে চিৎকার করে লোক জন জড় করা আরম্ভ করল। ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে উপদ্রপকারীরা তাকে হত্যা করে ফেলল। ইত্যবসরে গৃহস্বামীর চিৎকার শুনে বেশ কিছু লোক এগিয়ে আসে। তারা দুর্বৃত্তদেরকে ধরে ফেলল। অলীদের কাছে এ সম্পর্কে মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তাদেরকে বন্দী করে রাখবার নির্দেশ দেন এবং খলীফার দরবারে বৃত্তান্ত লিখে পাঠালেন। গৃহ স্বামীকে হত্যার অপরাধে খলীফা তাদের থেকে কিসাস (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) নেয়ার আদেশ দিলেন। অলীদ বিন উকবা তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এতে দুর্বৃত্তদের আত্মীয় স্বজন এবং তাদের স্বগোত্রীয়রা প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে। তারা অলীদের থেকে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হল। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এ চক্রান্তে হযরত উসমান (রা) এবং অলীদের উপর ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বেষী কয়েক জন লোক এসে যোগ দিল। যে যাদুকরকে ভেল্কী প্রদর্শনের অপরাধে হযরত ইবনে মাসউদের (রা) আদালতে হাযির করা হয়েছিল পূর্বে

---

১. তবারী, ৩য় খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা।

অলীদের সমীপেও তার সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। আর এ ঘটনাকেই গুজব হিসাবে ছড়িয়ে দেয়া হল যে, অলীদ যাদুর ভেল্কী দেখবার জন্য তাকে ডেকে এনেছিল। অলীদ তাঁর ভেল্কী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে নিজেকে যাদুকর বলে দাবী করে এবং গভর্ণরকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য একটা গাধার গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে তার মুখ থেকে বের হয়ে আসে। অলীদ এ মুকদ্দমাটি বিচারপতি হযরত ইবনে মাসউদের (রা) নিকট হস্তান্তর করেন। বিভিন্ন অনুসন্ধানের পর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। চক্রান্তকারীদের নিকট এ বিচার মনপুত হ'ল না। কেননা অলীদকে পর্যুদস্ত করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর তাতে এরা কামিয়াব হতে পারল না। ফলে দ্বিগুণ জিঘাংসা বৃত্তিতে তারা মেতে উঠল। যাদুকরের এ ঘটনাকে তারা এই ভাবে প্রচার করতে লাগল যে, অলীদ যাদুর ভেল্কী দর্শন করে এবং এসব ব্যাপারে সে খুবই উৎসাহী। সুতরাং সে বিচারপতির ফতোয়া কিছুতেই কার্যকরী হতে দেবে না। চক্রান্তকারী দলেরই এক সদস্য জুন্দুব নামের এক ব্যক্তি যাদুকরকে গোপনে হত্যা করে ষড়যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইল। কিন্তু সে সফলকাম হতে পারল না। পরন্তু তাকে গ্রেফতার করা হল। তার এ হত্যা প্রচেষ্টায় যাদুকর মারাত্মকভাবে আহত হল। অলীদ খলীফার দরবারে নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন যে, জুন্দুবকে কি শাস্তি দেয়া হবে। উত্তরে খলীফা বললেন যে, যাদুকরকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে যাদুকরের মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে সে অবহিত ছিল কি-না। যদি সে না জেনে থাকে তাহলে পুনারায় জিজ্ঞাসা করবে যে যাদুকরকে শাস্তি দেয়া হবে না বলে তার বিশ্বাস ছিল কি না। এর পরে তাকে বিবেচনানুসারে শাস্তি প্রদান করবে। আর মানুষকে এ কথা জানিয়ে দিবে যে, কেউ যেন স্বেচ্ছায় কোন জাতীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করে এবং আইনকে নিজের হাতে তুলে না নেয়। দোষী এবং হত্যাকারীর যথার্থ অনুসন্ধান করা এবং তাকে শাস্তি দেয়া সরকারী দায়িত্ব।[১] এতে হস্তক্ষেপ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

অলীদের অসন্তুষ্টি

অলীদ হযরত ইবনে মাসউদকে (রা) খলীফার ফরমান সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি সে অনুসারে অপরাধীর বিচার করলেন এবং কূফাবাসীকে সমবেত করে বললেন যে, "ভাইসব! কেবল ধারণা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে

১. তারীখুল উমাম, তবারী।

আপনারা যে সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা সমীচীন নয়। এতে সরকারী কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। অপরাধী ও হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দেয়া শাসকদের দায়িত্ব এতে আপনারা হস্তক্ষেপ করবেন না।" ঘটনা এ ভাবে রক্ষা হলেও বিরোধী দল এতে সন্তুষ্ট হতে পারল না, তারা চক্রান্ত করেই চললো। তারা হযরত ইবনে মাসউদের (রা) নিকট অভিযোগ তুলল যে, অলীদ গোপনে মদ্যপান করে। তিনি তাদেরকে বললেন যে, ছিদ্রান্বেষণ গুপ্তচর বৃত্তির কোন অনুমতি নেই, এ থেকে বিরত থাকুন। অলীদের কানে একথা পেঁছলে তিনি হযরত ইবনে মাসউদের (রা) উপর বিরূপ হন। তাঁকে ডেকে বললেন, আমার উপর যে অপবাদ দেয়া হয়েছে এর শাস্তি কি হতে পারে ?[১] গোপনে ছিদ্রান্বেষণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা এ কাজে লিপ্ত হয়েছে—কেননা এ ছাড়া আমার অন্যায় প্রমাণ করবার কোন উপায় নেই। তাদের অপরাধে না হয় আমি শাস্তি থেকে মুক্তি পেলাম কিন্তু আমার উপর যে কালিমা লেপন করা হয়েছে তাতো রয়েই গেল।[২] হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) তার কথায় কর্ণপাত করলেন না অধিকন্তু আরো-একটি ঘটনা সংঘটিত হল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে গভর্ণর ও সরকারী কর্মচারীদের উপর সাদামাটা জীবন যাপনের তাগিদ ছিল। তাই কুফার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও অলীদ তাঁর ফটকে কোন পাহারাদার বসাননি। এতে বিরুদ্ধাচারীদের খুব সুবিধা হল। এক রাতে তারা গৃহে প্রবেশ করতঃ ঘুমন্ত অলীদের অঙ্গুলী থেকে সরকারী মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরীয় খুলে নেয় এবং তারা ইহা সবাইকে দেখিয়ে একথা প্রচার করতে থাকে যে, অলীদ মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হলে, তাঁর অঙ্গুলী থেকে এই অঙ্গুরীয় খুলে আনা হয়েছে। এই প্রমাণ নির্ভর অভিযোগের ফলে হযরত আবদুল্লাহর মত দূরদর্শী ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিও হিমসিম খেয়ে গেলেন। তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না যে, কার কথা সত্য বলে মেনে নিবেন। বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ ও প্রমাণ বিহীন নয় এবং অলীদের নিদ্রার অজুহাতও অযৌক্তিক মনে হয় না। তবুও তিনি স্বীয় বিচক্ষণতা বলে তাদের অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন কিন্তু তাদেরকে শাস্তি না দেয়ায় অলীদ ইবনে মাসউদ (রা)-এর উপর খুবই রুষ্ট হন। কিন্তু তিনি তার কোন পরোয়া

---

১. তবারী ২৮৪৫ পৃষ্ঠা।

২. হযরত উসমানের কাছে অলীদের মদ্যপানের অভিযোগ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলে তিনি হযরত আলী (রা) কে হদ্দ জারী করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা) তাকে চল্লিশটি চাবুক মারেন। মুসলিম, আবু দাউদ।

করেন নি। এর পরেই বায়তুল মাল থেকে এক লক্ষ দিরহাম আত্মসাৎ হয়। ঘটনাটি সম্মুখে বর্ণিত হচ্ছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কুফা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন

তাঁর মদীনায় প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বলেন যে, হযরত সা'দ (রা)-এর সাথে তাঁর তিক্ততা সৃষ্টি হলে হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত নারাজ হন। অবশ্য তাঁর অসন্তোষের বুনিয়াদ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের উপর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা) ইবনে মাসউদ (রা)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং নিষ্ঠার প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন। ফলে বিভিন্ন গভর্নরের রদবদল সত্ত্বেও ইবনে মাসউদকে (রা) তাঁর পদ থেকে কখনো সরিয়ে আনেনি। অবশেষে অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র এবং ফিতনা হাঙ্গামা যখন তুঙ্গে উঠল তখন বাধ্য হয়ে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা)কে কুফা থেকে মদীনায় নিয়ে আসেন। এ সংবাদ কুফায় প্রচারিত হলে খলীফার প্রতি জনমনে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁরা মনে প্রাণে উপলব্ধি করল যে, অনর্থক তাদেরকে তাদের দীনি ও ইলমী উপকারী বন্ধু এবং গুরুজনের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করা হল।

অলীদ বিন উকবা সম্পর্কে হযরত উসমান (রা) এর বৈপিত্রেয় ভাই হত। তার বোন হযরত উম্মে কুলসুমের ইসলাম গ্রহণ ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত ঘটনা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করতঃ আপনজন পরিত্যাগ করে একাকিনী মদীনায় চলে আসেন। তাঁর দুই ভাই তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য মদীনায় গেলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

অলীদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আব্দিল বার বলেন,

لقد كان من رجال قريش ظرفا و حلما و شجاعة وادبا وكان من الشعراء المطبوعين كان الاصمعى وابو عبيدة والكلبى يقولون فكان شاعرا كريما

নিঃসন্দেহ তিনি কোরেশদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান সহনশীল ও বাহাদুর এবং সুসাহিত্যিক হিসেবে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিলেন। একজন রসজ্ঞ কবি হিসাবেও তার সুখ্যাতি ছিল। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আছমাঈ, আবু উবায়দা এবং কালবী বলেন যে, তিনি একজন মর্যাদাবান কবি ছিলেন।"

কিন্তু এর সাথে সাথে তিনি এ কথাও লিখেন যে,

كان وليد بن عقبة فاسقا شريب خمراخواره في شرب الخمر و منادمة ابا زبيد الطائي مشهورة كثيرة يسمج بنا ذكرها هناوله اخبار فيها نكارة وشناعة تدل بقطع على سوء حاله و قبيح افعاله غفرالله لنا وله -

অলীদ বিন উকবা একজন অসৎ ও মদ্যপায়ী লোক ছিল। মদ্যপান সম্পর্কীয় তার বিভিন্ন ঘটনা এবং মশহুর শরাবী আবু যোবায়দ তাঈ'র সাথে তার ঘনিষ্ঠতার কথা খুবই প্রসিদ্ধ। এখানে তা উল্লেখ করা পছন্দসই নয়। তার সম্পর্কে আরো অনেক অসাধু ও অবক্ষয় মূলক তথ্য পাওয়া যায় যাদ্বারা তার দুশ্চরিত্রতা ও অপকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এবং সাথে সাথে তাকেও ক্ষমা করুন।

সম্মুখে গিয়ে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন—

صلى باهل الكوفة صلاة الصبح اربع ركعات ثم التفت اليهم فقال ازيدكم فقال عبد الله ابن مسعود مازلنا معك في زيادة منذ اليوم

কূফায় একদিন তিনি ফজরের নামায চার রাকাআত পড়ালেন। নামাযান্তে তিনি মুসল্লীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন যে, আমি দু'রাকাআত বৃদ্ধি করেছি। তদুত্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) (তিরস্কার করে) বললেন যে, হাঁ তোমার সান্নিধ্য লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের শুধু উন্নতিই হচ্ছে।

ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করার পর ইবনে আব্দির বার বলেন যে.

هذا مشهور من رواية الثقات من نقلة اهل الحديث واهل الاخبار

এ ঘটনা ঐতিহাসিক ও হাদীস বিশারদদের নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজার কিতাবুল হুদুদে এ ঘটনা উল্লিখিত রয়েছে।

আল্লামা জাহ্বী তাঁর সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা গ্রন্থে অলীদ সম্পর্কে বলেন যে,

ان الوليد كان يشربه الخمر و حد على شرب الخمر

অলীদ শরাব পান করত এবং এ অভিযোগে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

ولا خلاف بين اهل العلم بتاويل القرآن فيما علمت ان قوله عزوجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت في وليد بن عقبة و ذالك انه بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم الى بني المصطلق مصدقا فاخبر عنهم انهم ارتدوا وابوا عن اداء الصدقة و ذالك انهم خرجوا اليه فهابهم ولم يعرف ماعند هم فانصرف عنهم واخبر بما ذكرنا فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم خالد بن الوليد وامر ان يتثبت فيهم فاخبروه انهم متمسكون بالاسلام ونزلت ياايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الاية

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার লিখেছেন, উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতভাবে বলেছেন যে, কুরআন কারীমের আয়াত ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (কোন অসৎ ব্যক্তি যদি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা অনুসন্ধান করে দেখ) অলীদ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে। কেননা রাসূল করীম (সা) তাকে যাকাত আদায়ের জন্য বনূ মুস্তালিক গোত্রে প্রেরণ করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে সে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়েছে। তাই তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। অথচ মূল ঘটনা এরূপ ছিল যে, অলীদের আগমনের সংবাদ শুনে তারা তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য (তৎকালীন নিয়মানুসারে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে) তার দিকে এগিয়ে আসে। অলীদ তাদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং মদীনায় এসে রাসূল (সা)-এর নিকট তাদের ধর্মত্যাগের মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করে দিল। রাসূল পাক (সা) ঘটনা যাচাই কল্পে হযরত খালিদ বিন

অলীদকে সেখানে প্রেরণ করলে তারা স্বধর্ম ইসলামের উপর বিদ্যমান থাকার কথা জ্ঞাপন করে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন "হে বিশ্বাসিগণ! কোন ফাসিক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা বিচার বিবেচনা করে দেখ (যে ঘটনা কতটুকু সত্য)।

আল্লামা ওয়াহেদী এ ঘটনা তার "আসবাবুন্নুযুল" গ্রন্থে তার লিখিত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরুল ওয়াসীত" এ বর্ণনা করেছেন। আইনুল মায়ানী তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে আব্দচ্ছমাদী হানাফী, তাফসীরে ইবনুল জাওযী এবং ফখরুদ্দীন রাজীর তাফসীর গ্রন্থ মাফাতীহুল গায়ব সহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উল্লিখিত আয়াত নাযিলের দ্বিতীয় কোন সূত্রই বর্ণনা করা হয়নি।

قال الوليد لامير المؤمنين على رضى الله عنه انا احد منك سنانا واذرب منك لسانا واشجع منك جنانا فقال له اسكت فانما انت فاسق فنزلت افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا رواه الذهبى وقال اسناده صحيح

অলীদ একবার হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল যে, আমার বর্শা আপনার বর্শার তুলনায় তীক্ষ্ণতর। আমার রসনাও অধিক সুতীব্র এবং হৃদয়ের দিক থেকেও আমি আপনার চেয়ে অধিক নির্ভীক। হযরত আলী (রা) তাকে বললেন, "চুপ থাক তুমি তো বদকার বৈ নও।" তখন আয়াত নাজিল হল افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا যে ব্যক্তি মুমিন সে কি ফাসিক এর মত হবে?

ডক্টর আহমদ আমীন তার প্রণীত পুস্তক "ফাজরুল ইসলাম" এ লিখেন—

بل كثير من شباب بنى امية و بعض شباب بنى هاشم كانوا يعيشون عيشة هى الى الجاهلية اقرب منها الى الاسلام شراب و صيد وغزل ويزيد بن معاوية وصحبه ان شأت فاقرأ سيرة الوليد بن عقبة الاموى كان من فتيان قريش وشعراء هم وشجعا ئهم واجواد هم ولى الكوفة لعثمان قرأ احيانا لم يؤثر فيها الاسلام كثيرا يتهتك فى الشراب الى غير ذالك من كرم جاهلى و عصبية جاهلية

"বরং বনু উমাইয়ার অনেক নও জোয়ান এবং অল্প বিস্তর হাশেমীর যুবকদের জীবন যাত্রা অনেকটা ইসলাম থেকে দূরে জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী ছিল। মদ্যপান, প্রাণী শিকার ও নাচ-গানের মাঝেই সর্বদা লিপ্ত থাকত। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ছেলে ইয়াযিদ ও তার সঙ্গী সাথীদের চালচলন এ ব্যাপারে লক্ষণীয়।

অলীদ ইবনে উকবার জীবনী পড়ুন। সে ছিল কুরায়শ যুবকদের একজন বীর। কবি, বাহাদুর ও দানশীল হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত কালে সে (ভাগ্যগুণে) কূফার গভর্ণরীও লাভ করেছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে, মূলত তার মাঝে ইসলামের কোন প্রস্ফুটন ঘটেনি। অত্যধিক সুরা পান সহ বিভিন্ন অন-ইসলামী কার্যকলাপে সে সদা মত্ত থাকত। স্বভাবগত ভাবে সে যথেষ্ট দানশীল ও গোত্রীয় জেদের বশবর্তী ছিল।

তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে "আল-আগানী" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ুন।

তাঁর পূর্ববর্তী গভর্ণর সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রা)-এর নিকট হতে সে হিসাব পত্র বুঝে নিলে হযরত সাদ (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন,

والله ماادرى أكست بعدنا ام حمقنا بعدك

আল্লাহ'র শপথ! আমি বুঝতেছিনা যে, আমরা মদীনা থেকে আসার পর তুমি কি বুদ্ধিমান হয়ে গেলে না তোমার পর আমরা নির্বোধ হয়ে গিয়েছি। সে উত্তর দিল,

لاتجزعن يا ابا اسحاق فانما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون

হে আবু ইসহাক! (হযরত সা'দের পদবী) আপনি অস্থির হবেন না। এই-ই তো বাদশাহী। দিবসে এ নিয়ে একদল স্ফূর্তি করে আর রজনী ভাগে আরেক দল এর অধিকারী হয়।

হযরত সা'দ (রা) বললেন, اراكم والله ستجعلون ملكا

আল্লাহ'র কসম! আমার পূর্ণ ধারণা হচ্ছে যে, তোমরা খিলাফতকে বাদশাহীতে (রাজতন্ত্রে) পরিণত করে ছাড়বে।

এমনিভাবে তার গভর্ণর পদে নিয়োগের ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ

(রা)ও অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। অলীদ গভর্ণর হয়ে কুফায় আগমন করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ? ماجاء بك

তুমি কি জন্যে এসেছ ?

সে উত্তরে বলল, جئت أميرا

আমি কুফার গভর্নর হয়ে এসেছি।

তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) প্রকার ভেদে হযরত সা'দ (রা)-এর কথারই প্রতিধ্বনি করলেন, এবং বললেন, ما ادرى اصلحت بعدنا ام فسد الناس

টের পাচ্ছি না যে, আমরা মদীনা থেকে আসার পর তুমি কি সংশোধিত হয়েছ না কি দুনিয়া জোড়া মানুষের অবক্ষয় ঘটেছে ?

হযরত ইবনে মাসঊদের (রা) পদচ্যুতির নির্দেশ কুফার প্রচার হয়ে গেলে তার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ দলে দলে তার কাছে জমায়েত হয়ে আবেদন জানাল যে, আপনি খলীফার নির্দেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এতে খলীফা যদি আপনার উপর শক্তি প্রয়োগ করে তবে কুফাবাসীরা আপনার জান নিসার হয়ে যাবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সংকল্পে কোন শৈথিল্য আসেনি। ব্যক্তি স্বার্থও তার গতিরোধ করতে পারেনি এবং রাজ-লিপ্সাও তাঁকে টলাতে পারেনি। সুতরাং খলীফার নির্দেশ পালনার্থে তিনি অগণিত ভক্তকে কেবল মাহরূম ও নৈরাশ করাই নয় বরং তাদেরকে অসন্তুষ্ট করাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। কেননা তিনি আমীরের আনুগত্যকে রাসূল করীম (সা)-এর আনুগত্যের সমতুল্য মনে করতেন। এবং স্বীয় দূরদর্শী-তার মাধ্যমে তিনি অবলোকন করেছিলেন যে খলীফার নির্দেশ অমান্য করলে ফিতনা ও বিশৃংখার দিগন্ত খুলে যাবে। যার পরিণতিতে গোটা উম্মতকেই এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তিনি বৃহত্তর কোন পদের প্রত্যাশী ছিলেন না এবং পদাধিকার বলে মানুষের শ্রদ্ধা ভাজন হওয়া ও তাঁর পসন্দ ছিল না।

খলীফার নির্দেশ লংঘন করে স্বীয় পদে বহাল থাকা সম্পর্কীয় ভক্তদের আবেদন তিনি অনুমোদন করতে পারলেন না। তিনি বললেন যে, আমীরুল মুমিনীনের আজ্ঞা পালন করা আমার উপর ফরয। আমি চাইনা যে বিশ্বগ্রাসী ফিত্নার সূত্রপাতে আমার অংশীদারীত্বের ছাপ থাকুক। বোধ হয় একথাও তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে যে 'একজন ইলমের খাদিম হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত যে, তিনি সরকারী দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। এখন নিরিবিলিতে ইলমী খিদমতে অভিনিবিষ্ট হওয়ার

সুযোগ পাবেন। সুতারং তিনি শিষ্যবৃন্দের এক বিরাট জামা'আত নিয়ে হেজাযের পথে রওনা হলেন। কূফা ত্যাগের যে কারণসমূহ বর্ণনা করা হল, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত কিন্তু মৌল রহস্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, নবী (সা) এর সান্নিধ্যের দুর্বার আকর্ষণ তাঁকে মদীনার প্রত্যাবর্তনের জন্য উন্মত্ত করে তুলেছিল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর এ ঘটনা নেতার আনুগত্যের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিতে এ ধরনের বহু উপমা আপনার দৃষ্টি গোচর হবে। একটু পূর্বেই হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কাদেসিয়ার বিজয়ের পর খলীফা কর্তৃক তাঁর পদচ্যুতির ফরমান আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভর্ণরী ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন। হযরত আবু যর (রা) ছিলেন এ ধরণের একজন মুত্তাঊল আমূর বা আজ্ঞানুগত সাহাবী। ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে তাঁর জীবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর মত তিনি ও ইসলাম গ্রহণান্তে বায়তুল্লাহ'র চত্বরে দাঁড়িয়ে তাওহীদের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর মত তাঁকেও মুশরিকদের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।[১] এই মহিমান্বিত সাহাবীদ্বয় কোন দুর্বলতা ও চাপের সম্মুখীন হয়ে স্বীয় পথ বর্জন করেননি। আখিরাতের চিন্তাই মূলত তাঁদেরকে এ কাজে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁরা ভাবতেন যে, আমীরের অবাধ্যতার মাঝে রাসূলে করীম (সা)-এর অসন্তুষ্টি নিহিত থাকে আর রাসূলে পাক (সা)-এর অসন্তোষ মানুষকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করে যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তাঁদের যত সব জীবন সাধনা। তাঁদের দৃষ্টিতে এ পৃথিবী জীবন যাত্রার এক তরণী বৈ কিছু নয়। তাই তাঁরা নিজ পদকে কখন মূল উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য করতেন না, যার ফলে তা পরিত্যাগ করতে তাঁদের মনে বিন্দু মাত্র ব্যথ্যা ও দ্বন্দের ছোঁয়া লাগেনি। সাধারণ ঐতিহাসিক-গণ তাঁর (ইবনে মাসউদের) কূফা ত্যাগের কারণসমূহ বা পটভূমিকা হিসেবে উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন সিনানের সূত্রে আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, অলীদের গভর্ণরীর যুগে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কূফার জামে মসজিদে দণ্ডায়মান হয়ে এই ঘোষণা দিলেন যে, "হে কূফাবাসী! আজ আমি তোমাদের কোষাগারে এক লক্ষ দিরহাম ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি। যে সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে আমাকে কোন্

১. ইসাবা।

নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং তার দায় দায়িত্ব থেকে আমাকে পরিত্রাণ ও দেয়া হয়নি।" এ ঘটনা খলীফা মদীনায় পেঁছালে হযরত উসমান (রা) তাঁকে বায়তুল মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁকে মদীনায় ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উসমান (রা) উপলব্ধি করে ছিলেন যে, কুফাবাসীরা ইবনে মাসউদকে অপমান ও দুর্ণাম করতে সচেষ্ট। তাই খলীফা তাঁকে মদীনায় ডেকে আনেন। সম্ভবত এই অপবাদের মন কষ্টেই পরবর্তীতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ কথা সম্মুখে বর্ণিত হবে।

হযরত আবু যর (রা)-এর জানাযায়

মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু যর (রা)-এর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্পষ্ট ভাষী ছিলেন। খোলা মাহফিলে তিনি মানুষকে নসীহত করতেন। পার্থিব সম্ভোগ ও লাভ লোকসান তাঁর দৃষ্টি সীমার বাইরে থাকত। তাঁর ত্যজন স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছিলেন,

حدثني ابو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا بلغ البناء بالمدينة سلعا قدمت الشام فكنت بها فذكر الحديث نحوه

হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল আকরাম (সা) আমাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেন—মদীনায় জনবসতী যখন সিলা' পর্যন্ত পেঁছবে তখন তুমি শামে চলে যেও। সুতারং পরবর্তীতে এরূপ হলে আমি শামে চলে গেলাম।

কিন্তু শামে তাঁর খোলাখুলি উপদেশ ও নসীহতের ফলে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর প্রতি জনমনে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দেয়।[১] পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার আশংকায় হযরত উসমান (রা) তাঁকে মদীনায় চলে আসার নির্দেশ দেন। কিন্তু এখানে ও তাঁর সত্য কথন ও স্বার্থহীন উপদেশের ফলে পরিবেশ অন্য পথে মোড় নিতে শুরু করে। অবশেষে হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আবু যর (রা)-এর সুবিধার্থে তাকে রবজায় যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং এ জন্য তার প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও সরবরাহ করে দেন। হযরত আবু যর (রা) তাঁর অন্তিমকাল পর্যন্ত সপরিবারে সেখানেই বসবাস করেন।

---

১. ইকদুল ফরীদ ৫ম খণ্ড ৫৪ পৃষ্ঠা।

''হিজরী ৩২ সনে তিনি রোগ শয্যায় শায়িত হন আর ইহাই ছিল তাঁর জীবনের অন্তিম শয্যা। দিনে দিন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ছিল হজ্জ-এর মওসুম। ছোট্ট পল্লী রবজা ও জন শূন্য হয়ে গেল। সবাই হজ্জে রওনা হয়ে গিয়েছে। তাদের ফিরে আসতে যথেষ্ট বিলম্ব হবে। হযরত আবু যর (রা)-এর স্ত্রী ভেবে অস্থির হয়ে ওঠলেন এ মুহূর্তে তিনি একাকিনী কি করতে পারেন ? কোথেকেই বা তিনি অর্থ সংগ্রহ করবেন ? কি করেই বা তাঁকে সমাধিস্থ করবেন। বুক ফাটা কান্নায় তিনি ভেঙে পড়েন। হযরত আবু যর (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রিয়ে কান্নাকাটি করোনা। একদা আমার প্রাণপ্রিয়তম হযরত রাসূল করীম (সা) ইরশাদ করেন যে, তোমাদের এক ব্যক্তি জনশূন্য প্রান্তরে দেহত্যাগ করবে কিন্তু একদল সভ্রান্ত মুসলমান তাঁর জানাযায় এসে উপস্থিত হবে।'' আমি চিন্তা করে দেখেছি যে, মহানবী (সা) যাদের সম্মুখে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, এ জন মানবহীন পল্লীতে একদল মুসলিম অবশ্যই আসবে। তুমি সড়কের দিকে দেখ কেউ আসছে কি না। তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন আজ ত ৮-ই জিল হজ্জ। যারা হজ্জে যাওয়ার তারা সকলেই এখন সেখানে পৌঁছে গেছে। রাস্তা এখন জন শূন্য। হযরত আবু যর (রা) বললেন, আমার প্রিয় নবীর কথা মিথ্যা হতে পারে না। তুমি রাস্তায় গিয়ে দেখ অবশ্যই একদল লোক আমার জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হবে। হযরতের স্ত্রী বলেন যে, একথা শুনে আমি রাস্তায় চলে গেলাম। অকস্মাৎ আমি দেখতে পেলাম যে, একটি কাফেলা এদিকেই আসছে। নিকটে আসলে তাঁরা আমার ব্যাকুলতা দেখে থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ ভাবে ছটফট করছ কেন ? বললাম একজন মুসলমান জীবনের অন্তিম ক্ষণে উপস্থিত। সে কপর্দক শূন্য। দয়া করে আপনারা তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে যান। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। কাফেলার লোক পরিচয় জানতে চাইলে আমি উত্তর দিলাম তিনি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী আবু যর (রা)। এ কথা শুনে কাফেলার ভিতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সকলে চিৎকার করে উঠল তাঁর উপর আমাদের জনক জননী উৎসর্গ হোক। এই বলে তারা সবাই সওয়ারী বেঁধে ফেললেন। অতঃপর বোরুদামান অবস্থায় সকলে তাঁবুর দিকে ছুটে আসলেন।

এ দিকে আবু যর (রা) তাঁর স্ত্রীকে কাফেলার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার পর

স্বীয় কন্যাকে বললেন যে, একটা বকরী যবাই করে গোশ্‌ত রান্না করে ফেল। এরূপই মেহমান আসবে। আর শোন! আমাকে সমাধিস্থ করবার পর তারা হয়ত চলে যেতে চাইবে, কিন্তু তাদেরকে অনাহারে যেতে দিওনা। তাদেরকে বলবে যে, আবু যর আপনাদেরকে কসম দিয়েছে যে, এখান থেকে না খেয়ে আপনারা চলে যাবেন না।[১] আবু যর শুনয়া তখন একটা বকরী যবাই করে তার গোশত উনুনে চাড়িয়ে দিলেন।

এ আগন্তুক দল ইয়ামানের অধিবাসী ছিল। হযরত আবু যর (রা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হায় আজ যদি আমার কাছে কাফনের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় ও থাকত! দেখ তোমরা কোন শাসক ও কোন এলাকার প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারীর কাপড় দ্বারা আমার কাফন দিওনা। এ কাফেলায় এক আনসারী যুবক ছিল। তিনি বললেন, আমার মধ্যে আপনার উল্লিখিত সকল শর্তাবলী বর্তমান আছে। আমার নিকট আমার মায়ের হাতে বোনা দু'টি চাদর আছে এবং আমার গায়ের চাদরটিও আপনার শর্ত বহির্ভূত নয়। এ তিনটি দ্বারা আপনার কাফন দেয়া যাবে। হযরত আবু যর (রা) শুকরিয়া আদায় করে বললেন, তুমি আমার মনের কুণ্ঠা দূর করেছ। এর পর হযরত আবু যর (রা) বললেন, তোমরা আমাকে কিবলা মুখী করে দাও। সকলে ধরা ধরি করে তাঁকে কিবলা মুখী করে দিলেন। মুহূর্তের ভিতর এ নশ্বর জগত পরিত্যাগ করে তাঁর রূহ অনন্তের পথে যাত্রা করল। রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। অতঃপর তারা তাকে গোসল দিয়ে আনসারী যুবকের কাপড় দ্বারা সমাহিত করলেন।

এ ভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। এবারে দেখুন যার গোসল ও কাফনের কোন ব্যবস্থা ছিল না আল্লাহ্ কিভাবে তার আত্মীয়স্বজন ও সুশৃংখল জানাযার ব্যবস্থা করলেন।

জানাযার জন্য কফিন রাস্তায় নেয়া হল, এমন সময় দেখা গেল দূর থেকে একদল কাফেলা এগিয়ে আসছে। এ ছিল সেই মুহূর্ত যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কুফা ত্যাগ করে মদীনার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু হজ্জের মওসুম হওয়ায় তিনি শিষ্য বৃন্দ সহ ইহরাম বেঁধে মক্কার পথ ধরেন। কুফা থেকে মক্কাগামী সড়কের পার্শ্বেই রবজা পল্লীর অবস্থান ছিল। এই-ই-তো হলো অদৃশ্য লোকের সুশৃংখল ধারা যে জীবনের পুরাতন দোস্ত ও

১. বুখারী ৫ম খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা।

ইসলামী বন্ধুর শেষ কৃত্যে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁকে অজ্ঞাত সারে এ পল্লীতে আগমণ করতে হল। পল্লীর রাস্তা অতিক্রম কালে রাস্তার উপর জানাজা দেখে তিনি জানতে চাইলেন যে, ইহা কার কাফন ? উত্তর এল, এ হলো নবীজী (সা)-এর প্রিয়তম সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা)। কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি এ ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তাঁর জানাযা ও দাফন কার্যে আপনি আমাদের সহায়তা করুন।

ইবনে আশ্দিল খার বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এ কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন। পাগল প্রায় হয়ে তিনি উষ্ট্র থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর ক্রন্দন দেখে শোকাহত জনতার মাঝে কান্নার লহরী-তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন,

ওগো আমার ভাই ! ওগো বন্ধু !! তোমার মোবারকবাদ, তুমি ধন্য হও। রাসূলে করীম (সা) তোমার সম্পর্কে বলেছিলেন, "আবু যর একাকী চলে একাকী তাঁর মৃত্যু হবে। আর আল্লাহ তা'আলার সমীপেও একাকী উপস্থিত হবে।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-কে সকলে জানাযা পড়াবার দরখাস্ত করলেন। জানাযা সম্মুখে রাখা হল। আবু যর (রা)-এর সৌভাগ্য বলতে হবে যে, এমন এক মহান ব্যক্তি তাঁর জানাযায় ইমামতি করলেন, যার সম্পর্কে হুযুর আকরাম (সা) বলেছিলেন যে, "ইবনে মাসউদ-এর মর্জী আমারই মর্জী"। মহানবী (সা) তাঁর ইলমের উপর নির্ভর করার তাগিদ করেছিলেন। জানাযার সারিতে এমন একদল লোক দণ্ডায়মান ছিলেন, যাদের ইসলাম সম্পর্কে রাসূল পাক (সা) সত্যায়ন করেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কেও ভাগ্যবান বলতে হবে যে, প্রথম জীবনের বন্ধু, প্রথম সারির সাহাবী এবং প্রাণ প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের জানাযায় হাযির হয়ে স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। ইতিহাসে হযরত আবু যর (রা)-এর জানাযায় অংশ গ্রহণ কারীদের নাম সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের একদল হলেন ইয়েমেন থেকে আগত নাখঈ গোত্রের লোক এবং দ্বিতীয় দল হলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও তাঁর শিষ্য বৃন্দ।

জানাযার পর হযরত আবু যর (রা)-কে সমাহিত করা হল। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁবুতে এসে শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজের মনকেও প্রবোধ দিলেন। কিছুক্ষণ পর পরিবার ও জনতা ঈষৎ শান্ত হলে তিনি বিদায় নিতে চাইলেন। হযরত আবু যর (রা)-এর কন্যা বললেন, আপনারা কোথায় তাশরীফ নিচ্ছেন। আসবাক্তান অতিথ

কসমে শপথ করে বলে গেছেন যে, এখান থেকে কিছু না খেয়ে আপনারা চলে যাবেন না। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি বকরী যবাই করে খাবার তৈরী করতে বলেছিলেন। এখন তা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এই বলে তিনি তাঁদের সম্মুখে গোশতের পেয়ালা রেখে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ তখন এই ভেবে হতবম্ভ হয়ে গেলেন যে, মৃত্যু পারের যাত্রী মরণম্মুখ অবস্থায়ও আগত মেহমানদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করে গেলেন। এদিকে পরিবারের সবাই তাদেরকে খাদ্য গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু ব্যথা ভারাক্রান্ত এই পরিবেশে তাঁর বেদনাহত হৃদয় কিছুতেই খাদ্যাহরণে প্রস্তুত হচ্ছিল না। কিন্তু শোকাতুর পরিবার ও তাঁর মৃত বন্ধুর অন্তিম অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি কোন ক্রমে কয়েক টুকরা গোশত ভক্ষণ করলেন অতঃপর তিনি মক্কায় রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি হযরত উসমান (রা)-কে এই বেদনাবিধুর সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবাদ শুনে হযরত উসমান (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হন। ফিরবার পথে তিনি মদীনার মূল পথ ছেড়ে রবজার পথ ধরলেন। সেখানে গিয়ে হযরত আবুযর (রা) এর কবর যিয়ারত এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাদেরকে সঙ্গে করে মদীনায় পেঁছেন। ত্বরারীর অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) স্বয়ং তাদেরকে হযরত উসমানের নিকট নিয়ে যান এবং তাদেরকে খলীফার তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করেন।

অন্তিম শয্যায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা)

মক্কা থেকে উমরা আদায় করে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মদীনায় রওনা হয়ে গেলেন। হিজরী ৩২ সনে যখন তাঁর বয়স ৬০ বা (মতান্তরে) ৭০ বছর তখন একদিন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে আপনার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত না করেন। আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, হযরত রাসূল আকরাম (সা) একটি উচু মিম্বরে উপবিষ্ট আর আপনি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আপনাকে বলছেন যে, ইবনে মাসউদ। আমার পরে তোমাকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। এখন আমার কাছে চলে এসো। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, সত্যিই কি তুমি এ স্বপ্ন দেখেছ? আগন্তুক বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি হুবহু এই স্বপ্নই দেখেছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, বোধ হয় তুমি অচিরেই আমার জানাযায় অংশ গ্রহণ করে মদীনা থেকে কোথা ও চলে যাবে।

আগন্তুকের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছিল। কিছু দিনের ভিতরই হযরত

ইবনে মাসউদ (রা) শয্যাশায়ী হলেন। ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেশবাসী তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেল। হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখবার জন্য শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে চিকিৎসার গ্রহণের জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করলেন কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। দু'বছর পর্যন্ত তিনি সরকারী ভাতা নেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[১] হযরত উসমান (রা) তাঁকে পুনরায় তা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু তিনি অসম্মতি জানিয়ে বললেন, আমি যখন জীবিত থাকছিনা তখন ভাতা দিয়ে কি হবে। হযরত উসমান (রা) বললেন, "আপনার কন্যাদের তা কাজে আসবে।" হযরত আবদুল্লাহ (রা) তখন বললেন যে, "আপনি হয়ত ভেবে চিন্তিত হচ্ছেন যে, আমার মৃত্যুর পর তারা অসহায় হয়ে পড়বে কিন্তু না আপনি ভাববেন না। আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি প্রতি রজনীতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে সে কখনও অভুক্ত থাকবে না। তাই আমি আমার কন্যাদেরকে প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পড়ার তাগিদ করেছি।[২]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর রোগ শয্যায় হযরত উসমান (রা)-এর এ উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে তাদের মাঝে কোন মন কষা কষি ছিল না। সুতরাং ত্বাবাকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা (হযরত উসমান (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)) পরস্পর প্রসন্নচিত্ত ছিলেন।

وقال قائل صلى عليه عثمان بن عفان واستغفر كل واحد منهما لصاحبه قبل موت عبد الله قال وهو الثبت عندنا ان عثمان بن عفان صلى عليه

১. আল্লামা জাহ্‌বী বলেন, হযরত উমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) স্বয়ং ভাতা নেওয়া বন্ধ করে দেন।—সিয়ারে আলা মুসুবালা, ৩৫৫ পৃষ্ঠা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুরূপ দু'আ ও করতেন। তিনি বলতেন—

اللهم وسع على فى الدنيا و زهدنى فيها ولا تزوها و ترغبنى فيها

হে আল্লাহ! আমাকে স্বচ্ছলতা দান কর। উহা থেকে আমাকে নিস্পৃহ করে দাও। আর দুনিয়ার ভালবাসাসহ আমার মৃত্যু দিও না।—আল ইকদুল ফরীদ ৩য় খণ্ড ১৬৯ পৃষ্ঠা।

২. আত্তাবাকাতুল কুব্‌রা ৩য় খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা) তাঁর (ইবনে মাসউদ (রা)-এর) জানাযার নামাযে ইমামতি করেছেন এবং তাঁরা উভয়ে ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে পরস্পরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর এ কথাই অধিক প্রমাণ নির্ভর যে, হযরত উসমান (রা)-ই তাঁর জানাযা পড়িয়েছেন।

অসীয়ত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর অন্তর মূলে যখন পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমাবার সময় আগত প্রায় তখন হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়রকে ডেকে নিজ পরিবার, সম্পত্তি এবং দাফন-কাফন সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় ওসীয়ত করলেন। হযরত ওরওয়া তাঁর সম্পত্তি সম্পর্কীয় ওসীয়ত প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দেন তা নিম্নরূপ:—

ان عبد الله بن مسعود اوصى الى الزبير وقد كان عثمان حرمه عطاءه سنتين فاتاه الزبير فقال ان عياله احوج اليه من بيت المال فاعطاه عطاءه عشرين الفا او خمسة عشرين الفا

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হযরত যুবায়রকে স্বীয় 'অছী' (মৃত্যুকালে যার কাছে অসীয়ত করা হয়) বানিয়ে যান। হযরত উসমান (রা) হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর মনবাঞ্ছা, অনুসারে দু'বছর পর্যন্ত তাঁর সরকারী ভাতা স্থগিত রেখেছিলেন। হযরত যুবায়র তাঁর কাছে এসে বললেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর মূলতবীকৃত ভাতা তাঁর পরিবারকে দিয়ে দেয়া হোক। বায়তুল মালে তা রেখে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তখন হযরত উসমান (রা) বিশ হাজার মতান্তরে পঁচিশ হাজার দিরহাম তাঁর পরিজনকে দিয়ে দেন।[১]

মূলতঃ উভয়ের মাঝে কোন অসন্তোষই ছিল না। আর যদি সাময়িক মত দ্বন্দ্ব মেনেও নেয়া হয় তবে আমরা বলব যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর ইন্তিকালের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে তার অবসান ঘটেছিল। যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। এজন্যই ত দেখতে পাচ্ছি যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর ইন্তিকালের পর স্থগিত ভাতা চাওয়া হলে হযরত উসমান (রা) নির্দ্বিধায় তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিকট অর্পণ করেন।

১. আত্তবাকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড।

কাফন সম্পর্কে তিনি অসীয়ত করেন—

ان ابن مسعود اوصى ان يكفن فى حلة بمائى درهم

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অসীয়ত করেন যে, তাঁকে যেন দু'শ' দিরহাম মূল্যের কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়।

ইন্তিকাল ও দাফন

উবায়দা বিন আবদুল্লাহ বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাঁর দাফন সম্পর্কে অসীয়ত করেন—

ادفنونى عند قبر عثمان بن مظعون

তোমরা উসমান বিন মাজউন (রা)-এর সমাধি পার্শ্বে আমার কবর দিও।

তাঁর এই অন্তিম বাসনানুসারে জান্নাতুল বাকী'তে উসমান বিন মাজউন (রা)-এর কবরের পার্শ্বেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ৩৩ হিজরী সনের ৩রা জামাদিউল উলা রোজ বৃহস্পতিবার তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। রাজিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। হযরত আম্মার কে তিনি জানাযার ইমামতি করবার জন্য অসীয়ত করেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, হযরত উসমান (রা) তাঁর জানাযা পড়ান। যদিও অনেক ঐতিহাসিক হযরত উসমান (রা) এবং ইবনে মাসউদ (রা)-এর মাঝে পরস্পর মনমালিন্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে তারা এ পর্যন্ত ফলাও করে লিখেছেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হযরত উসমানের এর কাছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেঁাছাতে বারণ করেছিলেন। সে অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর হযরত উসমানকে সংবাদ জানানো হয়নি এবং আম্মার বিন ইয়াসির (রা) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কিন্তু তাদের এসব উক্তি সম্পূর্ণ রূপে ভিত্তিহীন। বরং নির্ভর যোগ্য দলীল ভিত্তিক বর্ণনা অনুযায়ী একথাই স্বতসিদ্ধ যে, হযরত উসমান (রা)-ই তাঁর জানাযার ইমাম ছিলেন। ইবনে সা'দ একথার সত্যতা সম্পর্কে জোর দাবী করেছেন। মৃত্যুর সময় হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বয়স ছিল ৭০ বছরের কিছু অধিক। তখন ছিল হিজরী ৩৩ সাল।

বিবাহ প্রসঙ্গ

বনু ছকীফা গোত্রের আবদুল্লাহ বিন মু'আবিয়ার কন্যা যয়নবকে তিনি বিবাহ করেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ একমত। আল্লামা জাহবী

তবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে রীতাহ্ বা রায়েতাহ্ নামের আরো এক স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনে সা'দের বরাত দিয়ে বলেন যে, তার বর্ণনা মতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সহধর্মিনীর সংখ্যা ছিল দু'জন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর এক বাঁদী ছিল ইনি পরবর্তীতে "উম্মি ওয়ালিদ" (ইবনে মাসউদ (রা)-এর ঔরস জাত সন্তানের জননী) হওয়ায় অনেকে তাকে তাঁর স্ত্রী হিসাবে গণ্য করেছেন। ইনি হস্ত-শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন এবং তা দ্বারা অল্প বিস্তর রোজগার করতেন।

সন্তান সন্ততি

তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম যথাক্রমে আবদুর রহমান, উতবা ও আবু উবায়দা। আবু উবায়দা ইবনুল ফকীহ্ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম সন্তান আবদুর রহমান কাসিম ও মা'ন নামের দুই সন্তানের জনক ছিলেন। উত্বার আবু আমীছ নামের এক পুত্র সন্তান ছিল। হযরত ইবনে মাসউদের কন্যার নাম ছিল সারা।[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ১৭ হিজরীতে কুফার গভর্ণর হয়ে আসেন। এ বছরই তাঁর ছেলে আবদুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন।[২] তাঁর মৃত্যু ঐতিহাসিকদের এক বর্ণনা অনুসারে ৩২ হিজরীতে হলে তখন আবদুর রহমানের বয়স ছিল ১৫ বছর এবং অন্য রিওয়ায়েত হিসাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইন্তিকাল ৩৩ হিজরীতে হলে তখন আবদুর রহমানের বয়স ১৬ বছর। এখন প্রশ্ন হয় যে, মুহাদ্দিসগণ এ কথা কি হিসাবে বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর ইন্তিকালের সময় আবদুর রহমান ছয় বছরের বালক ছিল। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ তাঁর ছোট ছেলে আবু উবায়দা তখন ছয় বছরে উপনীত হয়েছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তার ও আবদুর রহমানের নাম নির্ণয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হলে আবু উবায়দার স্থলে আবদুর রহমানের নাম বলেছিলেন। ইমাম বুখারী (র)-এর প্রণীত "তারীখে সগীর" এর মাঝে আমরা একথার প্রমাণ পাই। বলা হয়েছে—

لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبدالرحمن يا ابت اوصنى
قال ابک على خطيئتك مات سنه ٣٢ ه

---

১. সিয়ারে আ'লামুন নুবালা ৩৪৩ পৃষ্ঠা

২. সিয়ারে আ'লামুন নুবালা।

হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তদীয় পুত্র আবদুর রহমান তাঁকে বললেন, আব্বাজী আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, বৎস। স্বীয় গুনাহ্র কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র দরবারে রোনাজারী কর। তিনি হিজরী ৭৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

এর পরেই উল্লেখ আছে যে, তাঁর পুত্র আবু উবায়দা ও পিতার কাছে উপদেশ চেয়েছিলেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আজালী বলেন যে,

وقال انه لم يسمع من ابيه الا حرفا واحدا محرم الحلال كمستحل الحرام

আবু উবায়দা তার পিতার নিকট থেকে কেবল এতটুকুই শ্রবণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে, সে অবৈধকে বৈধকারীর মত সমপর্যায়ের গুণাহগার হবে।

মু'আবিয়া বিন ছালেহ হযরত ইবনে মুঈনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আবু উবায়দা তার পিতা ইবনে মাসউদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। সুতরাং ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতার কাছে কোন হাদীস শুনেননি তাতে বিস্মিত না হয়ে পারি না। ইবনে আবি হাতিম তাঁর পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে,

هل سمع ابو عبيده من ابيه شيئا

আবু উবায়দা কি তাঁর পিতার কাছ থেকে কোন হাদীস শুনেছেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন—يقال انه لم يسمع লোকেরা বলে থাকে যে, তিনি তাঁর পিতার থেকে কিছুই শুনেননি। অতঃপর তিনি বলেন—

قال عبد الواحد بن زياد يروى عن ابى مالك الاشجعى عن عبد الله بن ابى هند عن ابى عبيدة قال خرجت مع ابى الصلاة الصبح

আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ আবু মালিক আশজায়ী থেকে আর আবু মালিক আবদুল্লাহ্ বিন আবি হিন্দ থেকে এবং তিনি আবু উবায়দা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু উবায়দা বলেন, আমি পিতাজীর সঙ্গে ফজরের নামায আদায়ে গিয়েছিলাম।

এরপর তিনি বলেন—

مادرى ماهذا وما ادرى عبد الله بن ابى هند من هو

আমি জানিনা এর সত্যতা কতটুকু এবং আবদুল্লাহ্ বিন আবি হিন্দকে তাও আমি বলতে পারি না।

হাফিয ইবনে হাজার আত্তাহজীবুত্তাহজীব গ্রন্থে বলেন যে, ইবনে আবি হাতিমের কিতাব "আলজারহ ওয়াত্তা'দীল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে একথা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে যে—ابو عبيدة سمع اباه "আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট হাদীস শুনেছেন"।

ইবনে হাজার আরো বলেন—

وقال الدارقطني ابو عبيدة اعلم بحديث ابيه من خصيف بن مالك ونظرائه

আবু উবায়দা তাঁর পিতার হাদীস সম্পর্কে খসীফ বিন মালিক তার সমসাময়িকদের থেকে অধিক পারদর্শী।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল মলকিন "কিতাবুল উম্ম" এর টীকায় বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবেন মাসউদ (রা)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর পুত্র আবু উবায়দার বয়স ছয় বা সাত বছর।[১] অতএব মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি অনুযায়ী তার হাদীস "হাদীসে মুনাকাতি" (যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র বিচ্ছিন্ন) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কোন কোন মুহাদ্দিস আবু উবায়দাকে আমের নামেও অবহিত করেছেন। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ সুফিয়ান সাওরী এবং শারীক উভয়ে বলেন যে, আবু উবায়দা তাঁর পিতার কাছে হাদীস শ্রবণ করেছেন। প্রসিদ্ধ রাবী ইস্রাঈল আবু উবায়দার سمعت (আমি পিতাজীর কাছে শুনেছি) শব্দটি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। তামীস বিন সালমার সূত্রে ইমাম আ'মাশ বলেন যে—

كان ابو عبيدة اشبه صلاة بعبد الله فرأيته وما يحرك شيئا وما يطرف

আবু উবায়দার নামায তাঁর পিতা আবদুল্লাহ (রা)-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আমি তাঁকে নামায পড়তে দেখেছি। নামাযে তিনি হেলতেন না বা নড়াচড়া করতেন না।[২] ইমাম বুখারী (র) তার আত্তারীখুল কবীর গ্রন্থে কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন—

انه سأل اباه عن بعض الحمام فقال صوم يوم

আবু উবায়দা তাঁর পিতার নিকট 'বীজে হাম্মাম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, একদিনের রোযা।

---

১. কিতাবুল উম্ম এর টীকা-১ম খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠা।

২. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১ম খণ্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা।

মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ নামক কিতাবে-ইসমাঈল বিন আবি খালিদ থেকে বর্ণিত আছে।[1]

عن اسماعيل بن أبى خالد قال أوصى ابن مسعود ابا عبيدة بثلاث كلمات اى بنى اوصيك بتقوى الله وليسعك بيتك وابك على خطيئتك

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর পুত্র আবু উবায়দাকে তিনটি উপদেশ দেন। তিনি বলেন, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বদা ভয় করবে আর অবসর মুহূর্তগুলো নিজ গৃহে কাটাবে[2] এবং স্বীয় গুনাহর কথা স্মরণ করে কান্না কাটি করবে।

বিবিধ ঘটনা

একবার তিনি তাঁর বন্ধু আবু 'উমাইর এর সাক্ষাত করেপ তাঁর বাড়ীতে যান। ঘটনাক্রমে আবু 'উমাইর তখন বাড়ীতে ছিলেন না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তখন বন্ধু পত্নীর কাছে সালাম পাঠালেন এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি চাইলেন। গৃহে তখন পানি ছিল না। তাই একজন বাঁদীকে পড়শীর বাড়িতে পানির জন্য পাঠিয়ে দেয়া হল। বাঁদীটির ফিরে আসতে অনেক বিলম্ব হলে আবু 'উমাইরের স্ত্রী গোস্বায় তাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তা শুনে আর দেরী করলেন না তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ফিরে আসলেন। কয়েকদিন পর আবু 'উমাইরের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে তিনি সে দিন ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জবাব দিলেন যে, বাঁদীটি পানি আনতে বিলম্ব করলে তোমার স্ত্রী তাকে অভিসম্পাত করে। তখন আমি ভাবলাম যে, বাঁদীটি যদি লা'নতের যোগ্য না হয়ে থাকে তবে, এ লা'নত তোমার স্ত্রীর উপরই পতিত

---

১. তিবরানী ১০ম খণ্ড ২৯৯ পৃষ্ঠা।

২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ছাত্র ও ভক্তবৃন্দের সংখ্যা ছিল অগণিত। তাঁর সাহেবজাদাগণ তাদের কাছে আসা যাওয়া করলে তারা খুবই আদর যত্ন করতেন এবং উস্তাদের ছেলে জ্ঞানে অত্যন্ত সম্মান দেখাতেন। অল্প বয়সী বালকদের জীবন গড়ার পথে এসব ব্যবহার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাই হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বিশেষভাবে তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রকে নসীহত করলেন যে, অবসর মুহূর্তে বাড়ীর ভিতর থাকার চেষ্টা করবে। বাইরে অধিক আনাগোনা করবে না। তাতে বাড়ীর বড়দের সাহচর্যে চারিত্রিক প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবে।

হবে। আর আমিই এজন্য দায়ী হব। কেননা আমি রাসূলে করীম (সা) কে বলতে শুনেছি যে, কারুর উপর অভিশম্পাত করলে সে যদি এর যোগ্য না হয় তবে খোদ অভিশম্পাত কারীর উপরই তা ফিরে আসে।[১]

একবার তিনি একটি বাঁদী ক্রয় করেন। কিন্তু মূল্য আদায়ের পূর্বেই বিক্রেতা লাপাত্তা হয়ে গেল। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত তালাশ করেও তার কোন খোঁজ পেলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে হয়ে তিনি এক দুই দিরহাম করে বিক্রেতার নামে সদকা করতে লাগলেন। এর পরে ও তিনি সব সময় বলতেন যে, এখনো যদি আমি তার খোঁজ পাই তবে তার পূর্ণ মূল্য আদায় করে দেব আর এসব সদকা আমার পক্ষ থেকে যাবে।[২]

আতা বিন রাবাহ বলেন যে, আমি শুনেছি এক সফরে রাসূলে করীম (সা)-এর ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন হলে আড়ালে যেতে চাইলেন কিন্তু ঘটনা ক্রমে স্থানটি খুবই খোলামেলা ছিল। তিনি দু'জায়গায় দুটি বৃক্ষ দেখে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললেন যে, ইবনে মাসউদ! তুমি বৃক্ষ দু'টির কাছে গিয়ে বল যে, আল্লাহ'র রাসূল তোমাদের কাছে এই পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, তাঁকে আড়াল দেবার জন্য তোমরা পরস্পর মিলিত হয়ে যাও এবং তাঁর প্রয়োজন সমাধা না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাদের কাছে গিয়ে মহানবী (সা)-এর ফরমান জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এক স্থানে চলে আসল। তখন রাসূল পাক (সা) তাদের আড়াল নিয়ে প্রয়োজন নিষ্পন্ন করেন।

---

১. মুসনাদে ইমাম আহমদ।
২. বুখারী শরীফ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইলমী বৈশিষ্ট্য

এর পূর্বে তাঁর জীবনালেখ্যে আমরা বলেছি যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মহানবী (সা)-এর আরকাম গৃহে প্রবেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন তিনি তাঁদেরই একজন। নিজকে তিনি ৬ষ্ঠ মুসলিম বলে ধারণা পোষণ করতেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি পনর-বিশ বছরের মাঝামাঝি বয়সের ছিলেন।

রাসূল করীম (সা)-এর প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর অন্তরে ইসলামের হক্কানিয়াত ও সত্যতা দৃপ্ত হয়ে ওঠে। (সত্যানুসন্ধান ও জ্ঞান আহরণের জন্য সদা উন্মুখ ছিল তাঁর মন যার ফলে) আদপেই তিনি রাসূল (সা) সমীপে علمني من هذا القول (আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন) বলে মূলতঃ তাঁর ইলম-অনুসন্ধিৎসারই প্রকাশ ঘটিয়ে ছিলেন। রাসূল করীম (সা) জবাবে বলেছিলেন, انك عالم معلم তুমি হবে গোটা উম্মতের মুয়াল্লিম বা শিক্ষক। সুতরাং তিনি রাসূল পাক (সা) এর তিরোধান পর্যন্ত একনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ আত্মশুদ্ধি ও ইলমে কুরআনের বুৎপত্তিতে স্বীয় জীবনকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছিলেন। মহানবী (সা)-এর সান্নিধ্য লাভের সাথে সাথে যে সব সাহাবা নানাহ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ হয়েছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁদের অন্যতম।

প্রধান প্রধান সাহাবীদেরকে যত বাঁধা বিপত্তিও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে তিনি সকলের অংশী ও সঙ্গী ছিলেন। ইলম আহরণ ও তাতে পূর্ণতা অর্জনের সাথে সাথে তার প্রচার প্রসারে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-কে হযরত উমর (রা) ও আলী (রা)-এর সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া তাঁর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল যে, তাঁর শিষ্যবৃন্দের মাধ্যমেই হযরত আলী (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর ইলমের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। মুসলিম শরীফে আবু হিশাম আল মুগীরা থেকে বর্ণিত আছে—

لم يكن يصدق على على فى الحديث الا من اصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعنهم

"হযরত আলী (রা)-এর ঐসব হাদীসই নির্ভরযোগ্য যা হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্য বৃন্দের মাধ্যমে আমাদের নিকট পেশছেছে।" আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম তার ইলামুল মুকিঈন গ্রন্থে লেখেন

واما على ابن ابى طالب عليه السلام فانتشرت احكامه وفتاواه ولكن قاتل الله الشيعة فانهم افسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه ولهذا تجد اصحاب الحديث من اهل الصحيح لايعتمدون من حديثه وفتواه الا ما كان من طريق اهل بيته واصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلمانى وشريح وابى وائل ونحوهم وكان على رضى الله عنه وكرم الله وجهه يشكو عدم حملة العلم الذى اودعه كما قال ان ههنا علما لواصبت له حملة

হযরত আলী (রা)-এর বিভিন্ন মতামত ও সিদ্ধান্তাবলী প্রসার লাভ করেছিল কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়-আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে ধ্বংস করুন—অনেক মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত মতামত ও কথাবার্তা তাঁর পবিত্র নামের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়; যার ফলে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ তাঁর কেবল ঐসব আহকাম ও ফতোয়াগুলোই অভ্রান্ত ও সঠিক বলে বিবেচনা করে থাকেন যা তাঁর আহলে বায়ত ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্য বৃন্দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উবায়দা সালমানী শুরাইহ্ ও আবু ওয়ায়েল এবং তাঁদের মত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

হযরত আলী (রা) আফসোস করে বলতেন হায়, ইলমের আমানত গ্রহণ করবার মত বিশ্বাসী লোক আর নেই। আমার এ বুকে কত ইল্ম সঞ্চিত আছে। যদি বিশ্বস্ত কিছু বাহক পেতাম।

অন্যত্র তিনি হযরত আলী (রা)-এর বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে কুফাস্থ মুফতী ও আইন বিশারদগণের নাম হল, (১) আলকামা বিন কায়স নাখঈ (২) আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ নাখঈ (৩) আমর বিন শুরাহ্বীল হামদানী (৪) মাসরূক বিন আজদা' হামদানী (৫) উবায়দা সালমানী (৬) শুরাইহ্ বিন হারিছ (বিচারপতি) (৭) সুলায়মান বিন রবিয়া বাহেলী (৮) যায়দ বিন সওহান (৯) সুয়াইদ বিন গাফালাহ (১০) হাছের বিন কায়েস জু'ফী (১১) আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ নাখঈ (১২) আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ (বিচারপতি)

(১৩) খায়ছামা বিন আব্দির রহমান (১৪) সালমা বিন সুহাইব (১৫) মালিক বিন আমের (১৬) আবদুল্লাহ বিন ছানখারা (১৭) জুরাইন বিন আয়শ (১৮) খিলাস বিন আমর (১৯) আমর বিন মাইমুন আওদী (২০) হুমাম বিন হারিস (২১) হারিস বিন সুয়াইদ (২২) ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া নাখঈ (২৩) রবী' বিন খায়ছাম (২৪) উত্বা বিন ফারকদ (২৫) ছিলাহ বিন জুফর (২৬) শারীক বিন হাম্বল (২৭) আবু ওয়ায়েল বিন সালমা (২৮) উবায়দা বিন নুজলাহ উল্লিখিত সবাই হযরত আলী (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) উভয়ের শিষ্য। কিন্তু এর ভিতর হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ছাত্র সংখ্যাও কম নয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর এক বিরাট বৈশিষ্ট্য হল এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীন সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ্-এর সংকলক শায়খ অলী উদ্দিন (র) তাঁর লিখিত কিতাব "ইকমাল" এর মধ্যে লিখেন যে, চার খলীফা তাঁর উদ্ধৃতিতে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন।

অন্যান্য সাহাবাদের মধ্যে যারা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা), ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা), আবু উমামা বাহেলী (রা), আহনাফ বিন কাইস (রা), আবদুল্লাহ বিন 'উমাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত জাবির (রা), হযরত আনাস (রা) ও হযরত আনাস বিন মালিক (রা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সিহাহ সিত্তাহ'র মধ্যে যে সব সাহাবা হযরত ইবনে মাসউদ (রা), এর সূত্রে রাসূল করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেন তাঁরা হলেন (১) হযরত আনাস বিন মালিক (রা), (২) আহনাফ বিন কাইস (রা) (৩) তারিক বিন শিহাব (রা), (৪) আবু তুফায়েল আমের বিন ওয়াছিলা (রা) (৫), আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা), (৬) আবু মূসা আশ'আরী (রা), (৭) আমর বিন হারিস (রা), (৮) আমর বিন হারিস মাখজুমী (রা), ও (৯) হযরত ইবনে মাসউদ (রা),-এর পত্নী যয়নব (রা)।

এ সব বৈশিষ্ট্য ও তাঁর ব্যাপক ইলমী খিদমতের কারণে তিনি প্রথম সারির সাহাবীদের মাঝে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। হাবশায় হিজরতের ফলে দীর্ঘ দিন যাবত তাঁকে ঘর বাড়ি ও আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে বহির্দেশে অবস্থান করতে হয় কিন্তু তাঁর প্রধান অন্তর বেদনা ছিল মহানবী (সা)-এর সান্নিধ্য ও খিদমত থেকে বঞ্চিত ও মাহরূম হয়ে যাওয়া। যা তাঁর ইলমী

উৎকর্ষণকে স্থগিত করে রেখেছিল। মদীনায় আসার পর যদি ও বহু দিন পর্যন্ত তাঁকে অনুন্নত জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু নবুবী সান্নিধ্যের পরশে তিনি যে ইলমের অনন্ত সুধায় ছাতিফাটা পিপাসা নিবারণের সুযোগ পেলেন তা তাঁর সমস্ত দুঃখকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মক্কার নিয়মিত ভাবে তিনি রাসূল পাক (সা)-এর যে খিদমতে লিপ্ত থাকতেন এবং মদীনায় আসার পর পুনরায় তা হাতে নিলেন। নিরন্তর তিনি প্রিয় নবী (সা)-এর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। মানবিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে কখনো তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতেন না। ওহী নাখিল হলে তন্ময় হয়ে শ্রবণ করতেন এবং তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করার জন্য দেহ মনে অভিনিবিষ্ট হতেন। সার্বিক কাজ ও দায়িত্ব সম্পাদনে তিনি নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। যার ফলে রাসূল করীম (সা)-এর স্বভাব চরিত্র তাঁর মাঝে সর্বাধিক প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। নবুবী রংয়ে তিনি নিজেকে এতটুকু রঞ্জিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সমসাময়িক সাহাবায়ে কিরামদের তুলনায় তিনিই নবী চরিত্র ও কর্মধারার শ্রেষ্ঠতম বাহক বলে মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। আবদুর রহমান বলেন যে "আমি হযরত হুযায়ফা (রা)-এর কাছে আরয করলাম যে, এমন একজন লোকের পরিচয় দিন যার চাল চলন মহানবী (সা)-এর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আমি তাঁর সংসর্গে স্বীয় জীবন গড়ে তুলব"। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন যে, "আমানুসারে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর চেয়ে স্বভাব-চরিত্র চাল-চলনে আর কেউ রাসূল করীম (সা)-এর অতটা নিকটে পৌঁছতে পারেনি। এমন কি তিনি যখন আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গৃহাভ্যন্তরে চলে যান, তখনও তাঁর মাঝে নবুবী রং এর প্রস্ফুটন থাকে। সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের সাথে বুখারী শরীফেও এ রিওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে।

আমার জীবনকে আমি রাসূল পাক (সা)-এর জীবনের আঙ্গিকে গড়ে তুলব। আমি জিন্দেগীর সমূহ ক্ষেত্রকে তাঁর সাথে সুসঙ্গস করে চিত্রায়িত করব। এই এক প্রেরণা হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর অন্তর মননে সতত উদ্বেলিত হত। আর এতে সফলকাম হওয়ার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপের সাথে তিনি কায়মনে সাধনায় লিপ্ত থাকতেন। তিনি কতটুকু সফলতা লাভ করেছেন তা তাঁর সমসাময়িক সাহাবা ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ সকলেই বুলন্দ ভাবে স্বীকার করে গেছেন। হযরত হুযায়ফা (রা)-এর স্বীকারোক্তি একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইয়াযিদ বিন খামীর (রা) বলেন,

لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل يا ابا عبد الرحمن اوصنا قال اجلسوني ان العلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذالك ثلاث مرة التمس العلم عند اربعة رهط عند ابى الدرداء وعند سلمان الفارسى وعند عبد الله بن مسعود وعند عبدالله بن سلام ()

হযরত মুয়াষ বিন জাবাল (রা)-এর ইন্তিকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে, অনুরা আরয করলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, ইলম ও ঈমানের শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। সে কেন্দ্র থেকে যারা ইল্‌ম ও ঈমান অনুসন্ধান করে নেয় তারাই তা লাভ করে থাকে। (মনে রাখবে) বর্তমানে ইল্‌মের চারটি কেন্দ্র আছে সেখান থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করবে। তাহল আবু দারদা (রা), সালমান ফারেসী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা)।[১]

لما حضرت معاذ الوفاة بكيت فقال مايبكيك قلت والله ما ابكى على دنيا كنت اصيبها منك ولاكن ابكى على العلم والايمان الذين كنت اتعلمهما منك فقال ان العلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما اطلب العلم عند اربعة فذكر هؤلاء الاربعة

মালিক বিন ইয়াখামির বলেন, হযরত মুয়ায (রা)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় আমি কাঁদতে ছিলাম। তিনি শান্তনা দায়ক কণ্ঠে বললেন, কাঁদছ কেন? উত্তর দিলাম, আপনাকে হারালে আমাদের অনেক পার্থিব ক্ষতি সাধন হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহুর শপথ 'ও জন্য আমি মর্মাহত নই' আমি ত এই অন্তর্দহনে ক্রন্দন করছি যে, আপনার তিরোধানে আমাদের ইলম ও ঈমান আহরণের প্রস্রবণটিই হারিয়ে যাবে। তিনি বললেন, চিন্তা করো না, অবশ্যই ইলম ও ঈমান শিখবার কেন্দ্রস্থল রয়েছে। সেখানে যারা তালাশ করবে তারাই তা লাভ করবে। তুমি চার ব্যক্তির কাছে ইলম অনুসন্ধান কর। এই বলে তিনি উল্লিখিত চার ব্যক্তির নাম নিলেন।

---

১. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ৩১৫ পৃষ্ঠা।
মুসনাদে আহমদ ৫ম খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর প্রশংসার্থে মালিক বিন ইয়াখামির অন্যত্র বলেন,

ثم قال فان عجز عنه هؤلاء فسائر اهل الارض عنه اعجز فعليك بمعلم الارض ابراهيم قال فما نزلت لى مسألة عجزت عنها الا قلت يا معلم ابراهيم

অতঃপর হযরত মুয়ায (রা) বলেন, উপরোক্ত ব্যক্তি চতুষ্ঠয় যদি কোন মাসআলার সমাধানে অক্ষম সাব্যস্ত হন তবে মনে রাখবে পৃথিবীর কেউ তার সমাধান দিতে সক্ষম হবে না। তখন তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর শিক্ষদাতা আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণাপন্ন হও। মালিক বিন ইয়াখামির বলেন যে, এর পরে আমি কোন মাসআলার সঠিক উত্তর লাভে নিরুপায় হলে আল্লাহ তা'আলার কাছে বলতাম, ওগো ইব্রাহীম (আ)-এর শিক্ষাদাতা। তুমি আমাকেও ইলমের সন্ধান দাও।[১]

واوصاه معاذ عند موته ان يلحق بابن مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده ففعل ذالك

ই'লামুল মু'কিঈন এর অন্যত্র আছে, হযরত মুয়ায (রা) মালিক বিন ইয়াখামিরকে অন্তিম উপদেশ দেন যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি হযরত ইবনে মাসউদের খিদমতে চলে যেও এবং তাঁর সাহচর্যে থেকে ইল্ম হাসিলে মনোনিবেশ কর।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর একজন অন্যতম শিষ্য হযরত আলকামা বলেন,

كان عبد الله يشبه بالنبى صلى الله عليه وسلم فى هديه ودله وسمته

"স্বভাব-চরিত্রে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মহানবী (সা)-এর খুবই সুসমঞ্জস ছিলেন।

আবু ওয়ায়েল শাকীক বিন সালমা হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর একজন প্রবীণ শিষ্য। তিনি বলেন,

ما اعدل بابن مسعود احدا

"আমি কাউকে ইবনে মাসউদ (রা)-এর সমকক্ষ মনে করি না।"

১. ই'লামুল মুকিঈন।

ইমাম ওয়াহাবী ত্ববাকাতুল কুবরা ও তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাযে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর সমস্ত ছাত্রদের থেকে এই বিসংবাদহীন উক্তি বর্ণনা করেন যে,

كان تلامذته لا يفضلون عليه احدا من الصحابة فى العلم

"তাঁর ছাত্রবৃন্দ ইল্‌মের ক্ষেত্রে অন্য কোন সাহাবীকে তাঁর সমপর্যায়ের মনে করতেন না।"

হযরত মাসরূক ছিলেন ইবনে মাসউদ (রা)-এর প্রসিদ্ধ শিষ্যদিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন,

شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم ينتهى الى ستة الى على وعبد الله وعمر و زيد بن حارثة وابى الدرداء وابى بن كعب ثم شاممت الستة فوجدت علمهم ينتهى الى على و عبد الله

আমি হুযূরে আকরাম (সা)-এর সাহাবীগণকে নিরীক্ষণ করে দেখেছি যে, তাঁদের সমস্ত ইলম ছয় ব্যক্তির নিকট সঞ্চিত রয়েছে। তাঁরা হলেন (১) হযরত আলী (রা) (২) হযরত আবদুল্লাহ (রা) (৩) হযরত উমর (রা) (৪) হযরত যায়দ বিন হারিসা (রা) (৫) হযরত আবুদ্দারদা (রা) এবং (৬) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা)। আমি পুনর্বার উল্লিখিত ছয়জনের প্রতি লক্ষ্য করলাম। দেখলাম যে, তাঁদের সকলের ইলম দুই ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ দু'জন হলেন, হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)।

جالست اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فكانوا كالاخاذ الاخاذة تروى الراكب والاخاذة تروى الراكبين والاخاذة تروى العشرة والاخاذة لو نزل بها اهل الارض لاصدرتهم وان عبد الله من تلك الاخاذة

হযরত মাসরূক (রা) অন্যত্র বলেন, "আমি রাসূল পাক (সা)-এর অনেক সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাঁরা ছিলেন সরোবরের মত। যে কোন সরোবর থেকে একজন পথগামী তৃষ্ণা নিবারিতে পারে। কোনটি থেকে দু'জন আর কোনটি থেকে দশজন। দু' একটি সরোবর এত বৃহদাকারের হয়ে থাকে যেখান থেকে বিশ্বের সমূহ সৃষ্টিও যদি পানি পান করে তবে সকলেই পরিতৃপ্ত হবে, তবু তার পানি নিঃশেষ হবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ঐরূপ একটি সরোবর সাদৃশ্য সন্দেহ নেই।

ইমাম শা'বী বলেন,

ما دخل الكوفة احد من الصحابة انفع علما ولا افقه صاحبا من عبد الله

"ইলম ও ফিকাহ'র ক্ষেত্রে ইবনে মাসউদ (রা)-এর চেয়ে বড় কোন সাহাবী কূফায় পদার্পণ করেন নি"

কেবল সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেইনগণই নন পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরাম ও তাঁর ইলমী যোগ্যতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর জীবন চরিত ও ইলমী মর্যাদা সম্পর্কীয় বিভিন্ন রচনা এর উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লামা জাহ্বী সিয়ারে আলা'মুন্নুবালা গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর আলোচনার প্রথমে যে শিরোনাম এঁকেছেন তা এখানে প্রনিধান যোগ্য। শিরোনামটি এরূপ :

الامام الحبر فقيه الامة ابو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة كان من السابقين الاولين من النجباء العاملين شهد بدرا وهاجر الهجرتين وكان يوم اليرموك على النفل ومناقبه غزيرة روى علما كثيرا

"মহামহিম ইমাম, উম্মতের আইন বিশারদ, হাবশা ও মদীনার মুহাজির, বদর যুদ্ধের আত্মোৎসর্গকারী সৈনিক, বনু জুহরার বিশ্বস্ত চুক্তি বদ্ধ ইসলামের উদয় লগ্নে স্বতস্ফূর্ত সাড়া প্রদানকারীদের অন্যতম প্রধান সাহাবী। ইসলামের একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী। ইয়ারমুকের সমর ক্ষেত্রে ব্যাপকতর গুণাগুণ ও মহিমার অধিকারী এবং ইল্মের প্রসার কার্যে আত্ম নিমগ্ন দিগ্গজ সাধক আবু আবদুর রহমান আলহুজালী আল মক্কী।

উল্লিখিত বাক্যটি যদিও একটা শিরোনাম মাত্র কিন্তু এতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বিভিন্ন গুণাবলীর প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা)-এর বংশ পরম্পরার সাথে তাঁর বংশের প্রাচীন যে যোগসূত্র আছে আল হুজালী বলে সে দিকে সাথে সাথে ইশারা করা হয়েছে। তাঁর ইলমী মর্যাদা ও অবস্থান এবং ইলমের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদানের প্রতিও এতে আলোকপাত করা হয়েছে। ত্বাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে আল্লামা জাহবী বলেন, وتفقه به خلق كثير তাঁর মাধ্যমে অনেকেই ইলমী ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। তাযকিরাতুল হুফ্ফাব গ্রন্থেও সামান্য ব্যবধানে উল্লিখিত শিরোনাম দেয়া হয়েছে। বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর ইলমী দিকগুলো অস্পষ্ট রাখা

হয়নি। আল্লামা আবু নঈম ইস্পাহানী বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর ত্যাগ তিতিক্ষা, ইবাদত-আখলাক ও সৎকর্মের অনুরাগের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করলে ও কুরআনের প্রতি তাঁর আসক্তি, কুরআনের গভীর উপলব্ধি; কুরআনী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার মাসআলা মাসায়েলে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর ফিকাহ ও আইন বিষয়ক মতামতের প্রতি আলোকপাত করতে বিস্মৃত হননি। সুতরাং হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে তিনি বলেন,

من طبقة السابقين المهاجرين المعروفين بالنسك من المعمرين القارى الملقن الفقيه المفهم السواق والبدار اقربهم وسيلة و اجمعهم فضيلة كان من الرفقاء والنجباء والوزراء والرقباء عبد الله بن مسعود الكلف بالمعبود والشاهد بالمشهود والحافظ المعهود والسائل الذى ليس بمردود

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) প্রথম স্তরের সাহাবী ও মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হজ্জের আহকাম সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার খুবই যশ খ্যাতি ছিল। বয়ঃপ্রবীণ সাহাবীদের মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষাদাতা দিগ্‌গজ ফকীহ এবং সৎকর্মে অগ্রগামী ও ব্যতিব্যস্ত হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বজনবিদিত। তিনি সাহাবাদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল করীম (সা)-এর নিরন্তর সহচর, পরামর্শদাতা, মনোনীত দায়িত্বশীল ও প্রিয়জনদের মধ্যে অন্যতম। ত্যাগী তাপস প্রবর এই সাহাবী ছিলেন এক সত্যের সাক্ষ্যদাতা প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণকারী ও আল্লাহ্'র দরবারের এমন এক যাচনাকারী যাকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইলমী যোগ্যতা ও মর্যাদা বর্ণনায় অধিক সতর্কবান। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় গ্রন্থ ফতহুল বারীতে তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে,

و كان من علماء الصحابة و ممن اشتهر علمه بكثرة اصحابه والاخذين عنه

"হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সাহাবী উলামাদেরই একজন। তাঁর অসংখ্য

শিষ্য ও শ্রোতাদের মাধ্যমে তদীয় ইমল ও জ্ঞান যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।[১]

এত তদ্‌গত ও অনুরাগের সাথে তিনি কুরআন শিক্ষার সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন যে, পরবর্তী কালে তিনি সমকালের শ্রেষ্ঠতম কুরআনের 'আলিম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রখ্যাত বদরী[২] সাহাবী আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল করীম (সা)-এর উপর যা নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে ইবনে মাসউদ (রা)-এর চেয়ে অভিজ্ঞ কাউকে পাইনি।

উকবাহ বিন আমর বলেন,

وما ارى احدا اعلم بما انزل على محمد صلى الله عليه و سلم من عبد الله

রাসূলে পাক (সা)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ বলে মনে করি।[৩]

রাসূল করীম (সা)-এর সাহচর্যে বসে তাঁর থেকে সরাসরি কুরআন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

والله لقد اخذت من فى رسول الله صلى الله عليه و سلم بضعا و سبعين سورة

"আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল পাক (সা)-এর মুখ থেকে ৭০টির অধিক সূরা মুখস্ত করেছি।[৪]

ইমাম জাহবী রচিত ত্ববাকাতুল কুবরা গ্রন্থে আছে,

اما من حفظه كله منهم وعرض على النبى صلى الله عليه و سلم فجماعة من نجباء واصحاب محمد النقديبوا لاقراءه انتصبوا لاداءه فكان من جملتهم سبعة ائمة اعلام دارت عليهم أسانيد القرآن و ذكرو فى صدور الكتب والاجازات عثمان، على، ابى، ابن مسعود، زيد، ابو موسى، ابو الدرداء

১. ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা।

২. যে সব সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে বদরী বলা হয়। সাহাবীদের মধ্যে তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী—অনুবাদক।

৩. ই'লামুল মুকিঈন ১ম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

৪. আত্তবাকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড ১০১, পৃষ্ঠা।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করেন এবং নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে তা পাঠ করে শুনান তাঁরা হলেন রাসূলে করীম (সা)-এর শ্রেষ্ঠতম সাহাবীদের একটি মুষ্টিমেয় দল। তিনি তাঁদেরকে কুরআনের প্রশিক্ষণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যোগ্যতর সেবক হিসাবে গড়ে তোলেন। তাঁদের মধ্যে সাত ব্যক্তি কুরআনের দিকপাল ইমাম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। কুরআন করীমের সকল সনদ তাঁদের সূত্রেই লব্ধ হয়েছে। কিতাবের প্রারম্ভে এবং সনদ প্রদানের সময় তাঁদেরই নাম ভক্তি ভরে উল্লেখ করা হয়। তাঁরা হলেন, হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত উবাই (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), হযরত যায়দ (রা), হযরত আবূ মূসা (রা) ও হযরত আবূদ্দারদা (রা)।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) গৌরব উদ্ভাসিত আননে বলতেন যে, কুরআন মাজীদে এমন কোন আয়াত অবশিষ্ট নেই যা কোথায় কখন এবং কি ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তা আমি অবহিত নই।[১]

কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে তিনি রাসূল করীম (সা)-এর পর্যবেক্ষণে আমল ও কর্মধারাকেও বিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এসম্পর্কে তাঁর উক্তিই তুলে ধরছি,

عن ابن مسعود كنا اذا تعلمنا من النبى صلى الله عليه وسلم
عشر ايات من القرآن لم نتعلم العشر التى بعدها حتى نعمل فيه

আমরা রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট কুরআন করীমের দশটি আয়াত শিখবার পর তা আমলে রূপায়িত না করা পর্যন্ত পরবর্তী দশ আয়াতের সবক নিতাম না।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব অনুসরণ ও আমলের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি তাঁকে নবী মুস্তফা (সা)-এর আদর্শ ও আখলাকে মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিল।

অধ্যাপনার নবুবী সনদ

যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্বভাব চরিত্র ও ইলমের শিক্ষা সমাপ্তি ঘটে তখন রাসূল করীম (সা) মজলিসেই কুরআন ও হাদীসের প্রশিক্ষণ দানের জন্য তাঁকে বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন। সাহাবায়ে কিরামকে

১. ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ১ম খণ্ড ১৭ পৃষ্ঠা।

নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা ইবনে মাসউদ (রা)-এর দ্বারা উপকৃত হও। মুফতী আবদুল লতিফ সাহেব 'তাযকিরায়ে আ'যম' নামক কিতাবে বলেন যে, উস্তাদ স্বীয় শিষ্যকে দের সনদ ও সত্যায়ন পত্রে দু' ধরনের কথা উল্লেখ করে। প্রথমতঃ যারা সাধারণ ছাত্র তাদের সম্পর্কে বলে যে, আমি তোমাকে অমুক বিষয়ের প্রশিক্ষণ দেয়ার অনুমতি দিচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ যে সব ছাত্র অসাধারণ যোগ্যতা ও পারদর্শীতার অধিকারী হয় তাদের সনদে লিখে দেয় যে, আমি এর থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য সকলকে উৎসাহ দিচ্ছি। আমি এর যোগ্যতা ও পান্ডিত্যের উপর খুবই আস্থা রাখি। রাসুল পাক (সা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বেলায় এ দ্বিতীয় প্রকার কথাই ইরশাদ করেছিলেন। তাঁকে কুরআন করীম ও হাদীস শরীফের অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র অনুমোদন দিয়েছিলেন। বুখারী ও তিরমিযী থেকে আমরা তাঁর কুরআন সম্পর্কীয় সনদ উল্লেখ করছি—

قال النبى صلى الله عليه و سلم استقرؤ القران من اربعة من عبد الله
ابن مسعود و سالم مولى ابى حذيفة وابى ابن كعب و معاذ بن جبل

রাসুল পাক (সা) বলেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআনের প্রশিক্ষণ নাও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), সালিম মাওলা আবি হুযায়ফা (রা), উবাই বিন কা'ব (রা) ও মুয়ায বিন জাবাল (রা)।

হাফিয ইবনে হাজার আস্কালানী এর ব্যাখ্যায় বলেন,

وان البداءة بالرجل فى الذكر على غيره فى امر يشترك فيه مع
غيره يدل على تقدمه فيه

"একই গুণে গুণান্বিত কয়েক ব্যক্তির নাম যখন উল্লেখ করা হয় তখন যার নাম প্রথমে উল্লিখিত হয় সেই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে প্রমাণ হয়।

উল্লিখিত হাদীসের রাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমরি বনুল আস (রা) বলেন যে, এই মহান ব্যক্তি চতুষ্ঠয়ের মধ্যে রাসুল করীম (সা) যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নাম প্রথমে উল্লেখ করেছেন তাই আমি তাঁকে ভালবাসা শুরু করলাম এবং তিনিই আমার সর্বাধিক প্রিয়তম।

তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত সনদটি এরূপ ঃ

عن حذيفة قال النبى صلى الله عليه و سلم ما اقرأ كم عبد
الله فاقرؤا

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তোমাদেরকে যা শিক্ষা দান করে তোমরা তাই পড়।

এক ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-এর সমীপে আরজ করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কুফা থেকে আপনার কাছে এসেছি। সেখানে এক মান্যবর তাঁর শিষ্যদেরকে কুরআন করীম লিখিয়ে দেয়। একথা শুনে হযরত উমর (রা) সরোষে জিজ্ঞেস করলেন, কে সে ব্যক্তি? আগন্তুক বলল, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তাঁর উত্তরে খলীফার রাগ পড়ে গেল। অতঃপর শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ এ কাজের জন্য তিনি-ই সর্বাধিক যোগ্যতর। এরপর তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন যাতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবীয়ে আরাবী (সা)-এর সাথে জান্নাতুল খুলদ লাভের দু'আ করেছিলেন। ঘটনাটি কুরআন তিলাওয়াত শিরোনামে সম্মুখে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম শা'বী একটি চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

একবার হযরত উমর (রা) কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথে একটি কাফেলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সঙ্গীদেরকে তিনি কাফেলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললেন। একজন কাফেলার দিকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে বললেন যে, তোমরা কারা? পরিচয় দাও। ঐ কাফেলায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হেজায অভিমুখে সফর করে আসছিলেন। তিনি এক সঙ্গীকে বললেন যে, জবাব দাও اقبلنا من الفج العميق "আমরা সুদূর দূরান্তের মুসাফির"। হযরত উমর (রা) বললেন, জিজ্ঞেস কর তারা কোথায় চলছে? হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জবাব দিতে বললেন, الى البيت العتيق "আমাদের গতি প্রাচীন গৃহের পথে"। হযরত উমর পুনরায় জিজ্ঞেস করতে বললেন, কুরআনের সব চেয়ে মহিমাপূর্ণ আয়াতটি কি? হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, উচ্চস্বরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে শুনিয়ে দাও।

হযরত উমর (রা) পুনর্বার বললেন, জিজ্ঞেস কর যে, কুরআনের সে আয়াতটি কি যার প্রতিটি অংশের অনুসরণ অপরিহার্য? হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, জবাব দাও,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আদল ইহসান ও স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসৎ কর্ম ও সীমালংঘন করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দেন। হয়ত তোমরা তাতে কর্ণপাত করবে।"

হযরত উমর (রা) বললেন, এবারে জিজ্ঞেস কর যে, কুরআনের সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবহ আয়াত কোনটি? হযরত ইবনে মাসউদ (রা) জবাব দিতে বললেন,

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره

"যে ব্যক্তি বিন্দু মাত্র সৎকর্ম করবে সে তার প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণ অসৎ কাজ করবে সে ও তার প্রতিফল ভোগ করবে।

হযরত উমর (রা) বললেন, জিজ্ঞাসা কর যে, কুরআন পাকের লোমহর্ষক আয়াত কোনটি? তদুত্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন শুনিয়ে দাও,

ليس بامانيكم ولااماني اهل الكتاب من يعمل سوء ا يجز به

"তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না; কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সেই পাবে।"

হযরত উমর (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে বললেন যে, কুরআন করীমের সব চেয়ে আশাপ্রদ আয়াত কোনটি? হযরত আবদুল্লাহ (রা) জবাব দিতে বললেন বল যে,

يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

"হে আমার ঐ সকল বান্দা যারা নিজের উপর সীমালংঘনের বোঝা চাপিয়েছ, তোমরা আল্লাহর করুনা থেকে হতাশ হয়ে যেওনা।"

(এসব উত্তর শুনে হযরত উমর (রা) বুঝে ফেললেন যে, ঐ কাফেলায় অবশ্যই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কারুরই আল কুরআনের এত গভীর উপলব্ধি নেই। তাই—) অবশেষে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললেন, জিজ্ঞেস করে দেখ ঐ কাফেলায় অবশ্যই ইবনে মাসউদ রয়েছে। নির্দেশ অনুসারে একজন

চিৎকার করে বলল, তোমাদের কাফেলায় কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আছেন ? উত্তর এলো হাঁ, তিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন।

এবারে অনুমান করুন যে, আল কুরআনের উপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কতটুকু বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। আর তাঁর ইলমের উপর স্বয়ং খলীফা উমর ফারূক (রা) পর্যন্ত কতটুকু আস্থাশীল ছিলেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কুরআনে করীমের অধ্যাপনা সম্পর্কীয় সনদের কথা আলোচিত হল। রাসূল পাক (সা) তাঁকে হাদীসের মসনদে বসবার ও অনুমতি দিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে—

ماحد ثكم ابن مسعود فصدقوا

রাসূল পাক (সা) বলেন, ইবনে মাসউদ কোন হাদীস বর্ণনা করলে তোমরা তা গ্রহণ কর। (তিরমিযী।)

কুরআন ও হাদীস ছাড়া রাসূল পাক (সা) তাঁকে ইজতিহাদ বা কুরআন ও হাদীসের মৌল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে মাসআলা উদ্ভাবন করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিরমিযী শরীফে আছে,

قال النبي صلى الله عليه و سلم فتمسكو بعهد ابن ام عبد

নবী পাক (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা ইবনে উম্মি আবদ-এর নির্দেশনা অবলম্বন কর।

রাসূল করীম (সা) তাঁর বাণী ও অভিমতকে দলীল হিসাবে যথেষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। খতীবে বাগদাদী ইকমাল ও কানযুল উম্মাল নামক হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেন,

قال النبي صلى الله عليه و سلم رضيت لامتى مارضى لها ابن ام عبد و سخطت لها ما سخط لها ابن ام عبد

ইবনে মাসউদ (রা) যে সব বিষয় পসন্দ করে আমি তা স্বীয় উম্মতের জন্য পসন্দ করি। আর যে সব বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি নেই সে গুলোয়কে আমি উম্মতের জন্য পসন্দ করি না।

হযরত উবাদা বিন সামিত (রা) রাসূল পাক (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর ! কোন্ কোন্ সাহাবীকে আপনি অধিক ভাল বাসেন ?[১] আমি ও তাঁদেরকে ভালবাসব। তিনি বললেন, দেখ আমার জীবিত অবস্থায়

১. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ২য় খন্ড ২৫২ পৃষ্ঠা

কারুর কাছে এ কথা প্রকাশ করোনা। আমি আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-কে ভালবাসি। একথা বলে তিনি ক্ষান্ত হলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর কাকে ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল পাক (সা) তখন সতর জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন। তার ভিতর হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর নামও ছিল। বলা বাহুল্য রাসূল পাক (সা) তাদেরকে স্বতন্ত্র দ্বীনী বৈশিষ্ট্যের জন্যেই অধিক ভাল বাসতেন।

বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার নবুবী সত্যায়ন

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইলম ও চরিত্রের এই উন্নত সনদের সাথে সাথে রাসূল পাক (সা) তাঁর বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির ও ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত,

عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا احدا دون شورى المسلمين لامرت ابن ام عبد

রাসূল করীম (সা) বলেন যে, মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যদি কাউকে আমি আমীরের পদে নিয়োগ করতাম তবে ইবনে উম্মি আব্দকেই তা করতাম।

কর্ম ও দায়িত্ব বন্টনের প্রেক্ষিতে অন্যান্যদের মত ইবনে মাসউদকে তাঁর ইলমী চর্চা বন্ধ করে অন্যত্র নিয়োগ করা হয়নি বলে ধারণা হতে পারে যে, ইলম-আমলের বাইরে তাঁর কোন পারদর্শীতা ও যোগ্যতা ছিল না; তাই উল্লিখিত হাদীস দ্বারা মহানবী (সা) এ সন্দেহের অপনোদন করেন। কিন্তু ইলমের ক্ষেত্রে তিনি যেহেতু অনন্য সাধারণ ছিলেন তাই ইলমী খিদমতে যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তাই সর্বদা তাঁকে ঝঞ্ঝাট ও ব্যস্ততা বিমুক্ত রাখা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা তাঁর এ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে দূরে না পাঠিয়ে কিভাবে নিকটে রাখবার চেষ্টা করতেন তা "প্রথম খলীফার যুগে" শিরোনামে আলোচিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) তাঁকে কুফার বিচারপতি করে পাঠালেও কুরআন ও হাদীসের প্রশিক্ষণ দানের প্রতিই অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

সমসাময়িকদের চোখে

আবুল আহওয়াস (র) বলেন যে, একদিন আমি ও ইবনে মাসউদ (রা) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম।

মজলিস সমাপ্ত হলে হযরত উকবা বিন আমর (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে, আমি জানি না যে তাঁর চেয়ে অধিক কুরআনী ইলম সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন সাহাবী আজ বেঁচে আছেন কিনা। একথা শুনে হযরত আবু মুসা (রা) তার কথায় স্বীকৃতি জানিয়ে বললেন যে, হবেই না বা কেন ? আমরা তো এখানে যেখানে চলে যেতাম, কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) এক মুহূর্তের জন্য ও নবী করীম (সা)-এর সান্নিধ্য ছেড়ে কোথাও যেতেন না। নবী করীম (সা)-এর একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায়ও ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর সাথে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। হযরত শাকীক (রা) বলেন, একবার আমি এক জলসার উপস্থিত ছিলাম। সে জলসায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) গৌরোবজ্জ্বল মুখে দাবী করলেন যে, সকল সাহাবী এ কথা ভাল ভাবেই জানে যে, কুরআন সম্পর্কে আমি সবচেয়ে অভিজ্ঞ। যদিও মানুষ হিসেবে আমি তাদের তুলনায় অধম। হযরত আবদুল্লাহ্‌র এ দাবী শ্রবণান্তে আমি মাথা তুলে চারি দিক লক্ষ্য করলাম। কিন্তু উপস্থিত কেউ তার দাবী প্রত্যাখ্যান করেনি। তাঁর যোগ্যতার এই উদার স্বীকৃতি তদীয় উপস্থিতি বা জীবন কালেই সীমিত ছিলনা। শ্রেষ্ঠ জনের মৃত্যুত্তর সনাতনধর্মী নিয়মানুযায়ী তাঁর ইন্তিকালের পরেও উক্ত স্বীকৃতি ও প্রশংসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু মুসা আশ'আরীর কাছে জিজ্ঞসা করা হল যে, তিনি কি তাঁর সমকক্ষ কাউকে রেখে গেছেন ? উত্তরে তিনি বললেন যে, না ! কি করেই বা সম্ভব ? আমরা তো নানাহ কাজে বেড়িয়ে যেতাম কিন্তু তিনি মহানবী (সা)-এর নিভৃত ও জনলোকে সর্বদা তাঁর সাহচর্য আকড়ে থাকতেন।"[১] দামেশকে বসে কেউ তাঁর ইন্তিকালের কথা উল্লেখ করলে হযরত আবু মুসা (রা) বললেন যে, ও হে ! তিনি চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর সমকক্ষ কাউকে রেখে যাননি।

কূফাবাসীরা একবার হযরত উমর (রা)-এর খিদমতে অভিযোগ করল যে, হে আমীরুল মু'মিনীন ! শামের অধিবাসীদের সরকারী ভাতা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু আমাদেরটা ত অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। হযরত উমর (রা) জবাবে বললেন যে, শামের অধিবাসীদের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা তো নিঃসন্দেহ কিন্তু ইবনে মাসউদকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করে তোমাদের ইলমী উৎকর্ষের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, শামবাসীরা তা থেকে বঞ্চিতই

১. মুসলিম—ফাযায়েলে সাহাবা।

রয়ে গেল। ইলমী উৎকর্ষণের সামনে আর্থিক উন্নতির কি মূল্য আছে? ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইলম ও আখলাকের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধির জন্য তোমাদের এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা বিভিন্ন ব্যস্ততায় যখন দরবারে নববী ত্যাগ করতাম ইবনে মাসউদ (রা) তখন ও তদ্‌গত ভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতেন। মহানবী (সা)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় ও তাঁর কাছে থাকবার অনুমতি একমাত্র ইবনে মাসউদের ছিল। আমরা তো তা থেকে মাহরূম ছিলাম।[১] এছাড়াও বিভিন্ন সময় হযরত উমর (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর ইলমী গভীরতা ও অন্যান্য গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করতেন। হযরত যায়দ বিন ওহাব (রা) বলেন:

كنت جالسا فى القوم عند عمر اذ جاء رجل نحيف قليل اللحم
فجعل عمر ينظر اليه و يتهلل وجهه ثم قال كنيف ملئ علما
كنيف ملئ علما فاذا هو ابن مسعود

আমি অন্যান্যদের সাথে হযরত উমর (রাঃ)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন ক্ষীণকায় হালকা পাতলা লোক সেখানে প্রবেশ করে। হযরত উমর (রা) অপলক নেত্রে তাঁকে অবলোকন করতে লাগলেন। ফলে তাঁর অবয়ব ক্রমেই আনন্দোজ্জ্বল হচ্ছিল। অনন্তর তিনি আনন্দ সিক্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন, ক্ষুদ্র একটা থলি অথচ ইলমে পরিপূর্ণ। ছোট্ট একটা মশ্‌ক্ অথচ ইলমে পরিব্যপ্ত। আগ্রহের সাথে জানতে চাইলাম যে, আগন্তুক কে? লোকেরা বলল, ইনি ইবনে মাসউদ (রা)।

আবু ওয়ায়েল বলেন যে, এক ব্যক্তির পরিধেয় লুঙ্গী পায়ের গোড়ালীর নীচে নেমে এলে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁকে তা সংবরণ করার নির্দেশ দেন। লোকটি পাল্টা জবাব দিয়ে বলল, আপনার নিজের লুঙ্গীই গোড়ালী সংবৃত করে রেখেছে, কাজেই নিজেরটাই প্রথম সামলিয়ে নিন। হযরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি অপারগ বলেই এমন হচ্ছে কিন্তু তোমার কি কোন ওজর আছে? হযরত আবদুল্লাহ্‌র অপারগতার কারণ হল যে, তিনি অত্যন্ত কৃশকায় ছিলেন যার ফলে পরিধেয় বস্ত্র সামলায়ে নিলেও আস্তে আস্তে তা নীচে নেমে আসত। ফলে গোড়ালী আচ্ছাদিত হয়ে যেত। কিন্তু উল্লিখিত লোকটির এমন কোন আপত্তি ছিল না। বিনা ওজরে গোড়ালীর নীচে বস্ত্র পরিধান করা ইসলামী শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাদীসে এ সম্পর্কে

---

১. তাযকিরায়ে আযম ৭২ পৃষ্ঠা।

কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাই হৃদ্যতার সাথে তাঁকে এভাবে বস্ত্র পরিধান করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু লোকটা তাঁর নসীহতের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করলনা উপরন্ত খোদ ইবনে মাসউদ (রা)-এর উপরই অভিযোগ উত্থাপন করল। কে যেন এ সংবাদ হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কানে পেঁছিয়ে দেয়। ইবনে মাসউদ (রা)-এর মত মহামতি সাহাবীয়ে রাসূল (সা)-এর উপর এরূপ কটাক্ষপাত হযরত উমর (রা)-এর অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অনতিবিলম্বে তিনি লোকটাকে ডেকে চাবুক মেরে শিক্ষা দিলেন, বললেন এতদূর আস্পর্ধা, তুই ইবনে মাসউদ (রা)-এর মত ব্যক্তিত্বের উপর কটূক্তি করেছিস।[১]

কুরআন তিলাওয়াত

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) যে ভাবে কুরআন করীমের বড় আলিম ছিলেন তাঁর সাথে সাথে কুরআনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও ভালবাসা ছিল অনুপম। তাঁর তিলাওয়াত ছিল চমকপ্রদ। দৈনিক তিনি এক মনযিল কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এভাবে প্রতি সপ্তাহে জুমু'আর দিন তিনি কুরআন খতম করতেন। রমযানে প্রতি দিন তাঁর কুরআন সমাপ্তির অভ্যাস ছিল।[২]

একবার তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি গভীর অভিনিবেশের সাথে সূরা নিসা তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় হযরত রাসূল আকরাম (সা) আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর ফারুক (রা)-কে নিয়ে সেথায় উপস্থিত হন। রাসূল করীম (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনে খুবই মুগ্ধ হন। নামায সমাপ্ত হলে তিনি ইরশাদ করলেন, ইবনে মাসউদ! এক্ষণই আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার চেয়ে নাও। তোমার দু'আ কবুল হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) দু'আ করলেন:

اللّهم اني اسئلك ايمانا لا يرتد و نعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد فى اعلى درجة الخلد

"ওগো আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন ঈমান প্রার্থনা করি যা কখনো পরিত্যক্ত হবে না। আর আমাকে এমন নি'আমত দাও যা কখনো নিঃশেষ

১. ইসাবা ৩য় খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা। সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ৩৫১।
২. মবসূত-ই-সারাখছী

হবে না। জান্নাতের অনন্ত জীবনের সর্বোচ্চ স্থানে প্রিয় নবী (সা)-এর সাহচর্য থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

এরপর হুযুর আকরাম (সা) ইরশাদ করলেন যে,

من اراد ان يقرأ القرآن غضا فليقرأ على قراءة ابن ام عبد

যে ব্যক্তি আল-কুরআনকে তারতীলের সাথে পড়তে চায় সে যেন ইবনে উম্মি আবদ এর কুরআন তিলায়াতকে অনুসরণ করে।[১]

এতদ্ভিন্ন তিনি নামাযের বাইরে একাকী নিভৃতে কুরআন করীম তিলাওয়াত করতেন। এটা তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায়শই রাসূলে পাক (সা) তাঁর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করিয়ে শ্রবণ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ নিজেই বলেন যে, একদিন রাসূল আকরাম (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন সূরা নিসা তিলাওয়াত করে শুনাও। আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনার উপর আল কুরআন নাযিল হয় আর আমি আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাব? ইরশাদ করলেন, হাঁ, আমি অন্যের কণ্ঠে কুরআন শুনতে চাই। আমি অধঃবদনে প্রিয় নবী (সা)-এর নির্দেশ পালন করলাম। যখন আমি এই আয়াত পাঠ করলাম

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا

সুতরাং যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক একজন সাক্ষী উপস্থিত করব আর আপনাকে উপস্থিত করব তাদের উপর সাক্ষীরূপে তখন তাদের কি অবস্থা হবে?

তখন তাঁর গণ্ডদ্বয় বেয়ে অশ্রুর অঝর ধারা নেমে এলো।

উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন ভাবে তাঁর পরিশুদ্ধ কুরআন তিলায়াতের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা জাহবী স্বীয় প্রণীত ত্বাকাতুল কুররা গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

وكان عبد الله رأسا فى تجويد القرآن مع حسن الصوت

"হযরত আবদুল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কারী ও সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন"।

আবু উসমান নাহ্দী বলেন যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ্ আমাদের

---

১. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ৩৪১ পৃষ্ঠা।
মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল।

মাগরিবের নামাযে ইমামতি করেছিলেন। তিনি এত সুমধুর কণ্ঠে সূরা ইখলাস পাঠ করেছিলেন যে আমরা আশা করেছিলাম যে, তিনি যদি এভাবে সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করতেন।

কুরআনের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান

কুরআন করীমের সমস্ত বিষয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর খুবই গভীর উপলব্ধি ছিল। তাঁর সম্মুখে কেউ কোন হাদীস পাঠ করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি উক্ত বিষয়ভুক্ত কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করতেন। একবার তাঁর সম্মুখে কেউ এ হাদীসটি পেশ করল যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে অন্য মুসলিমের সম্পদ ভক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেনা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর সমর্থন স্বরূপ সাথে সাথে কুরআন করীমের এ আয়াত পাঠ করলেন :

ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا او لائك لاخلاق لهم فى الأخرة

"যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও শপথের পরিবর্তে সামান্য মূল্যের সম্পদ হস্তগত করে তারা তো ঐ সব লোক পরকালে যাদের কোন হিস্সা নেই।"

এমনি ভাবে একদিন শিষ্যদেরকে তিনি রাসূল (সা)-এর এই হাদীস শুনাচ্ছিলেন। একদা প্রিয় নবী (সা)-এর কাছে প্রশ্ন করা হল যে, সব চেয়ে বড় গুনাহ কি ? মহানবী (সা) বললেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হল শিরক। তারপরে সন্তান হত্যা করা এবং তারপর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর আনুকূল্যে একটি আয়াত পেশ করেন। আয়াতটি হল :

والذين لايدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالك يلق اثاما

আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ্-তা'আলার অননুমোদিত কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। যারা এসব কাজে ব্যাপৃত হয় তারা ভীষণ শক্ত গুনাহে সংবৃত হয়।

আরবী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য

আরবী সাহিত্যে পারদর্শীতা অর্জনের উপর কুরআন করীমের ব্যাখ্যা ও তাফসীর নির্ভর করে। আরবীর পরিভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া একজন মুফাস্সিরের জন্য অপরিহার্য। আলোচনা কালে যে শব্দ উহ্য রাখা হয় তা বুঝবার মত বিচক্ষণতা এবং সর্বনাম ব্যবহারের সঠিক ধারণা যদি না থাকে তবে কুরআন পাকের নির্ভুল তাফসীর করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলে আকরাম (সা)-এর সংশ্রবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এসব ব্যাপারে পূর্ণ পারদর্শীতা লাভ করেন। নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে তাঁর এ অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها

আমরা যখন কোন বস্তিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার মোড়লদেরকে (বশ্যতা ও আনুগত্যের) নির্দেশ দেই। অনন্তর তারা সে নির্দেশ লংঘন করে অপক্রিয়ায় লিপ্ত হয়।

এখানে সাধারণ মুফাসসিরগণ امرنا مترفيها ففسقوا فيها এর অর্থ করেছেন যে "আমরা মোড়লদেরকে অসৎ কর্মের নির্দেশ দিলাম" অথচ এঅর্থ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মহামহিম সত্তার নির্দোষ ও পবিত্রতায় অভিযোগের গ্লানি সংযুক্ত হয়। (নাউজুবিল্লাহ) কেননা এতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনি স্বয়ং অপকৃষ্টের নির্দেশ দেন। অথচ তাতে লিপ্ত হলে কঠিন শাস্তি দ্বারা তাদেরকে নির্মূল করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে অভিযোগ মুক্ত রাখার জন্য এসব মুফাসসিরগণ বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা-উপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টাকে জটিল করে তুলেন। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এ আয়াত নিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না। এখানে امرنا (আমরা নির্দেশ দিলাম) এরপর بالانقياد والاطاعة (বশ্যতা ও আনুগত্যের) শব্দটি উহ্য রয়েছে। امرنا এর সাথে এশব্দ সংযুক্ত করলে অর্থ হয়, আমরা বশ্যতা ও অনুগত্যের নির্দেশ দিলাম। আর আল্লাহ তা'আলার এ আনুগত্য ও বশ্যতা অস্বীকার করে তারা যখন অসৎ কর্মে নিবিষ্ট হল তখন তিনি কঠিন শাস্তি দ্বারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। কাজেই উহ্য শব্দটি সংযুক্ত করে অর্থ করা হলে এখানে কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

আল্লামা ইবনে জিন্নী "খাসায়েস" নামক কিতাবে লিখেছেন যে امر অর্থ

আধিক্য। বিভিন্ন উপমা দ্বারা তিনি এ অর্থকে প্রমাণ করেছেন। সে হিসাবে আয়াতটির অর্থ হবে যে "যখন আমরা কোন বস্তিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের ধনিক শ্রেণীকে অর্থের প্রাচুর্য দেই। অনন্তর তারা সে অর্থ সঠিক জায়গায় ব্যয় না করে নিজেরা অহংকারের বশীভূত হয়। তখন আল্লাহর শাস্তি থেকে বেপরোয়া হয়ে তারা নানাহ অপরাধ ও সীমালংঘনের জীবন যাপনে আত্মহারা হয়ে পড়ে, আর এই-ত তাদের ধ্বংসের পটভূমিকা। এভাবে অর্থ করা হলে ও এ আয়াতে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। মহানবী (সা)-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুফাসসির হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এভাবেই আয়তটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে

كنا نقول للحى اذا كثروا الجاهلية امر بنوفلان

অন্ধযুগে যখন কোন বস্তির লোক সংখ্যা বেড়ে যেত তখন আমরা বলতাম, অমুক গোত্রের উত্তরসূরীরা "আমরা" অর্থাৎ বেড়ে গিয়েছে। হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আমরা উপরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর যে কথাগুলো উল্লেখ করেছি তা দ্বারা তাঁর আরবী ভাষার অভিজ্ঞতা ও সাহিত্য সুলভ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষাবিদগণ তাঁর কথাকে সাহিত্যের সনদ হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে "মুখতারুছিহাহ গ্রন্থে خلل মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত اختلال শব্দের অর্থ করা হয়েছে احتاج অর্থাৎ মুখাপেক্ষী হওয়া। প্রমাণ স্বরূপ সেখানে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট বাণী তুলে ধরা হয়েছে, তিনি বলেন,

عليكم بالعلم فان احدكم لايدرى متى يختل اليه اى متى يحتاج الناس الى ماعنده

তোমরা ইলম অর্জনে প্রবৃত্ত হও। কেননা তোমরা জাননা যে, এই ইলমের জন্য মানুষ কিভাবে তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

ভুল তাফসীর থেকে সতর্কীকরণ

অনেক লোক শুধু মাত্র অনুমান ও ধারণার আঙ্গিকে কুরআন করীমের তাফসীর করে থাকে। উস্তাদও শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকেই নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণে কুরআনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)

যদি এমন কারুর সম্পর্কে অভিযোগ পেতেন তবে অতিশয় ক্ষীপ্ত হয়ে যেতেন এবং অনতিবিলম্বে তার ভুল শুধরে দিয়ে ভবিষ্যতে এরূপ করতে বারণ করতেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করল যে, কিয়ামতের পূর্বে একরাশ ধুম্র পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলবে। এতে সমস্ত মুনাফিকরা অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে কিন্তু মুসলমানদের সামান্য সর্দি কাশী বৈ কিছুই হবেনা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ঋজু হয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর আবেগাপ্লুত হয়ে উপস্থিত শ্রোতাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কোন বিষয়ে যে অভিজ্ঞ সে-ই যেন সে বিষয়ে মুখ ব্যদন করে। আর যদি অভিজ্ঞ না হয় তবে যেন পরিস্কার ভাবে বলে দেয় যে, আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ—এ বিষয়টি আমার জানা নেই। মনে রাখবে এও এক প্রকার ইলম। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে নির্দেশ দেন যে, "হে নবী আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যে সম্পর্কে আমি জানিনা তা জবরদস্তী বলবার কসরত করি না"। এর পর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, "কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণে চূড়ান্ত পর্যায়ের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে রাসূল পাক (সা) তাদের উপর দুর্ভিক্ষের অভিসম্পাত করলেন। ফলে তারা এমন কঠিন দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হল যে প্রাণ রক্ষার তাগীদে তারা মৃত জানোয়ারের অস্থি পর্যন্ত ভক্ষণ করতে বাধ্য হল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন গোটা নিসর্গ জুড়ে কেবল ধুম্র কুণ্ডলী ব্যতীত আর কিছুই তাদের দৃষ্টি গোচর হত না। এই নিদারুন পরিস্থিতির সময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এর তুলনায় আরো ভয়াল মুহূর্ত তোমাদের সম্মুখে আগত প্রায়। সে জন্য তৈরী হও। আর তা দ্বারা বদরের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল।[১] আর এটাই হল উল্লিখিত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা।

বিচারপতির মসনদে

বিচারপতি নিয়োগে সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় হল একজন যোগ্য ও ধার্মিক ব্যক্তির চয়ন। ইলম ও জ্ঞানে পারদর্শীতা ব্যতীত কেবল যোগ্যতা ও

---

১. বুখারী কিতাবুত্তাফসীর ২য় খণ্ড ৭১০ পৃষ্ঠা।
মুসনাদ ১ম খণ্ড ৩৮১ পৃষ্ঠা।

বিচক্ষণতার ভিত্তিতেও সমস্যার নির্ভুল সমাধান সম্ভব নয়। তাই হযরত উমর (রা) এই গুরুত্বপূর্ণ পদে যাদেরকে নির্বাচন করে ছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-ও তাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মীমাংসার যোগ্যতা ও দ্বীনদারীর সাথে সাথে পরিপক্ক ইলম ও জ্ঞানে তাঁর এক স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। যার কারণে তাঁকেও কাজীর পদে নিয়োগ করা হল। ২০ হিজরীতে হযরত উমর (রা) যখন আম্মার বিন ইয়াসিরকে কুফার গভর্ণর হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর সাথে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কেও বিচারক হিসাবে পাঠিয়ে দেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিচার আচার ব্যতীত বায়তুল মালের তত্ত্বাবধান ও মুসলমানেদেরকে দ্বীনি প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্বও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর উপরই অর্পিত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি কুফার প্রধানমন্ত্রীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদেরকে কুফায় প্রেরণের সময় হযরত উমর (রা) খলীফা হিসেবে কুফাবাসীদের কাছে যে ফরমান লিখে পাঠান তা নিম্নরূপ

الى بعثت اليكم عمار بن ياسر اميرا و ابن مسعود معلما و وزيرا و قد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم وانهما لمن النجباء من اصحاب محمد من اهل بدر فاسمعوا لهما واطيعوهما

আমি তোমাদের নিকট আম্মার বিন ইয়াসিরকে গভর্ণর এবং ইবনে মাসউদকে শিক্ষক ও মন্ত্রী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর তোমাদের বায়তুল মালের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও ইবনে মাসউদের উপর ন্যস্ত করেছি। তারা দু'জন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে খুবই মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্মানের অধিকারী। তাঁরা উভয়ে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করবে এবং তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করবে।[১]

এপর্যন্ত হযরত উমর (রা) আম্মার বিন ইয়াসির ও ইবনে মাসউদ (রা) উভয়ের প্রশংসা করেছেন। ফরমানের শেষাংশের তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর প্রশংসার্থে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার হৃদয় প্রকোষ্ঠে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিখুঁত ব্যক্তিসত্তা ও উন্নত মর্যাদা কতটুকু প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল। ফরমানের শেষাংশে তিনি উল্লেখ করেন :

---

১. ই'লামুল মুকিঈন ২১৮ পৃষ্ঠা।

و قد آثرتكم بابن ام عبد على نفسى

"ইবনে মাসউদ (রা)-কে তোমাদের নিকট প্রেরণ করতঃ বস্তুত তোমাদেরকে আমার নিজের উপরই প্রাধান্য দিলাম।"

অর্থাৎ তাঁর ইলম, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও দিয়ানতদারী এবং অন্তর্দৃষ্টি অন্যান্য গুণাবলী দ্বারা উপকার সাধনের প্রতি তোমরা যেমন মুখাপেক্ষী-আমিও তার ব্যতিক্রম নই। কিন্তু আমি নিজ স্বার্থ বলি দিয়ে তোমাদের উপকারার্থে তাঁকে প্রেরণ করলাম।

হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পর্ক

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত কালে জীবিত ছিলেন না। কিন্তু জীবিতাবস্থায় তিনি হযরত আলী (রা)-এর ইলমী উচ্চ মর্যাদার অনুরক্ত হয়ে তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক রেখে ছিলেন। হযরত আলী (রা) ছাড়া ও হযরত আবুদ্দারদা (রা), হযরত সালমান ফারেসী (রা), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা)-এর সাথে ও তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উলামা সাহাবীদেরকে তিনি অত্যন্ত কদর করতেন। হযরত আলী (রা) নিজেও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে।

আবুল বুহতারী বর্ণনা করেন যে, লোকেরা হযরত আলী (রা)-এর নিকট সাহাবায়ে কিরামের ইলমী পর্যায়ক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট কার সম্পর্কে জানতে চাও, তারা বলল হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। হযরত আলী (রা) ইরশাদ করলেন,

علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما

"তিনি (ইবনে মাসউদ) কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন অতঃপর এর ভিতরই অভিনিবিষ্ট হয়েছেন। আর ইলমী প্রয়োজন সমাধানে তিনিই যথেষ্ট।

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (স) ইরশাদ করেছেন, অতীতে প্রত্যেক নবীর বিশিষ্ট সহচর থাকত। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও অনুরূপ চৌদ্দজন সঙ্গী দিয়েছেন। তাঁরা হলেন, হামযা, জাফর, হাসান, হুসাইন

আবু বকর, উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু যর, মিকদাদ, হুযায়ফা আম্মার, সালমান ও বিলাল (রা)। হযরত আলী (রা) রাজধানী স্থানান্তরিত করে যখন কুফায় যান তখন সেখানের উলামা ও ফকীহদের প্রাচুর্য দর্শনে অভিভূত হয়ে যান এবং এ জন্য তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর উচ্চ মুখে প্রশংসা করেন।

হাইয়া বিন জাওইন বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা)-কুফায় পদার্পণ করলে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্য বৃন্দ তাঁর সাথে মুলাকাত করতে আসেন। খলীফা পরীক্ষামূলক ভাবে তাদের কাছে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেন। তিনি তাদের নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন উত্তরে খুবই প্রীত হন। শিষ্যবৃন্দ তাঁর নিকট ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে তাদের প্রিয় উস্তাদের প্রশংসা করেছিল। হযরত আলী (রা) বলেন,

وانا اقول فيه مثل الذى قالوا و افضل قرا القرآن
واحل حلاله وحرم حرامه فقيه فى الدين وعالم بالسنة

"তারা তাদের উস্তাদের যে প্রশংসা করেছে আমার ও অভিমত তা-ই। বরং আমি ত আরো অধিক বলে থাকি। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেছেন এবং কুরআন যা হালাল করেছে তিনিও তা হালাল জানতেন আর কুরআন যা হারাম করেছে তিনি তা হারামই ভাবতেন। অধিকন্তু তিনি একজন দ্বীনের ফকীহ ও সুন্নাহ'র আলিম ছিলেন।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) উদার মনে সমসাময়িকদের ইলম ও মর্যাদা স্বীকার করতেন এবং তাদের মূল্যায়ন করতেন। হযরত উমর (রা)-এর সাথে তাঁর খুবই ঐকান্তিকতা ছিল।

হযরত উমর (রা) সম্পর্কে তাঁর অভিমত

তিনি বলতেন যে, যদি সম্পূর্ণ আরববাসীর ইলম এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় হযরত উমর (রা)-এর ইলম রাখা হয় তবে উমরের পাল্লাই ভারী হবে। তিনি আরো বলতেন যে, উমরের সঙ্গে এক মুহূর্ত অতিবাহিত করা শত বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) অবিকল একথাটিই হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর সম্পর্কে ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন,

---

১. সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ৩৫ই পৃষ্ঠা।

لمجلس كنت اجالسه ابن مسعود اوثق فى نفس من عمل سنة

"ইবনে মাসউদ (রা)-এর মজলিসে এক মুহূর্ত কাটানোকে আমি শত বছরের আমলের তুলনায় ভারী মনে করি।

হযরত উমর (রা)-এর নিকট জ্ঞান আহরণ

তিনি হযরত উমর (রা)-এর ইলমও শ্রেষ্ঠত্বের কথা মৌখিক স্বীকার করেই ক্ষান্ত হতেন না। বরং যে সব বিষয়ে তিনি জানতেন না তা অসংকোচে হযরত উমর (রা)-এর নিকট জেনে নিতেন।

একবার তিনি স্বীয় পত্নীর একটি বাঁদী-খরীদ করেন। তারা বেচাকেনার সময় এই শর্ত করে নিয়ে ছিলেন যে, বাঁদীটি যদি আজকে অন্যত্র বিক্রি হয় তবে তার মূল্য আবদুল্লাহ না পেয়ে তার স্ত্রী পাবে। হযরত আবদুল্লাহ (রা) সওদা কিনে নিলেন কিন্তু তাঁর মনে খুবই খট্‌মট করতে লাগল যে তাঁর এ ক্রয় শুদ্ধ হল কি না। অনতিবিলম্বে তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে তাঁর মনের অশান্তির কথা জ্ঞাপন করলেন। হযরত উমর (রা) বললেন, তোমার এ ক্রয় শুদ্ধ হয়নি। অতএব এ বাঁদীকে তোমার নিজস্ব কোন কাজে লাগিও না।

হযরত উমর (রা) ছাড়াও সমকালীন সাহাবীদের নিকট থেকে তিনি ইলমী ভাবে উপকৃত হতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। ইমাম শা'বী (র) বলেন যে, হযরত উমর (রা), হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-পরস্পর ইলমী মত বিনিময় করতেন যার ফলে তাঁদের মাসআলা-মাসায়েল পরস্পরের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুনানে কুব্‌রা বায়হাকীর পাতা উল্টালে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছয় ব্যক্তিকে মুজতাহিদ হিসেবে অবিসংবাদ স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাঁরা পরস্পর ফিকাহগত পর্যালোচনা ও মত বিনিময় করতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা), উবাই বিন কা'ব (রা) ও আবু মূসা আশ'আরী (রা) ছিলেন একপক্ষে আর অন্য পক্ষে ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা), যায়দ বিন সাবিত (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)।

ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون قولهم

يقول ثلاثة من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم كان ابن مسعود

يدع قوله يقول عمر وكان ابوموسى الاشعرى يدع قوله يقول
على و زيد بن ثابت يدع قوله يقول ابى ابن كعب

রাসূলে করীম (সা)-এর সাহাবাদের মধ্যে তিনজন এমন ছিলেন যারা স্বীয় প্রমাণসিদ্ধ মতামতকেও তিন জন সাহাবীর অভিমত ও মাযহাবের জন্য পরিত্যাগ করতেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হযরত উমর (রা)-এর মাযহাবের সম্মুখে স্বীয় মাযহাবকে বর্জন করতেন। এমনি ভাবে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) হযরত আলী (রা)-এর মতামতের ভিত্তিতে নিজ রায়কে নাকচ করে দিতেন এবং হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) হযরত উবাই বিন কা'ব (রা)-এর মতামতকে স্বীয় অভিমতের উপর প্রাধান্য দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, তিনি কুরআনে পাকের একজন উত্তম ব্যাখ্যাদাতা। হুযূরে আকরাম (সা)-এর যুগে তিনি যদি আমাদের সমবয়সি হতেন তবে কেউ তাঁর ইলমী সমকক্ষতা লাভ করতে পারত না। এ হলো সমসাময়িকদের সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর উদার মনোভাব। তিনি স্বীয় শিষ্য-বৃন্দের ব্যাপারেও অবিকল এ উদারতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র হযরত আলকামা সম্পর্কে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তাঁর ইলম আমার ইলমের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।"

বক্তৃতা ও উপদেশ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর ওয়ায ও বক্তৃতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হত তবে সাথে সাথে তা হত ব্যাপক অর্থবহ ও হৃদয়গ্রাহী। আবুদ্দারদা (রা) বর্ণনা করেন যে, একদিন হুযূরে পাক (সা) নিজে প্রথমে নসীহত করলেন। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে বক্তৃতা করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা উভয়ে যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন। সবশেষে ইবনে মাসউদ (রা) বক্তৃতা দেয়ার আজ্ঞাপিত হলেন। তিনি নির্দেশ পালনার্থে দণ্ডায়মান হয়ে হামদ ও সালাত পাঠ করে বললেন—

ياايها الناس ان الله ربنا وان الاسلام ديننا وان هذا نبينا
واومأ بيده الى النبى صلى الله عليه وسلم رضينا مارضى الله لنا
ورسوله السلام عليكم

হে লোকসকল ! আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রভু সন্দেহ নেই। ইসলামই আমাদের ধর্ম ও জীবন চলার পথ। অতঃপর রাসূল পাক (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি আমাদের নবী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাতে সন্তুষ্ট আমরাও তাতে সন্তুষ্ট। তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।[১]

এতটুকু বলে তিনি বসে পড়লেন। রাসূল পাক (সা) তার এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় খুবই মুগ্ধ হন। তিনি ইরশাদ করলেন, "ইবনে উম্মি আব্দ যথার্থই বলেছে"।[২]

তিনি স্বীয় ওয়ায-নসীহতে দ্বীনি বিশ্বাস ও আকায়েদ বিশেষত আল্লাহর তাওহীদের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা ও আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ভীতিকে অন্তরে জাগরূক রাখার জন্যে তিনি শ্রোতাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন। এ ব্যাপারে তিনি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ পেশ করতেন। একদিন তিনি খোদাভীতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর ভয়কে নিজ অন্তরে সজীব করে রাখাই মূলত সমস্ত সৎ কর্মের রূহ। যদি অন্তর আল্লাহ তা'আলার ভয় শূন্য হয় তবে জীবনের সকল ক্ষেত্রই আল্লাহর আনুগত্য থেকে উজাড় থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বললেন যে, এক ব্যক্তির আমল নামায় তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত দ্বিতীয় কোন আমল ছিল না। অন্তিম কালে এ কথা স্মরণ হলে সে দারুন ভীত হয়ে পড়ে। তাই সে পরিজনদেরকে অন্তিম উপদেশ দিয়ে গেল যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে। অতঃপর আমার ভস্মীভূত দেহকে বিক্ষিপ্তাকারে নদীতে নিক্ষেপ করবে (হয়ত আমি পরকালীন শাস্তি থেকে বেঁচে যাব)। সুতরাং তার মৃত্যু হলে, তার অন্তিম বাসনা অনুসারে তাঁকে ভস্মীভূত করে নদীতে নিক্ষিপ্ত করা হল। আল্লাহ তা'আলা তার রূহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি স্বীয় দেহের সাথে এরূপ আচরণ করলে কেন ? তখন সে উত্তর দিল, প্রভু গো, আমি ত জীবনে কোন সৎকাজ করিনি। তাই তোমার ভয় আমাকে এ কাজে বাধ্য করেছে। এ কথা শুনে আল্লাহ্‌র করুনার সাগর উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১ম খণ্ড ১৩শ পৃষ্ঠা।
সিয়ারে আ'লামুন্নুবালা ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১ম খণ্ড ১৩শ পৃষ্ঠা।

দিলেন।[১] তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে সকলেই কামনা করত যেন তিনি তাঁর বক্তৃতাকে সুদীর্ঘ করেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম ধারা সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে, দীর্ঘ বক্তৃতার ফলে শ্রোতাবৃন্দ বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের অন্তরে কোন আপ্তবাক্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বক্তৃতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক হত। তিনি কখনও প্রমাণহীন তথ্য উপস্থাপন করতেন না। আবদুল্লাহ বিন মুবারক বলেন,

كان عبد الله بن مسعود يخطبنا كل خميس فيتكلم بكلمات فيسكت حين يسكت ونحن نشتهي ان يزيدنا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার নসীহত করতেন, তাঁর বক্তৃতা খুবই সংক্ষিপ্ত হত। আমরা চাইতাম যে, তিনি যেন বক্তৃতা আরও দীর্ঘ করেন। ভক্তদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ কথা-বার্তা ও বক্তৃতার অবতারনায় রাজী হতেন না। কেননা উপদেশের আতিশয্য মানুষের অন্তর থেকে গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। এক দিন তাঁর নসীহত শুনবার জন্য আগ্রহী শ্রোতাবৃন্দ অপেক্ষমান ছিল। কিন্তু তাঁর গৃহভ্যান্তর থেকে বের হতে খুবই বিলম্ব হচ্ছিল, ফলে তাঁর প্রিয় শিষ্য ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া তাঁর কাছে এই সংবাদ পাঠাল যে, মজলিসে শ্রোতাবৃন্দ ইন্তিজার করছে। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাশরীফ নিয়ে আসুন। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি চলে আসলেন এবং বললেন, ভাইয়েরা! আমি জানতাম যে, আপনারা অনেকক্ষণ যাবৎ আমার জন্য অপেক্ষমান রয়েছেন, কিন্তু আমি জেনে শুনেই বিলম্ব করেছি। কেননা বারংবারের নসীহতে শ্রোতাবৃন্দ অতিষ্ঠ হয়ে যায় ফলে সমস্ত উপদেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। রাসূল করীম (সা) আমাদের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে স্বীয় বক্তৃতা স্থগিত রাখতেন।[২]

কুরআন সংকলনে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে মতানৈক্য

রাসূল করীম (সা)-এর যুগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নিজস্ব ভাবে কুরআন পাক সংকলন করেছিলেন। এতে তিনি বিভিন্ন আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং যে সব আয়াতের পাঠ রহিত হয়ে গেছে তাও

১. মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

২. বুখারী শরীফ, মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড ৩৭৭ পৃষ্ঠা

লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আল্লামা জাহবী ত্বাবাকাতুল কুররা গ্রন্থে এ কথার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন,

وكان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقن عامته منه واقرأ كان يفتخر وحق له قرأعليه علقمة و الاسود ومسروق و زر ابن حبيش و زيد بن و هب و ابو عمرو الشيباني و ابو عبد الرحمن السلمى وطالعه

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে যে সব সাহাবায়ে কিরাম কুরআন সংকলন করেছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কুরআন পাকের অধিকংশ আয়াতই তিনি সরাসরি মহানবী (সা)-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং এ নিয়ে তিনি গর্ববোধ করতেন। নিঃসন্দেহে তাঁর এ ফখর যথার্থ ছিল। অগণিত শিষ্য তাঁর সংকলিত কুরআন পাকের পাঠ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আলকামা, আসওয়াদ 'মাসরুক জুরর ইবনে হুবাইশ, যায়দ বিন আবি ওহাব, আবু আমর শায়বানী ও আবু আব্দির রহমান আছালামীর নাম উল্লেখযোগ্য। হযরত ওসমান (রা) স্বীয় খিলাফত কালে লক্ষ্য করলেন যে, নানাহ পদ্ধতিতে সংকলিত কুরআন পাকের বিভিন্ন কপি পাঠ করে মানুষের মাঝে বিশৃংখলার সৃষ্ট হচ্ছে, অতএব অনতিবিলম্বে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; তাই তিনি পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা) ও উমর ফারুক (রা) সম্মিলিতভাবে কুরআন পাকের যে সংকলন তৈরী করেছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রদেশে তাই প্রচার করা হবে এবং অবশিষ্ট সংকলন সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এই ব্যাপারে খলিফার সাথে একমত হতে পারেননি। সুতরাং হুযুর আকরাম (সা)-এর যুগে তিনি নিজ হাতে কুরআনের যে সংকলন তৈরী করেছিলেন তা খলিফার হস্তে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এমনকি হযরত উসমান (রা)-এর প্রেরিত দূতদের সাথেও তিনি পুরোপুরি সৌজন্যতা রক্ষা করতে পারেন নি। এতে হযরত উসমান (রা)-এর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এ সবের একটা রফা হয়েছিল।[১] উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে মাসউদের এই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন একেবারেই অযৌক্তিক ছিল না। কেননা তাঁর নিজস্ব সংকলিত কুরআনের

---

১. কাশফুল ইযাম ১ম খণ্ড ৩৫২ পৃষ্ঠা।

কপিটি রাসূল করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই রচিত হয়েছিল। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় খিলাফত কালে যে কুরআন পাকের সংকলনটি তৈরী করেছিলেন তাতে হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা)-এর ভূমিকাই ছিল প্রধান। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (সা)-এর সাহচর্যে যখন কুরআন পাকের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) তখন নিতান্তই ছোট সমবয়সীদের সাথে খেলাধূলায় দিন গুজরান করতেন।[১] হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কুরআনী ইলমে যে গভীরতা ছিল অন্য কারুরই তা ছিল না। এ কথা পূর্বে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী উলামায়ে কিরাম তাঁর সম্পর্কে বলেন

من كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و متقدميه وسادات فقهائهم -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তো ছিলেন বয়ঃপ্রবীণ ও প্রাথমিক যুগের সাহাবাদেরই একজন। তিনি ছিলেন ফকীহ ও আইনজ্ঞ সাহাবাদের অন্যতম প্রধান। কুরআনে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,

من اراد ان يسمع القران غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد

যে ব্যক্তি শুদ্ধ ও সাবলীল ভাবে কুরআন পাককে অবিকল রূপে পাঠ করতে চায় সে যেন ইবনে উম্মে আব্দ এর তিলাওয়াতের অনুসরণ করে।[২]

এই নবুবী সনদ প্রাপ্তির পর গৌরব উদ্ভাসিত ইবনে মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত মতানৈক্যকে কিছুতেই দূষণীয় ভাবা যায় না বরং যথার্থ ও যুক্তিযুক্তই ছিল। তিনি নির্দ্বিধায় আমীরুল মু'মিনীন এর নির্দেশ কেন নতশীরে মেনে নেননি এ অভিযোগ নিতান্তই অমূলক হবে। এতে তাঁর মর্যাদার এতটুকুও হানি হবে না। তিনি ইলম ও জ্ঞানের যে উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন ছিলেন তাতে খলীফার নির্দেশ পালনের ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা তাঁর জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল।

---

১. নাসাঈ কিতাবুল্‌জিনাহ।
২. সিয়ারে আলামুন্নুবালা ২৪১ পৃষ্ঠা।

তাঁর হাদীস বর্ণনা-পদ্ধতি

তিনি এমন এক পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করতেন যাতে শ্রোতাবৃন্দ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারত যে এ এক মহিমামণ্ডিত সত্তার হিদায়াতের তাবলীগ। তাদের সম্মুখে মহানবী (সা)-এর বাস্তব ছবি রূপায়িত হয়ে উঠত। যেন তারা স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র মুখেই হাদীস শ্রবণ করছে। একদা তিনি শ্রোতাদেরকে জান্নাতে আল্লাহর সাথে মু'মিনদের সাক্ষাৎ বিষয়ক একখানা দীর্ঘ হাদীস শুনাচ্ছিলেন। হাদীস শেষ করে তিনি এক বিশেষ ভঙ্গীতে হাসি দিলেন। এর পর বললেন, আমার হাসবার কারণ সম্পর্কে তোমরা জান কি? উত্তর হল আমরা ত জানিনা। তিনি বললেন, জান! রাসূলুল্লাহ (সা) ও এই হাদীস বলবার পর এভাবেই হাসি দিয়ে ছিলেন।[১]

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা

হাদীস বর্ণনায় তাঁর সতর্কতা ছিল অপরিসীম। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন,

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

রাসূল পাক (সা)-এর এ হাদীস সর্বদা হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্মৃতি পটে আঁকা থাকত। সাবিত বিন কুত্ববা বলেন,

كان ابن مسعود يحدثنا في الشهر بالحديثين والثلاثة

"হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মাসে দু'তিনটির অধিক হাদীস বর্ণনা করতেন না।[২] এ হলো হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদীস বর্ণনায় অধিক সতর্কতা অবলম্বনের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর এ সতর্কতার আরেক উজ্জ্বল দলিল হল যে, তিনি কোন হাদীসকে সরাসরি রাসূলে পাক (সা)-এর সাথে সংযুক্ত করতেন না। আবু আমর শায়বানী বলেন,

---

১. মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

২. দারেমী, কিতাবুল ইলম।

كنت اجلس الى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم استقلته الرعدة و قال هكذا او نحو ذا او قريب من ذا ـ

আমি সংবৎসর ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মজলিসে উপস্থিত থাকতাম। কিন্তু কোন দিন তাঁকে একথা বলতে শুনিনি যে "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন" যদি কদাচিৎ তাঁর মুখ থেকে এবাক্য নিঃসৃত হয়ে যেত, তবে তাঁর গোটা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠত। আর অস্থির চিত্তে তিনি বলতে থাকতেন যে, রাসূলে পাক (সা) হয়ত এরূপ বা এর সমার্থক অথবা এর কাছাকাছি কোন কথা বলেছিলেন।[১]

হযরত আলকামা বিন কায়স বর্ণনা করেন ঃ

ان عبد الله بن مسعود كان يقوم قائما كل عشية خميس فما سمعته فى عشية منها يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم غير مرة واحدة قال فنظرت اليه و هو معتمد على عصا فنظرت الى عصاة تزعزع ـ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার দণ্ডায়মান হয়ে রাসূলে পাক (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু কোন দিন আমি তাঁকে সরাসরি قال رسول الله অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন একথা উচ্চারণ করতে শুনিনি। তবে একবার অকস্মাৎ তাঁর মুখ থেকে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন এবাক্যটি উচ্চারিত হয়ে যায়। তখন তিনি যষ্ঠিতে ভর করেছিলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে ভয়ে তাঁর যষ্ঠিতে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে গেছে।[২] তবাকাত গ্রন্থের অন্যত্র আমর বিন মাইমুন থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اختلف الى عبد الله بن مسعود سنة ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الا انه حدث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال انشاء الله امافوق ذالك و اما قريب من ذالك و اما دون ذالك ـ

১. যাহবী ১ম খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা।
২. আত্তবাকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড ১১১ পৃষ্ঠা।

আমি পূর্ণ এক বছর যাবৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মজলিসে আসা যাওয়া করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে কোন দিন তাঁকে রাসূল পাক (সা)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। হাদীস বর্ণনায় সময় তিনি কখনো বলতেন না যে "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন। তবে একদিন তিনি হাদীস শোনাচ্ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হল قال رسول الله রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন" ফলে তিনি এত ঘাবরিয়ে গেলেন যে, দেখলাম তার ললাট বেয়ে ঘর্ম প্রবাহিত হচ্ছে। আর তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন ইন্‌শাআল্লাহ রাসূল (সা) এরূপ বলেছেন। অথবা এর উর্ধ্বে বা কাছাকাছি বা এর চেয়ে কিছুটা কম বলেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রায়শই বলতেন :

ليس العلم بكثرة الرواية و لكن العلم الخشية -

অধিক পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করাটাই ইলম নয়। ইলম তো খোদা ভীতির নাম। ইবনে হাব্বানের রওযাতুল ফুযালা নামক কিতাবে উল্লিখিত কথারই সমার্থক একটা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে :

ليس العلم بكثرة الرواية وانما العلم الخشية -

বর্ণনাধিক্যের নাম ইলম নয়। ইলম হল আল্লাহ্‌র থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির নিয়তের নাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলে আকরাম (সা)-এর গোটা নবুওতী জীবনে অর্থাৎ প্রায় ২৩ বছর পর্যন্ত নবুবী সান্নিধ্যে জীবন ধন্য করবার সুযোগ পেয়েছেন। অথচ মুহাদ্দিসীনদের বর্ণনানুযায়ী তিনি স্বীয় জীবনে মাত্র ৮৪৮ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হাদীস বর্ণনায় কতটুকু সচেতন ছিলেন। সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত তাঁর হাদীসের সংখ্যা আড়াইশ'র বেশী নয়। হাদীস বর্ণনায় সংখ্যাধিক্য ও স্বল্পতার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামকে মুহাদ্দিসদের পরিভাষা অনুযায়ী চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১। মুকছিরীন—যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হাজারের উর্ধে।

২। মুতাওসসিতীন—যারা কমপক্ষে পাঁচশ' এবং উর্ধে এক হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩। ঐ সকল সাহাবী যারা পাঁচশর নীচে এবং সর্ব নিম্নে চল্লিশ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪। মুকিল্লীন — যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চল্লিশের নীচে।

এ হিসাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মুতাওস্সিতীন সাহাবীদের পর্যায়ভুক্ত। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) বলেন, "হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)-কে মুতাওয়াস্সিত সাহাবীদের পর্যায়ে ফেলতে আমার আপত্তি রয়েছে। কেননা তাঁদের থেকে ফিকাহ, ইহসান ও হিকমত বিষয়ক অনেক মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। আর এগুলো বাহ্যতঃ যদিও তাঁদের উক্তি বলে মনে হয় কিন্তু মূলতঃ এগুলোও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলোর হাদীস হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট দলীল রয়েছে। এ ব্যাপারে যদি কোন সংশয় হয় তবে তা যাচাই করবার পদ্ধতি হল এই, তাদের থেকে বর্ণিত মাসআলাগুলোকে অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। যদি সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত হাদীসের সাথে তাঁদের বর্ণিত ফতোয়ার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় তবে আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে এগুলোও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। কোন বিবেকবান লোক এতে সন্দেহ পোষণ করতে পারেনা। সুতরাং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস ও ফতোয়া ইত্যাদির সমষ্টিকে হিসেব করলে তাঁরা নিঃসন্দেহ মুকছিরীন সাহাবীদের পর্যায়ভুক্ত হবেন।১ যদিও পরিভাষিক ভাবে এটা যথার্থ নয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ)-এর উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সিহাহ সিত্তাহ ও মাসানীদে বর্ণিত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসের সংখ্যা ৮৪৮ হলেও বাস্তবিক পক্ষে এর সংখ্যা হাজারের অনেক উর্ধে পৌঁছবে। বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিত-ভাবে তাঁর ৬৪ খানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে স্বতন্ত্র-ভাবে যথাক্রমে ১২১ ও ৩৫ খানা হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হলে সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনূর্ধ আড়াইশ।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) বলেন, পরিভাষা হিসেবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) যদিও মুতাওয়াস্সিত সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ও মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ নামক হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)-এর যে সব উক্তি ও ফতোয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে গুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন এবং হানাফী

১. ইজালাতুল খফা ২১৪ পৃষ্ঠা

ফিকাহ নামে তাদের যেসব ফতোয়া বিশ্ব ব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সে গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবার দেখুন যে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত সহীহ হাদীসের সাথে এগুলো কত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমার্থবোধক।

শিষ্যদেরকে হাদীস বর্ণনায় সতর্কীকরণ

আল্লামা জাহ্বী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর জীবনালেখ্য তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন :

كان ممن يتحرى فى الأداء و يشدد فى الرواية ويزجر تلامذته من التهاون فى ضبط الالفاظ۔

তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক ও কঠোরতা অবলম্বন করতেন। স্বীয় শিষ্যবৃন্দকেও নির্দেশ দিতেন যাতে শাব্দিক ধারাবাহিকতা সংরক্ষণে শিথিলতা প্রদর্শন না করে। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য হযরত মাসরূক (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রায়ই আফছোছ করে বলতেন যে, সে দিন আগত প্রায় যখন পৃথিবীতে কোন ইলমবাহী ব্যক্তিত্ব অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে মাযহাব ও ধর্মীয় নেতৃত্বের বাগডোর কেবল তাদেরই হাতে চলে যাবে যারা মূর্খতার বশবর্তী হয়ে সব ব্যাপারে নিজস্ব কিয়াস ও ধারণার উপর নির্ভর করবে।[১]

একটি সন্দেহের অপনোদন

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে স্মরণশক্তি ও ধর্মানুরাগের সাথে সাথে বোধ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, যাতে হাদীস বর্ণনায় কোন শাব্দিক ও অর্থগত ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। কেননা বর্ণনাকারীর উপরই সকল ভুল ভ্রান্তির যিম্মাদারী আপতিত হবে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে এর জন্য কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে। হাদীস বর্ণনায় সামান্য অসতর্কতা শ্রোতাকে বিরাট গোমরাহীর মুখে ঠেলে দিতে পারে। এসবের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত উমর (রাঃ) তার খেলাফত কালে অধিক পরিমাণ হাদীস বর্ণনা নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইব্রাহীম নাখঈ বর্ণনা করেন :

১. ই'লামুল মু'কিঈন ৬৪ পৃষ্ঠা।

ان عمر حبس ثلاثة ابن مسعود و ابا الدرداء و ابا مسعود الانصاری فقال لقد اکثرتم الاحادیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم -

হযরত উমর (রাঃ) তিন ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। এ'রা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু দারদা ও আবু মাসউদ আনসারী (রা)।

এখানে আরবীতে حبس শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হল বন্ধ২ করা বা বন্দী করা। এর ফলে অনেকে এই ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) তাঁদেরকে বর্ণনাধিক্যের কারণে বন্দী করেছিলেন। অথচ একথা সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা হযরত উমর (রাঃ) এর মনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর যে মর্যাদা বদ্ধমূল ছিল তাতে তাঁর পক্ষে এমন আচরণ কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

যদি একথা বলা হয় যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর বারণ সত্ত্বেও যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা) অতিরিক্ত হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকেন নি, ফলে হযরত উমর (রাঃ) বাধ্য হয়ে তাঁকে বন্দী করেছিলেন; তাও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। কেননা খোদ ইবনে মাসউদ খলীফা উমর (রাঃ)-কে খুবই সম্ভ্রমেরদৃষ্টিতে দেখতেন। মুহসিন বিন জরীর তবারী বলেন, উমর ফারুক (রাঃ)-এর সঙ্গীদের মধ্যে একমাত্র ইবনে মাসউদ (রাঃ) ব্যতীত অন্য কারুর ফতোয়া ও ফিকহী ইজতিহাদ সংকলন করা হয়নি। অতএব এ তো কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না যে, হযরত উমর (রাঃ) কোন বিষয়ে নিজ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত: হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে তা থেকে বারণ করবেন আর ইবনে মাসউদ (রাঃ) তা মেনে নেবেন। উপরন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় যে সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে কয়েদ সম্পর্কীয় এ ঘটনাই অবাস্তব সাব্যস্ত হয়।

ইলমী গবেষণার আগ্রহ

হাদীস বর্ণনার সাথে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মূলতঃ স্বভাবগত ঝোঁক ও সংযোগ ছিল। মজলিসে স্বয়ং তিনি যে ভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন তদরূপ অন্যান্য সাহাবার নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করতেন এবং তাঁদের সাথে গভীর অভিনিবেশ সহকারে হাদীসের তাৎপর্য ও গূঢ়তাত্ত্ব উদঘাটনে প্রলিপ্ত হতেন। এ আগ্রহাতিশায্যের বশবর্তীতে তিনি মাঝে

২. حبس عن الكلام অর্থ কথা বন্ধ করে দেয়া—মিসবাহুল লুগাত।

মাঝে স্বীয় বন্ধুবর্গের বাটিতে উপস্থিত হতেন। তাঁদের মাঝে ইলমী সুধা বিতরণ করতেন এবং তাঁদের কাছে কোন নতুন হাদীস বা হাদীস সম্পর্কীয় কোন নতুন তথ্য পেলে তা সাগ্রহে গ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন সংকোচনের পরিচয় দিতেন না।

ওয়াবিছা আসাদী বলেন, আমি কুফাস্থিত নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। একদিন দ্বিপ্রহরে কে যেন এসে দরজায় করাঘাত করল। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, এই উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে কেউ আমার বাড়ীতে পদচারণা করবে। বাইর থেকে সালাম আসলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দেখতে চাইলাম যে, এ মুহূর্তে কোন্ আল্লাহ্র বান্দা কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসে পৌঁছেছেন। দরজা খুলে আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম যে, স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) দণ্ডায়মান হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আবু আব্দির রহমান! সাক্ষাতের জন্য এ কেমন মুহূর্ত বেছে নিলেন? আপনার তো অতিশয় কষ্ট হয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) জবাব দিলেন, আজ একটু অবসর ছিল, তাই মনে করলাম যে, নবী সান্নিধ্যে উদ্ভাসিত কারুর সাথে কথাবার্তা বলে নবুবী যুগের স্মৃতিচারণ করি। বললাম, ধন্যবাদ, হৃষ্টচিত্তে তাশরীফ নিন। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) আসন গ্রহণ করলে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর হাদীস বর্ণনা ও পর্যালোচনা করতঃ প্রাণ উজ্জীবিত করেছিলাম।[১]

স্বীয় ত্রুটি স্বীকারে সংকোচিত হতেন না

তিনি এত নিরহংকার ছিলেন যে, কুরআন ও হাদীসের প্রচুর জ্ঞান ও ইজতিহাদের অসাধারণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কখনো যদি জানতে পারতেন যে, কোন সিদ্ধান্তে যৎসামান্য ভুল করে ফেলেছেন তবে স্বীয় পারদর্শিতা ও জ্ঞানগত ঠাট বজায় রাখবার অমূলক তা'বীল ও করা যাচ্ছে তাই ব্যাখ্যার পেছনে পড়তেন না। বরং অবিলম্বে নির্দ্বিধায় সে ত্রুটি স্বীকারোক্তির সাথে প্রশ্ন কর্তাকে সঠিক জবাব দিতেন। এক দিনের ঘটনা, কুফায় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তাকে তালাক দেয় তবে তালাকের পর সে স্ত্রীর মাকে বিবাহ করতে পারবে কিনা? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিবাহ বৈধ বলে ফতোয়া দিলেন।

---

১. মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

কিন্তু মদীনায় আসার পর অন্যান্য সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হলে প্রমাণ হল যে এ ধরনের বিবাহ জায়েয নয়। ইবনে মাসউদ (রাঃ) অবিলম্বে কূফায় চলে গেলেন এবং যথেষ্ট খোঁজাখুঁজির পর প্রশ্নকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে সে বিবাহ ভঙ্গে দিয়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।[১]

অজানা বিষয়ে মত প্রদানে অসম্মতি

মহানবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পর যদি এমন কোন সমস্যা দেখা দিত, যে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস প্রসূত কোন সমাধান তাঁর জানা ছিল না তবে সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত প্রদানে তিনি সম্মত হতেন না। কিন্তু জনসাধারণ বাড়াবাড়ি করলে গভীর ভাবে তিনি বিষয়টি চিন্তা করতেন এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করে একটা সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। পরবর্তীতে যদি জ্ঞাত হতেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ফয়সালার অনুরূপ হয়েছে তবে দারুণ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করতেন। জনৈকা স্ত্রীলোকের স্বামী তার সঙ্গদানের পূর্বেই ইন্তিকাল করে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে মহিলাটি মহর ও উত্তরাধিকার পাবে কিনা ? এ সম্পর্কে ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কোন মাসআলা জানা ছিলনা বলে তিনি ফতোয়া দানে অসম্মতি জানালেন। লোকেরা পীড়াপীড়ি করলে তিনি দীর্ঘ এক মাসের সময় চেয়ে নিলেন। অতঃপর দীর্ঘ চিন্তা ভাবনার পর তিনি ফতোয়া দিলেন যে, মহিলাটি মহরে মিছাল ও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশীদারীত্ব পাবে এবং তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। এরপর তিনি বলেন যে, আমার এ সিদ্ধান্ত সঠিক হলে তা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ। আর যদি ভুল হয় তবে নিঃসন্দেহে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর দায়দায়িত্ব থেকে বিমুক্ত। এসময় হযরত আবু জাররাহ (রাঃ) ও হযরত আবু সিনান (রাঃ) (কোন কোন বর্ণনা মতে ছালমাহ বিন ইয়াজিদ (রাঃ)) নামে দু'জন সাহাবী তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রায়কে সমর্থন দিলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) বুরদা বিনতে ওয়াসিক সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর আনন্দের সীমা ছিল না।[২]

১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক ১৯৩ পৃঃ।
২. সুনানে নাসাঈ।

সমসাময়িকদের থেকে জ্ঞান আহরণ

যে বিষয় তিনি জানতেন না নিঃসংকোচে তিনি তা অভিজ্ঞজনদের থেকে জেনে নিতেন। স্বীয় স্ত্রীর নিকট থেকে বিশেষ শর্ত সহকারে একজন বাঁদী খরীদ করলে এ ব্যাপারে তাঁর মনে খুঁতখুঁতি থেকে যায়। তাই হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট তিনি মাসআলা জিজ্ঞেস করতঃ তিনি কিভাবে তা অনুসরণ করেছিলেন পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকতা ও শিষ্যবৃন্দ

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁকে বিচারপতি ও গভর্ণরের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কুফায় প্রেরণ করেছিলেন। তা ছাড়া বায়তুল মালের তত্ত্বাবধান-ও তাঁর দায়িত্বভুক্ত ছিল। কিন্তু কুফাবাসীর ধর্মীয় শিক্ষা ও তাদের আখলাকী পরিচর্যার ভেতরই তিনি অধিক সময় ব্যয় করতেন। কুরআন-হাদীস ও ফিকাহর শিক্ষা বিস্তার কল্পে তিনি নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যাপীঠ চালু করেন। শিষ্যবৃন্দের এত জমাজমাট হয়েছিল যে, একই গুরুর সম্মুখে নতজানু শিষ্যবৃন্দের এতবড় জামআত তদানীন্তন কালে আর কোথাও পরিলক্ষিত হত না। তবাকাতুল কুবরা নামক গ্রন্থে আল্লামা জাহবী লিখেছেন ঃ

وتفقه به خلق كثير و كانوا لا يفضلون احدا في العلم -

"অগণিত ছাত্র তাঁর নিকট ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন আর তারা অন্য কাউকে ইলমী দিক থেকে অগ্রাধিকার দিতেন না।"

আল্লামা নববী স্বীয় প্রণীত তাহযীবুল আছমা ওয়াল্লুগাত নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

سمع منه خلائق لا يحصون من كبار التابعين -

"অসংখ্য প্রবীণ তাবেঈ তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

আসরারুল আনওয়ার গ্রন্থে আছে ঃ

كان ابن مسعود بالكوفة و له اربعة الاف تلميذ يتعلمون بين يديه -

"কুফায় হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর চার হাজার শিষ্য ছিল, এরা তাঁর সম্মুখে অধ্যয়ন রত থাকত।"

একটা শিক্ষাগার মূল্যায়ন করতে হলে দু'টি বিষয়ই লক্ষণীয়।

১০ সেখানের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাই করুন।

২. উল্লিখিত বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকে নিরীক্ষণ করুন।

কোন শিক্ষাঙ্গনের অধ্যাপক মন্ডলী যদি স্ব-স্ব গুণাবলী ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমকালের চোখে অসাধারণ প্রমাণিত হয় এবং সেখান থেকে শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দ যদি পূর্ণ যোগ্যতা এবং উন্নত ইল্‌মী প্রতিভার অধিকারী হয় তাহলে সকলেই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে একটি আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাঙ্গন হিসাবে মেনে নেবে। এ অনুসারে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুফার শিক্ষাঙ্গণটি উন্নত শিক্ষা এবং শিষ্যবৃন্দের আধিক্য হিসাবে অনুপম ছিল। খোদ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যাপক। আর সেখানে এমন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে যে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ তাদের জ্ঞান প্রস্রবণ থেকে স্বীয় পিয়াস নিবারণ করতে থাকবে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমাম তাবারী বলেন, ইসলামের ইতিহাসে ইবনে মাসউদের (রাঃ) মত এমন কোন ব্যক্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় না যার শিক্ষাঙ্গণ থেকে এ ধরণের প্রথিতযশা উলামা তৈরী হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

لم يكن احد له اصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه فى الفقه غير ابن مسعود ـ

ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাড়া এমন আর কেউ ছিলেন না যার শিষ্যবৃন্দ সম-কালের এত খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং উস্তাদের ফতোয়া ও ফিকহী মাযহাবকে সংকলন করতঃ সে গুলোকে জীবন্ত করে রেখেছেন।

হিজরী ১৭ সনে যখন কুফা শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন থেকেই ইবনে মাসউদ (রা) কুফাবাসীকে ধর্মীয় রং এ রঙ্গীন করে তুলবার প্রয়াস পেয়ে আসছেন এবং (হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে) তাঁর কুফায় অবস্থান কাল পর্যন্ত এ প্রচেষ্টাকে বরাবর অব্যাহত রেখেছেন। যার ফলে মুহাদ্দিসীন, মুফাস্‌সিরীন, ফুকাহা ও কারীদের জমজমাটে গোটা কুফা মুখরিত হয়ে ওঠে। মুসলিম বিশ্বের ইলম ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কুফা নানাহ সাহাবীর পদচারণায় হয়ে ওঠে চির মহিমান্বিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) কুফায় পদার্পণ করে যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ইলম ও শিক্ষাগত কীর্তি পরিদর্শন করেন তখন তাঁর আনন্দ ও আশ্চর্যের সীমা ছিলনা। শিক্ষার এ অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে বিশ্ব মুস-লিমের অন্তরে কুফার ভালবাসা বদ্ধমূল হয়ে গেল। দিকে দিগন্তে এর ব্যাপক চর্চা হতে লাগল। কুরআন-হাদীস, ইলমে ফিকাহ ও কুফাকে কেউ স্বতন্ত্র-

ভাবে ভাবতে পারতনা। কুফার ন্যায় মুহাদ্দিস, ও ফকীহদের এত জমজমাট পৃথিবীর আর কোথাও ছিলনা। এ ব্যাপারে কুফা ছিল একক ও অদ্বিতীয়। মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে' উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত কা'ব আল্ আহবার (রাঃ) এর কাছে বিশ্ব পরিচিতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মাখলুকাতকে সৃষ্টি করবার পর প্রত্যেককে যথাযোগ্য আসবাব ও গুণাবলী দান করলেন। আকল ও বুদ্ধিমত্তা কুফাকে পছন্দ করলে ইলম বলল যে, আমিও তোমার সাথে রয়েছি।[১] আবদুল জব্বার বিন আব্বাস বলেন যে, আমার আব্বা আব্বাস মক্কার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আতা বিন রাবাহ (রঃ)-এর কাছে কোন একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে হযরত আতা (রঃ) তার ঠিকানা জান্তে চাইলেন। আব্বাজী জবাব দিলেন যে, আমি কুফার বাসিন্দা। হযরত আতা এ কথা শুনে বললেন যে, অদ্ভুত কথা যে তুমি কুফার অধিবাসী হয়ে আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করছ! অথচ মক্কার সবটুকু ইল্ম কুফা থেকেই এসেছে।[২] উল্লেখযোগ্য শহরসমূহের জ্ঞানীজনরা বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ শহরে আগত সাহাবাদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। যে সব সাহাবীদের পদবিক্ষেপে মিশর ধন্য হয়েছে আল্লামা সুয়ূতি তাদের নাম লিপিবদ্ধ করলে তা তিনশত এর উর্ধে পৌঁছেনা। অথচ আল্লামা আজালীর গণনানুসারে যে সব সাহাবায়ে কিরাম কুফায় স্থায়ী বসতী স্থাপন করেছিলেন তাদের সংখ্যা দেড় হাজারেরও অধিক হয়।[৩] এঁদের মধ্যে বদরে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যাই হল ৭০ জন। উল্লিখিত দেড় হাজার ছাড়াও অগণিত সাহাবী বিভিন্ন সময় কুফায় পদার্পণ করেছেন এবং কিয়ৎকাল বসবাসও করেছেন। অতঃপর ইলুমের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। এ হল কেবল ইরাকের একটি মাত্র শহর কুফার অবস্থা। এতদ ব্যতীত ইরাকের অন্যান্য শহরেও অগণিত সাহাবায়ে কিরাম স্থায়ী বসবাস করেছেন। কেউ বা কিছুকাল থেকে অন্যত্র সফর করেছেন। আল্লামা রাজী বলেন, ৮৩ হিঃ তে যে সব সৈন্য আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আসআদ এর সাথে হাজ্জায বিন ইউসুফ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে কেবল কুারীদের সংখ্যাই ছিল চার হাজার।

---

১. মু'জামুল বুলদান ১ম খণ্ড, ৫০ পৃঃ
২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ।
৩. যাবানাতে কাওছারী ১৩১ পৃঃ

এই একটি ঘটনা দ্বারাই কুফার শিক্ষাগত মান নির্ণয় করা যেতে পারে। এপুস্তকে আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর একশত চল্লিশ জন শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছি। এদের মধ্যে হযরত আলকামা বিন কায়স, হযরত আসওয়াদ, হযরত মাসরূক, হযরত উবায়দা, হযরত হারিস, কাজী সুরাইহ্ ও হযরত আবু ওয়ায়েল এর মত সমকালের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণও শামিল রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই গোটা মুসলিম বিশ্বে বিপুল খ্যাতি লাভ করেছেন। মহানবী (সা)-এর দরবারে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর যে বিশেষত্ব ছিল ঠিক তদ্রূপ হযরত ইবনে মাসউদের মজলিসেও আলকামা বিন কায়স (রঃ)-এর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) যেভাবে রাসূলে পাক (সা)-এর চরিত্র, আমল ও গুণাবলীর বাস্তব প্রতিকৃত ছিলেন, তেমনি ভাবে হযরত আলকামা (রঃ) ছিলেন স্বীয় উস্তাদ ইবনে মাসউদের গুণাগুণের এক মূর্ত প্রতীক। তার পুত্র হযরত আবু উবায়দাও এমনিভাবে পিতার এক বাস্তব নমুনা ছিলেন। ইমাম বুখারী প্রণীত তারীখে কামিল গ্রন্থে হযরত আ'মাশ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে :

"كان ابو عبيده اشبه صلوة عبد الله"-

আবু উবায়দা (রঃ)-এর নামায হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সদৃশ ছিল।

হযরত আলকামা (রঃ) সফরেও হযরত ইবনে মাসউদের সাহচর্যে থাকতেন। নিতান্ত কোন কারণ বশতঃ যদি সংগে থাকতে না পারতেন তবে নিজের কোন আপনজনকে তাঁর সঙ্গী করে দিতেন; যাতে ফিরে এসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সফর কালীন সমূহ অবস্থা তাঁর কাছে বিবৃত করতে পারেন। হযরত আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদা হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে রওনা হন। হযরত আলকামা বিশেষ কোন কারণে তাঁর সফর সঙ্গী হতে পারেননি, তাই আমাকে তাঁর সাথী করে দিলেন এবং বললেন যে, সর্বদা হযরতের সঙ্গে থাকবে এবং যা কিছু শুনতে পাও বা তোমার দৃষ্টিগোচর হয় ফিরে এসে তা আমাকে অবহিত করবে।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) একবার হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনার শিষ্যরাও কি আপনার ন্যায় এত সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন যে, আপনি

যদি ইচ্ছা করেন তবে কারুর দ্বারা পাঠ করিয়ে শুনাতে পারি। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বললেন, অবশ্যই শোনাবেন। তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর প্রিয়তম ছাত্র আলকামা (রঃ) কে কুরআন তিলাওয়াত করবার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পালনার্থে হযরত আলকামা কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে লাগলেন। প্রায় ৫০ আয়াত তিনি এভাবে পাঠ করলেন যে, সময় পার হয়ে গেল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আলকামা'র তিলাওয়াত সম্পর্কে হযরত খাব্বাব (রাঃ)-এর কাছে মতামত চাইলে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১]

ভক্তদের সমারোহ

অসংখ্য ছাত্রের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ব্যতীত প্রতিদিন তাঁর মজলিসে বিপুল ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ঘটত। তারা তাঁর ইলমের ঝর্ণধারা হতে পাত্র পুরে পুরে আহরণ করত ইলমের অমীয় সুধা। আবু ওয়ায়েল কুফী বলেন যে, আমরা মজলিসে বসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর বহির্গমনের জন্য অপেক্ষমান থাকতাম।[২]

তারিক বিন শিহাব বলেন যে, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতাম। নিয়মানুগভাবে একদিন আমরা তাঁর মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। অকস্মাৎ এক ব্যক্তি عليكم السلام يا اباعبد الرحمن (আপনার উপর সালাম, হে আবু আবদুর রহমান) বলে ভিতরে প্রবেশ করল। তিনি সালামের উত্তর না দিয়ে বললেন, صدق الله و رسوله "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন" এ বলে তিনি গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর এ অভূতপূর্ব আচরণে আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম, কিন্তু তিনি ভিতরে চলে যাওয়ায় কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলামনা। পরে যখন তিনি বাইরে আসলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি আগন্তুকের সালামের যে জবাব দিলেন তাতো আমাদের বোধগম্য হল না। তিনি উত্তরে বললেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, নির্দ্ধারিত ভাবে কাউকে সম্বোধন করে সালাম দেওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি ও তাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ, নিকট জনদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সত্য গোপন করা কিয়ামতেরই আলামত।[৩]

---

১. বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩০ পৃষ্ঠা।
২. মুসনাদে আহমদ ১ম খণ্ড ৩৭৭ পৃষ্ঠা।
৩. আল আদাবুল মুফরাদ কৃত ইমাম বুখারী।

তাঁর মজলিসে যদিও সর্বদা লোকের আনাগোনা লেগেই থাকত কিন্তু তবুও সূর্যোদয়ের পরের সময়টি মাসআলা মাসায়েলের জবাব দানের জন্য নির্ধারিত ছিল। আবু ওয়ায়েল বলেন যে, আমরা ফজরের নামাযান্তে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে আমরা তাঁকে তাসবীহ তাহলীলে মশগুল পেয়ে ছিলাম। সূর্যোদয়ের পর এক ব্যক্তি বলল যে, আমি আজ রাতে কুরআন করীমের শেষ মঞ্জিল সম্পূর্ণ পাঠ করেছি। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) একথা শুনে বললেন যে, হাঁ, তবে কবিতাবৃত্তির ন্যায় তাড়াহুড়া করে তিলাওয়াত করেছ নিশ্চয়ই। অতঃপর তিনি বললেন যে, আমরা রাসূলে পাক (সাঃ)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করেছি। তিনি নামাযে যেভাবে দু'দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন তা আজো আমার স্মরণ আছে। তিনি "মুফাচ্ছল" এর দশ সূরা এবং হা-মীম এর দু'টি সূরা পাঠ করতেন।[১]

একদা হযরত আবু মূসা আশ'আরীর সমীপে ফারায়েয সম্পর্কীয় একটা মাসআলা উপস্থাপিত হল যে, এক ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান ও তার এক বোন এবং একটি নাতনী রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। এখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরায়ের মাঝে কিভাবে বণ্টন করা হবে। হযরত আবু মূসা জবাব দিলেন যে, কন্যা ও বোন মিলে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে এবং নাতনী কিছুই পাবেনা। সে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। সাথে সাথে তিনি এ কথারও তাকিদ দিলেন যে, মাসআলাটি যেন হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট জেনে নেয়া হয়। প্রশ্নকর্তা হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর জবাবসহ মাস-আলাটি হযরত ইবনে মাসউদের সমীপে পেশ করল। প্রশ্ন ও জবাব উভয় শ্রবণ করার পর তিনি বললেন যে, হযরত আবু মূসার এ সমাধান যদি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ মুতাবিক হয়ে থাকে তবে আমি একেই প্রাধান্য দিব। অন্যথায় আমি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত নই। অতঃপর তিনি ফতোয়া দিলেন যে, মৃত ব্যক্তির কন্যা অর্ধেক সম্পত্তি পাবে কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য নাতনী ও এক ষষ্ঠমাংশের অধিকারিনী হবে।[২] বলা বাহুল্য, গোটা বিশ্ব মুসলিম আজ ইবনে মাসউদ (রা) এর ফতোয়ার উপরই আমল করে থাকে।

---

১. তিরমিযী ও বুখারী।

২. মুসনাদে আহমদ, বুখারী ২য় খণ্ড ৯৯৭ পৃষ্ঠা।

একবার হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি ভুল ক্রমে কারো গলে স্ত্রীর দুগ্ধ প্রবেশ করে তবে সে স্ত্রী তার উপর হারাম হবে কিনা? হযরত আবু মূসা (রাঃ) জবাব দিলেন যে, হাঁ সে স্ত্রী-তার জন্য অবৈধ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন। জবাব শুনে তিনি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন যে, আপনি কিভাবে এ ফতোয়া দিলেন? রিযায়াত বা দুগ্ধ পানের সময় সীমা তো দু'বছর আর উল্লিখিত অবস্থা যখন রিযায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় তখন সে স্ত্রী অবৈধ হবে কি করে? হযরত আবু মূসা (রাঃ) স্বীয় ভ্রান্তি অনুধাবন করতে পারলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিশুদ্ধ হওয়ায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর প্রশ্ন কর্তাকে বললেন, দেখ, যত দিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এই দিকপাল বর্তমান থাকবেন ততদিন আমাদের কারুর কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করবেনা।

শিরক ও বিদআত নিরূপণে তাঁর বিচক্ষণতা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ইলমী দক্ষতার এক বিশেষ দিক হল যে, বিদআতের তাৎপর্য ও তার অনিষ্ট তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অতি কঠোরতার সাথে মানুষকে বিদআতে লিপ্ত হতে বারণ করতেন। বিদাআতের বিরুদ্ধাচারণে তাঁর স্থান সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বাগ্রে। বিদআতের অনিষ্ট প্রচারে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুন্নতকে আকড়ে ধরা ও বিদআত থেকে দূরে থাকা সম্পর্কে মিশকাত শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১. যে সব বিষয়ের উপর আমাদের ধারণা হল যে, এগুলো করলে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন, এগুলো পালন করলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তোষ অর্জন হতে পারব; আমাদের মর্তবা বুলন্দ হবে অথবা এসব বিষয় পালন করলে আমাদের সন্তান সন্ততিদের কল্যাণ হবে অথবা এ আমলের বরকতে আমাদের বিপদাপদ দূর হবে এ সমূহ বিষয় দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি শরিয়ত দ্বারা তা সঠিকভাবে প্রমাণিত না হয় অথবা সাহাবায়ে কিরাম-এর উপর আমল না করেন, তবে এর উপর উপরোক্ত বিশ্বাস স্থাপন বিদআত বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে কোন জায়েয বিষয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমল করা যদি শরীয়ত সম্মত হয়ে থাকে, তবে তাকে কোন বিশেষ পদ্ধতির উপর সীমাবদ্ধ করতঃ তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া ও বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হাঁ তবে এ বিশেষ পদ্ধতিকে সহজতর বলে স্বীয় আমলের জন্য নির্ধারিত করা হলে, তা বিদআত হবে না। এমনিভাবে পার্থিব বিষয়াদি যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়ত বিরুদ্ধ না হয় তবে তা যে ভাবেই আমল করা হোক (যদি তা কোন জাতির বৈশিষ্ট্য বা ইঙ্গিতবহ না হয়) তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

عن عبد الله ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه و شماله و قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه و قرأ و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل -

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে একটা সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তার ডান ও বাম দিকে কতকগুলো আঁকা-বাঁকা রেখা টেনে বললেন যে, এই সরল রেখাটিই হল ইসলাম এবং ডান-বামের প্রতিটি রেখার মুখোমুখি শয়তান ওঁৎ পেতে আছে। তারা মানুষকে অনবরত সে দিকে ডাকছে। এরপর তিনি পাঠ করে শুনালেন "যে এ-ই হল সরল-সঠিক পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর আর বিভিন্ন পথের অনুসারী হবেনা।[১]

ইসলাম তো সেই ধর্মের নাম, যার মৌল কথাই হল মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপাস্য ও প্রয়োজন সমাধাকারী হিসেবে গণ্য করবেনা। কোন প্রকার অংশীদারিত্ব ব্যতিরেকে সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই আরাধনা করবে-অর্থাৎ সে হবে খাঁটি তওহীদী। কালিমা তায়্যিবার প্রথম অংশে সে একথারই স্বীকৃতি দেয়। এর দ্বিতীয় অংশে স্বীকৃতি দেয় যে, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সে আল্লাহ তা'আলার রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে মান্য করে। জীবন যাত্রার যে পদ্ধতিকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন তার শিক্ষাদাতা এ আখেরী যমানায় একমাত্র সায়্যিদিনা মুহাম্মদ (সাঃ)। তাই সে তাঁর প্রদর্শিত জীবন বিধান ব্যতীত অন্য সব বিধানকে অস্বীকার করে। পূর্ববর্তী নবীগণও স্ব-স্ব উম্মতদিগকে এ শিক্ষাই দিতেন। কিন্তু আমাদের সম্মুখে তাদের ইতিহাস বর্তমান রয়েছে যে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। হুযুর আকরাম (সাঃ) এ জন্যই এ দুই প্রকার (শিরক ও বিদআত) গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে বরাবর হুঁশিয়ার করেছেন। যাতে কোন মানুষ এর কোন্ একটির বশীভূত হয়ে জাহান্নামে পতিত না হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঈমানের অমূল্য দৌলত লাভ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর ও তিনি সে বুদ্ধিমত্তাকে সর্বদা সদব্যবহার করেছেন। স্বীয় ইলমও আমলের মাঝে

১. দারেমী, আহমদ।

সর্বদা পর্যবেক্ষণ চালাতেন। যাতে করে তা কোন প্রকার শিরক ও বিদ-আতের পাঁকে পঙ্কিল না হয়ে উঠে।

মৌলিকতা ও ফলাফলের প্রেক্ষিতে শিরকও বিদআতের সাদৃশ্য

কালিমায়ে তায়্যিবার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধিতে অবহেলা করলে এবং তার দাবী ও চাহিদার প্রতি সদা সতর্ক না থাকলে যে কোন সময় শিরকে লিপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর কালিমার দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মর্মার্থ সঠিক ভাবে উপলব্ধি না করলে বিদআত থেকে বেঁচে থাকা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ কালিমার প্রথম অংশকে অস্বীকার করার নাম শির্ক এবং দ্বিতীয় অংশের চাহিদা থেকে বে-পরোয়া ভাব পোষণ করা বিদআত। সুতরাং শিরক ও বিদআত উভয়ই একই মূলে গ্রথিত—সন্দেহ নেই। আর উভয়টি যেহেতু এক, সে হিসেবে এদুয়ের ফলাফলও যে অভিন্ন হবে তা প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য আর যেই হোক না কেন তাঁকে যদি চাহিদা পূরণকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয়, তবে তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে বিষয়টি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা'কে যদি দ্বীনের মর্যাদা দেওয়া হয় তা নিঃসন্দেহে বিদআত বলে গণ্য হবে। প্রতিটি মু'মিনই জানে যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য এবং রব নেই। মুশরিকরা গায়রুল্লাহ্'কেও প্রয়োজন সমাধানে কোন কোন ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বলে বিশ্বাস করে। মূলত উভয়ের মাঝে অজ্ঞানতাই হল প্রকৃত তফাৎ।

সুন্নতের অনুসারীগণ কেবল ঐসব বিষয়কেই ধর্মীয় মর্যাদা দেয় যে গুলো রাসূলে পাক (সাঃ) থেকে নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আর বিদআতীগণ ধর্ম বহির্ভূত বিষয়কেও ধর্মীয় মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এতদুভয়ের মাঝেও মূলত ইলমই হল প্রকৃত ফারাক। অতএব শিরক ও বিদআত উভয়টি অজ্ঞানতার ফসল—লা ইলমীর সন্তান।

চিন্তা করুন যে, বুদ্ধিমত্তা বিনে আসবাব ও উপকরণ পূর্ণ এই পৃথিবীতে বসে অন্তরে এ বিশ্বাসকে কিভাবে বদ্ধমূল করে তোলা সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সকল ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক। তিনি ব্যতীত আর কেউ আমাদের কোন্ প্রয়োজন্ সমাধা করতে পারে না এবং কোন কাজে

প্রতিবন্ধকতার ও সৃষ্টি করতে পারে না ? রাশি রাশি উপকরণের রঙিন পর্দা আমাদের দর্শনেন্দ্রীয়ের সম্মুখে সর্বদা উন্মুক্ত রয়েছে। এ সবকে ভেদ করে নফা-নোকছানের প্রকৃত নিয়ন্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, আসবাব থেকে বিশ্বাস হটিয়ে প্রকৃত মালিকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বৈ নয়।

শিরক বিদআত ও বিদআতের পঙ্কিল থেকে গাত্র বাঁচাতে মানুষকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। আসবাব ও উপকরণের মাধ্যমেই মানুষের পার্থিব প্রয়োজন সমাধা হয়। আর বাহ্যতঃ তা মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার থেকে বিমুখ করে রাখে। ফলে সে বস্তুকেই চাহিদা সম্পূরক মনে করে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের চাহিদা পূরণে আসবাবের কোন শক্তি নেই। এসব কেবল মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এসব মাধ্যম আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী মুতাবিকই নির্ধারিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলাই সব কিছুর কর্ম নিয়ন্তা। এতে আর কারুর কোন অংশীদারিত্ব নেই। কিন্তু মানুষ স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পূরণে গায়রুল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এ সবের কাছে স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রার্থনা করে কামনা ও যাচনা করে।

অন্য দিকে প্রকৃতিগতভাবে মানুষ পরকালীন চিরস্থায়ী শান্তিস্থল জান্নাতের প্রত্যাশী। এতদুদ্দেশ্যে সে সৎকর্মের বৃদ্ধি ঘটাতে চায়। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সবত্র হয়। কিন্তু শয়তানের ফুসলানী অনেক সময় তার এ প্রবৃত্তিসুলভ গুণাবলীতে বাঁধ সেদে বসে। ফলে মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। লালসা ও তাড়াহুড়ার বশবর্তী হয়ে সে কতগুলো কাজকে সৎ ও নেক হিসেবে নির্ধারণ করে নেয়। এ ব্যাপারে সে শরীয়তের মাপকাঠিকে কমই গুরুত্ব দেয় বরং স্বেচ্ছাচারিতা ও মন মানসই তার কর্ম বিচয়নের নিক্তি হয়ে দাঁড়ায়। স্বীয় মানসিকতা ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি মাফিক কাজই সৎ এবং এর প্রতিকূল সব কিছুই অসৎ বলে সে ফতোয়া জারী করে দেয়।

শিরক ও বিদআত এমনই ব্যাপকতর দু'টি গোমরাহী যে, ইসলাম গ্রহণের পরও এ দু'টিতে লিপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। রাসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل -

"পিপড়ার গতির চেয়েও অতি সংগোপনে তোমাদের ভেতর শির্ক ঢুকে পড়ে।"[১]

হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন :

هل الشرك الا من جعل مع الله الها اخر -

"আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কারুর অংশীদারিত্বে বিশ্বাস করাই কি শির্ক নয় ? ইরশাদ হল :

و الذى نفسى بيده للشرك اخفى من دبيب النمل -

"তুমি যে শির্কের কথা বলছ, তা তো সহজেই অনুভূত হয়। কিন্তু এমনও শির্ক রয়েছে যা পিপড়ার পদধ্বনির চেয়েও নিঃশব্দে প্রবেশ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে বিচক্ষণতা দান করেছেন সেই এগুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

এরপর মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রিয়তম সাহাবী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দিলেন। ইরশাদ করলেন, তুমি এ দু'আটি নিয়মিত পাঠ করবে :

اللهم انى اعوذبك ان اشرك بك و انا اعلم و استغفرك لما لا اعلم -

"ওগো আল্লাহ্! আমি জেনে শুনে শির্কে লিপ্ত হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আর আমি অজান্তে যে সব শির্কে লিপ্ত হই তা থেকেও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি"।

তুমি যদি নিয়মিত এ দু'আটি পাঠ কর তবে শির্কের সকল মুশকিল থেকে নাজাত পাবে।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিরক থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় কলুবের পর্যবেক্ষণ থেকে উদাসীন থাকা কারুর জন্যই বৈধ নয়। সে জন্য রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবরকে পর্যন্ত সচেতন করেছেন। রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন :

ان اخوف ما اخاف على امتى الشرك الاصغر -

"আমার উম্মতের জন্য সর্বাধিক ভীতিকর বিষয় হল ক্ষুদ্র শির্ক।"[২] একদিকে এই ভীতি প্রদর্শন, অন্যদিকে উম্মতকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দান করেন যে, আমার উম্মত শয়তানের প্ররোচনার শিকার হবে না, কেননা

১. আল আদাবুল মুফরাদ ৭১৭ নং হাদীস।

২. মুসনাদে আহমদ।

শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে মুসলমান তার আনুগত্য প্রদর্শন করবে।"[১]

চিন্তা করার বিষয় যে, তা কি প্রকার শিরক যা থেকে উম্মতকে এত সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে ?

আমরা মৌখিক ভাবে সর্বদা বলে থাকি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের মালিক ও রিযিকদাতা। তিনিই আমাদের সার্বিক চাহিদা পূরণ করেন। অথচ প্রায়শই আমরা দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে গায়রুল্লাহর কাছে আশা পূরণের যাচনা করে বসি। এ ধরনের আশা আকাঙ্ক্ষার ফলে আমরা অজ্ঞাতসারে শিরকে লিপ্ত হয়ে যাই। উদাহরণতঃ বলা যেতে পারে যে, পীর-মুর্শিদ সম্পর্কে আমাদের অনেকের বিশ্বাস হল যে, তারা যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন তবে বিভিন্ন দীনি বরকত লাভ করতে পারব। বৈষয়িক দিক থেকে আমাদের প্রাচুর্য আসবে। আর যদি নারাজ হয়ে যান তবে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের বিপুল ক্ষতি সাধন হবে। "অথচ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর দাবীই হল যে, মানুষ গায়রুল্লাহর থেকে কোন লাভের আশা করবে না এবং তাদের থেকে কোন প্রকার লোকসানেরও আশংকা করবে না। কিন্তু কোন মুসলমানকে যদি গায়রুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে সে ভ্রুকুঞ্চিত করে গায়রুল্লাহর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে আর ভক্তি গদগদ কণ্ঠে আল্লাহ্‌র উপর তার দৃঢ় আস্থার কথা জানিয়ে দেবে। তার মনের গোপন কথা একটুও প্রকাশ করবে না। ভুলেও তা মুখ থেকে উচ্চারণ করবে না। আমরা এখানে সেই জযবা ও প্রেরণার কথাই বলতে চাচ্ছি যা থেকে দীনদার শ্রেণীও সহজে রক্ষা পায় না। কুরআন করীমে এ ধরনের শিরকও পরিহার করে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

الا من اتا الله بقلب سليم -

"তবে যারা বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্‌র সমীপে হাযির হয়।

হাদীস শরীফে রিয়া বা বাহ্যাড়ম্বরকেও শিরকে আছগর বা ক্ষুদ্রতম শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা গায়রুল্লাহর সন্তোষ সাধনই তাতে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সাথে সাথে মু'মিনের কলবে যদি সঠিক উপলব্ধি থাকে এবং অন্তর কপটতা থেকে মুক্ত থাকে তবে নিঃসন্দেহে সে

১. মুসলিম।

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। দোযখ থেকে মুক্তি পেতে হলে একত্বের বিশ্বাসকে শির্কের সকল পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখা অপরিহার্য। এমনিভাবে পবিত্র কালামের দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মর্মার্থ হলো যে রাসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে যে পথের দিশা দিয়েছেন তা হল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ সাধন ও মুক্তি লাভের একমাত্র পথ। আমরা যখন কালিমা পাঠের মাধ্যমে এ কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছি তখন আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, আমরা কেবল সে গুলোকেই আল্লাহ্‌র কথা বলে মেনে নেব, যে গুলোকে রাসূলে পাক (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা কেবল সে গুলোকেই দীন হিসেবে গ্রহণ করব যে গুলোকে তিনি দীনের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। এর বাইরের কোন কিছুকে যদি আমরা দীনের মাঝে দাখিল করি তবে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। কালিমার দাবী অনুযায়ী সে গুলোকে বর্জন করে চলা আমাদের জন্য অপরিহার্য। অতএব সুন্নত ও বিদআতকে পরস্পর পৃথক ভাবে অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মুক্তি লাভের জন্য কালিমার উভয় অংশের স্বীকারোক্তি এবং তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। শির্কের মাধ্যমে মানুষ যে ভাবে দোযখের শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ভাবে সে যদি বিদআতে লিপ্ত হয় তবেও (কালিমার দ্বিতীয় অংশের নির্দেশ অমান্য করার ফলে) তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাওহীদের উপলব্ধি ত্রুটিপূর্ণ হলে যদি শির্কে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে তবে সুন্নতকে বিদআত থেকে পৃথকভাবে অনুধাবন করতে না পারা এ কথারই প্রমাণ করে যে, রিসালাতের সীমারেখা সম্পর্কে আমি নিতান্তই মূর্খ। আমার মস্তিষ্কে রিসালাতের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সঠিক মানদণ্ড নেই। ফলতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে এই পরামর্শ দেওয়া অপরিহার্য মনে করি যে, অমুক অমুক বিষয়গুলোকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন ছিল। 'নাউযুবিল্লাহ' বিদআতে অনুরক্ত ব্যক্তি যেন এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল স্বীয় রিসালাতের দায়িত্বকে পুংখানুপুংখ রূপে আদায় করেননি। দীনের সমূহ বিষয়কে বাতলিয়ে যাননি। অনেক কিছুই তিনি অসমাপ্ত রেখে গিয়েছেন। তাই সেগুলোকে সংযোজন করতঃ দীনের পূর্ণতা বিধান করা আমারই দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي -

"অদ্য আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম" বলে ঘোষণা দিয়েছেন সেখানে বিদআতীর কার্যকলাপকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যেতে পারে। শায়খ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী - اليوم اكملت لكم

"এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর দীনের সাথে নব সংযোজন দীনের অপূর্ণত্ব প্রমাণেরই নামান্তর।[১] যেমন যদি কেউ ইসলাম গ্রহণের পর যিকির ও ইবাদতের জন্য স্ব-কপোল কল্পিত পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং সে সবকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস করে যা সম্পর্কে শরীয়তের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই যদ্দ্বারা এইগুলোকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে – সে বিদআতেই লিপ্ত হচ্ছে সন্দেহ নেই। কেননা কোন কিছুকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য দলীল থাকা আবশ্যক।

সদুদ্দেশ্যে কোন কাজ করলে তাকে ইজতিহাদগত ভুল বলা যেতে পারে। সেগুলোকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্তি করণ নেহায়েতই অন্যায়। এমনিভাবে কতগুলো কাজকে কেবল এজন্য নির্ধারণ করে নেয়া যে এর উপর আমল করলে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—অথচ এ সম্পর্কে তার কাছে কোন নির্ভুল সনদ নেই যে, এ দ্বারা আল্লাহ্‌র নারাজী থেকে রক্ষা পাওয়া যায়—ইহা বিদআত নয় ত কি? শরীয়তের প্রমাণ ব্যতীত কেবল কারুর উপর নির্ভর করে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোন আমল করা হলে তাকে বিদআত থেকে স্বতন্ত্র করে ভাববার কোন উপায় নেই। কালিমার কোন অংশের উপলব্ধিতে ভুল করলে বা তার দাবীর অন্যথা করলে মানুষ জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন:

احسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم و شر الامور محدثاتها -

রাসূলে করীম (সাঃ) প্রদর্শিত পথই শ্রেষ্ঠতম হিদায়াত আর বিদআতই হল নিকৃষ্টতর বিষয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন:

اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم -

---

১ ফতুহাতে মাক্কিয়াহ—তৃতীয় খণ্ড-৬১৩ পৃষ্ঠা।

"তোমরা রাসূলে আকদাস (সাঃ)-এর অনুসরণ কর, বিদআতে লিপ্ত হয়ো না; কেননা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত দ্বীন তোমাদের জন্য যথেষ্ট। অন্যত্র তিনি বলেন:

عن ابی قلابة قال قال عبد الله ابن مسعود و ایاکم و التنطع والتعمق و البدع و علیکم بالعتیق -

"খবরদার তোমরা বাড়াবাড়ি করোনা, বেশী গভীরে পৌঁছার চেষ্টা করোনা। বিদআত থেকে বেঁচে থাক। আর যা প্রাচীন (অর্থাৎ যা কিছু মহানবী (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর কাল থেকে চলে আসছে) তার উপর অবিচল থাক।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন:

فعلیکم بالعلم و ایاکم و البدع و ایاکم و التنطع و ایاکم والتعمق و علیکم بالعتیق -

"তোমরা কুরআন ও সুন্নাহ'র ইলমে অভিনিবিষ্ট হও, সাবধান বিদআতে লিপ্ত হয়ো না। অনর্থক আতিশয্যের পেছনে পড়োনা। হ্যাঁ খবরদার অযথা গভীরে পৌঁছবার চেষ্টা করবেনা, প্রাচীনত্বকে আঁকড়ে ধর।[২]

তাঁর প্রসিদ্ধ শিষ্য হযরত আ'মাশ বর্ণনা করেন:

قال عبد الله ایها الناس انکم ستحدثون و یحدث لکم فاذا رأیتم محدثة فعلیکم بالامر الاول -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, জনমণ্ডলী। তোমরা অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুনত্বের সম্মুখীন হবে। অন্যরা তোমাদেরকে নতুন নতুন কথা শুনাবে। শোন, তোমরা যখন এ ধরনের আধুনিকতার মুখোমুখী হবে তখন প্রাচীনকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।[৩] মুসনাদে দারেমীতে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে অমূল্য বাণী প্রণিধিত হয়েছে:

عن عبد الله قال القصد فی السنة خیر من الا جتهاد فی البدعة -

"স্বাভাবিকভাবে সুন্নতের উপর আমল করা বিদআতের উপর কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

১. দারেমী ৩৪ পৃষ্ঠা
২. ঐ
৩. ঐ

তাঁর জীবনের সকল কার্যকলাপ ও সমূহ পদচারণা প্রমাণ করে যে, শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীনভাবে লড়ে যেতেন। যেসব বিষয়ে শিরক ও বিদআতের ঈষৎ গন্ধও অনুভূত হত তা থেকে তিনি নিজেও বিরত থাকতেন এবং সাথে সাথে অন্যকে সে সবের নিকটও যেতে বারণ করতেন। একদিন তিনি স্বীয় স্ত্রীর গলায় একটা সুতা ঝুলানো দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গলায় এসব কি? তিনি উত্তর দিলেন যে, অমুক রোগের মুষ্টিযোগ হিসেবে এটা ব্যবহার করেছি। একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাগ করে সে সূতিকাটি ধরে টান দিলেন, ফলে তা ছিঁড়ে গেল। তিনি এত কষিয়ে টান দিয়েছিলেন যে, সুতোটি না ছিড়লে তাঁর স্ত্রী মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেন।[১] হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যোগমন্ত্র শিরকের অন্তর্ভুক্ত। স্বভাব সিদ্ধ বিষয়কে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞাত বিষয়াদিকে কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোন কিছুর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা চরম মূর্খতা। মানুষ কেবল সে সব মাধ্যমকেই গ্রহণ করতে পারে যা স্বভাব সিদ্ধ বা শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। এর বহির্ভূত কোন কিছুকে সহায়ক বলে বিশ্বাস করলে গায়েবী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার শামিল হবে এবং অদৃশ্য সহায়কের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সমার্থক হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে গায়েবী সহায়ক হিসেবে মান্য করা শিরক বৈ নয়।

---

১. ধর্মীয় চেতনাবোধে দৃঢ় ছিলেন বলেই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীর সাথে এরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন। নতুবা চারিত্রিকভাবে তাঁর কোমল প্রাণ ও মমত্ববোধের কথা সর্বজন বিদিত ছিল। তাওহীদ ও শিরকের বৈপরিত্যের মত বিদআতকেও তিনি সুন্নতের সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক বলে বিশ্বাস করতেন। শিরক যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অস্বীকৃতি বলে বিবেচিত হয়, তাহলে বিদআত ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দাবীর সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) বলেন, শিরক ও বিদআত দ্বারা নুবুওত উৎক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই আহ্কামের অস্থিই উভয়ের শেষ পরিণাম। মুসনাদে আহমদে হযরত গদীফ বিন হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فالتمسك بالسنة خير من احداث بدعة কোন কওম যদি বিদআতের প্রবর্তন করে তবে তাদের থেকে প্রবর্তিত বিদআতের সমপরিমাণ সুন্নতকে তুলে নেয়া হয়। মুসনাদের দারেমীতে হযরত হাসসান থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها الى يوم القيامة কোন কওম তাদের ধর্মে নতুন কোন বিষয়ের সংযোজন করলে ফলতঃ তাদের থেকে সে পরিমাণ সুন্নতকে উঠিয়ে নেয়া হয় আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে তা ফিরিয়ে দেয়া হয় না। —মিশকাত

সুন্নত বর্জন করাকে তিনি দুঃসাহসিক অপরাধ বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন "আযানের মাধ্যমে তোমাদেরকে যেসব নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আহবান করা হয়, সেগুলোকে তোমরা নিয়মিতভাবে মসজিদেই আদায় করবে। মনে রাখবে, জামাআতে নামায সম্পন্ন করা হিদায়াতভুক্ত আমল। রাসূলে পাক (সাঃ) তোমাদেরকে যে সব বিষয়ের হিদায়াত দিয়েছেন তাই তোমাদের শরীয়ত। যারা জামাআতে নামায আদায় করে না রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ তাদেরকে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। তাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলেও দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতে হাযির হতেন। তোমাদের সকলের বাড়ীতেই নামায আদায় করবার মত স্থান আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা যদি মসজিদে হাযির না হয়ে স্ব-স্ব বাড়ীতে নামায সম্পন্ন করে নাও তবে মনে রাখবে যে, এ দ্বারা তোমরা তোমাদের নবীর তরীকাকেই বর্জন করলে। আর তোমরা যদি স্বীয় নবীর পথকেই পরিত্যাগ করলে তবে তোমরা মুসলমান রইলে কোথায়? তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে গেলে।[১]

اخبر رجل عبد الله بن مسعود ان قوما يجلسون فى المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبروا الله كذا سبحوا الله كذا و حمدوا الله كذا وكذا قال عبد الله فاذا رأيتهم فعلوا ذالك فاتنى و اخبرنى بمجلسهم فاتاهم فجلس فلما سمع ما يقولون قام و كان رجلا حديدا فقال انا عبد الله بن مسعود و الله الذى لا اله غيره لقد جئتم ببدعة ظلماء و لقد فضلتم اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فقال عمرو ابن عتبة استغفر الله فقال عليكم بالطريق فالزموه و لئن اخذتم يمينا و شمالا لتضلن ضلالا بعيدا ۔

আবুল বুহতারী থেকে বর্ণিত হয়েছে "এক ব্যক্তি এসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে সংবাদ দিল যে, কতগুলো লোক মাগরিবের নামাযান্তে মসজিদে সমবেত হয়। আর তাদের মধ্যে একব্যক্তি সকলকে উপদেশ দেয় যে, এতবার আল্লাহু আকবার, এতবার সুবহানাল্লাহ এবং এত-বার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ কর। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সংবাদদাতাকে বললেন যে, এরপর যখন তাদেরকে সমবেত হয়ে অনুরূপ করতে দেখবে

---

১. আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১১৬ পৃঃ।

আমাকে জানিও। অনন্তর সে ব্যক্তি এসে একবার হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে তাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করল। তিনি উঠে গিয়ে তাদের সাথে উপবেশন করলেন। যখন তাদেরকে এভাবে যিকির করতে দেখলেন দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, হে লোকসকল ! আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার কোন দোসরা নেই, তোমরা যা করছ তা বিদআতের জুলমাত বৈ নয়। তোমরা কি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবী-দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে ? (তারা তো এ পদ্ধতিতে কখনও যিকির করতেন না অথচ তাদের চেয়ে তোমরা অধিক ইলমের অধিকারী নও) একথা শুনে আমর বিন উত্বা বললেন, তওবা তওবা আমরা কি করে সাহাবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারি ? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন বললেন, তাই যদি হয় তবে যিকির সম্পর্কে রাসূলে পাক (সাঃ) থেকে যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ রয়েছে তা-ই অবলম্বন কর। তা থেকে যদি তোমরা সামান্য ডানে-বামে সট্‌কে পড় তবে তোমাদের গোমরাহী অনিবার্য। যা তোমাদেরকে সুদূর ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

اخبرنا الحكم ابن المبارك انا عمر ابن يحيى قال سمعت ابى يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبد الله ابن مسعود قبل صلاة الغداة فاذا خرج مشينا معه الى المسجد فجاءنا ابو موسى الاشعرى فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا اليه جميعا فقال له ابوموسى يا ابا عبد الرحمن انى رايت فى المسجد آنفا امرا انكرته و لم ار و الحمد لله الا خيرا فقال فما هو فقال ان عشت فتراه قال رايت فى المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة فى كل حلقة رجل و فى ايديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة و يقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظر امرك قال افلا امرتهم ان يعدو سيئاتهم و ضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى و مضينا معه حتى اتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذى اراكم تصنعون قالوا يا ابا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير و التهليل و التسبيح قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شئى و يحكم يا امة محمد سيئا ما اسرع هلكتكم—

هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون و هذه ثيابه لم تبل و آنيتهم لم تكسر و الذى نفسى بيده انكم لعلى ملة هى اهدى من ملة محمد او مفتتحوا باب ضلالة قالوا و الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال و كم من مريد للخير لن يصيبه -

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস দারেমী (রঃ) বর্ণনা করেন : রাবী বলেন যে, আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর দরজায় তাঁর বহিরাগমনের জন্য অপেক্ষমান থাকতাম। তিনি বের হলে তাঁর সাথে একত্রে মসজিদে যেতাম। একদিন হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) এসে উপ-বিষ্ট সকলকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ইবনে মাসউদ বের হয়েছেন কিনা? আমরা বললাম না, তিনি এখনো বের হননি। উত্তর শুনে তিনি ও আমাদের সাথে আসন নিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বের হয়ে আসলে আমরা উঠে পড়লাম। হযরত আবু মুসা (রাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু আব্দির রহমান! সামান্য পূর্বে আমি মসজিদে একটা নতুন বিষয় দেখতে পেলাম। তবে বিদআত বলে মনে হওয়ায় বিষয়টি আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু আল্লাহর কসম এছাড়া তাতে অন্য কোন খারাবী পাইনি বরং ভাল বলেই মনে হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, বিষয়টি কি? খুলেই বলুন। তিনি উত্তরে বল-লেন যে, বেঁচে থাকলে আপনিও দেখতে পাবেন। মসজিদে আমি এক-দল লোককে চক্রাকারে বসা দেখেছি। তারা নামাযের অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে কিছু কংকর। প্রতি হালকায় একজন লোক অন্য-দেরকে বলছে যে, একশ' বার আল্লাহু আকবার পড়। তারা সকলে একশ' বার আল্লাহু আকবার পাঠ করে নেয়। অতঃপর সে ব্যক্তি একশ' বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে বললে তারা তা ই করে। সবশেষে লোকটি তাদেরকে একশ' বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে বলেন এবং তারা তার কথানুসারে একশ' বার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি তাদেরকে কি বলেছেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি আপনার মতামতের অপেক্ষায় তাদেরকে কিছুই বলিনি। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন যে, আপনি যদি তাদেরকে বলে আসতেন যে, তোমরা তোমাদের এ অপকর্মের গুনাহগুলো গণনা করতে থাক। আর তাদের নেক কর্ম যাতে বিনষ্ট না হয় তজ্জন্য আমি যামিন হলাম। এই

থলে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) মসজিদের দিকে চললেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সাথে চললাম। মসজিদে গিয়ে তিনি একটি হালকার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা এসব কি করছ? তারা উত্তর দিল যে, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা এই কংকর দিয়ে গুণে গুণে যিকির আযকার করছি। একথা শুনে তিনি জোরালো কণ্ঠে বললেন, এর সাথে সাথে তোমরা এ সবের পাপগুলোও গণনা করতে থাক আর তোমার পূর্ববর্তী পুণ্যসমূহ যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য আমি যামিন হলাম। ওহে উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ)! তোমাদের অবস্থা অশুভ হোক। তোমরা এত দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেলে? অথচ রাসূলে পাক (সাঃ)-এর অগণিত সাহাবী এখনো তোমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছেন। তাদের পরিহিত বস্ত্র এই যে এখনো জীর্ণ হয়নি এবং তাদের তৈজস পত্রও ভেঙে যায়নি! ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার মুঠোয় আমার এ প্রাণ হয়ত তোমাদের ইবাদতের এ পদ্ধতি রাসূলে আকরাম (সাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতির চেয়ে উৎকৃষ্টতর নতুবা এর মাধ্যমে তোমরা গোমরাহী ও বিভ্রান্তির দুয়ার খুলে দিচ্ছ। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা সৎ নিয়তেই এসব করছি। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, অনেকেই সদুদ্দেশ্যে বহু কাজ করে থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তার পরিণাম শুভ না হয়ে অশুভই হয়ে থাকে।[১]

চিন্তা করে দেখুন যে, এ লোকগুলো মদের আসর বা অন্য কোন নিকৃষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট ছিল না। বরং আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের উদ্দেশ্যেই তারা একত্র হয়েছিল এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে যিকিরেই মশগুল পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের যিকিরের এই নবতর পদ্ধতি যেহেতু রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত ছিল না তাই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কঠোর ভাবে এর প্রতিবাদ করেন। এ ছিল তাঁর দূরদর্শিতা ও জ্ঞান গরিমার প্রসূত সচেতনতা যা তাকে ইবাদত রূপী এ বিদআতের প্রতিরোধে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। আদৌ এটা রুক্ষ মেজাজ ও চারিত্রিক কঠোরতা প্রসূত বাড়াবাড়ি ছিল না। সমকালীন মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রাণ ছিল মমতায় ভরপুর। সেখানে গোস্বা ও কঠোরতার আদৌ কোন স্থান ছিল না। হযরত শাহ

১. দারেমী ৩৮ পৃষ্ঠা

ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) উল্লেখ করেন যে, "একদিন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মজলিসে কয়েকজন শিষ্যকে অনুপস্থিত পেলেন। পরে সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে, তাদের কাপড় অপরিস্কার ছিল তাই সংকোচ বশতঃ তারা মজলিসে হাযির হয়নি। এ সংবাদ শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠে। ফলে পালাক্রমে কয়েক দিন তিনি অতি সাদামাটা পোশাকে মজলিসে উপস্থিত হন এবং তাতে তিনি কোন প্রকার লজ্জাবোধ করতেন না।" এমন মহানুভব চরিত্রের লোক যদি দীনের ব্যাপারে কোন কঠোরতা অবলম্বন করেন তবে সন্দেহ নেই যে, এ তাঁর ধর্মীয় স্থিতিশীলতা ও সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ।

ইবনে জিরায়াহ বর্ণনা করেন :

عن عمر بن زرارة قال وقف على عبد الله يعنى ابن مسعود و انا اقص فقال يا عمر لقد ابتدعت بدعة ضلالة و انك لا هدى من محمد و اصحابه فلقد رأيتهم تفرقوا عنى حتى رأيت مكانى ما فيه احد ـ

"আমি একদিন শিক্ষামূলক কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করতেছিলাম, এমনি মুহূর্তে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এসে আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে উমর! তুমি ত গুমরাহীর বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছ" তুমি কি সাহাবীদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন পথের সন্ধান পেয়ে গেলে? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর এ কথা শ্রবণান্তে আমি চার পার্শ্বে তাকিয়ে দেখি যে মজলিস ছেড়ে সকলেই চলে গেছে। আমি একাকীই সেখানে বসে আছি।[১]

তাঁর বক্তৃতা ও বাণী সম্পর্কে কিছু কথা

প্রতিটি মাযহাবই মানুষের পরকাল সম্পর্কে সজাগ সতর্ক করেছে, পরকালের উপর ঈমান আনয়নের ডাক দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম মানুষকে কেবল পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তা মানব জাতির সম্মুখে পরকালের একটা পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছে এবং জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসূচী পেশ করেছে আর তার অনুসরণকে অত্যাবশ্যক ও ফরয করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ পার্থিব জীবন পরিচালনার যে সব ভ্রান্তির কবলে পতিত হয়ে

১. আত্তারগীব ৪২ পৃষ্ঠা।

পরকালীন জীবনের বিনাশ ঘটিয়েছে ইসলাম তার প্রীতিটির উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে মানুষকে হুঁশিয়ার করেছে।

ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা মানুষকে আত্ম প্রসাদে মেতে উঠতে দেয়না, সে শিক্ষায় যত্রতত্র কামনা বাসনার কোন স্থান নেই। ইসলামী শিক্ষার উপর যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাস রাখে তার মাঝে পরকালীন আশা আকাংক্ষা প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সন্দেহ নেই কিন্তু এর ফলে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে লাগামহীন জীবন স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় না। ইসলামী হিদায়াতের উপর স্থিতিশীল হলে মানব জীবন কেবল পাশবিক ক্লেদ থেকে পবিত্রই থাকে না উপরন্তু সে জীবন ফিৎনা ও বিসংবাদ মুক্ত হয়ে কল্যাণ ও সফলতায় পূর্ণ হয়ে উঠে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলামী বিশুদ্ধতম শিক্ষার কত বড় দিকপাল পন্ডিত ছিলেন। পর জীবনের উপর তাঁর বিশ্বাস কত দৃঢ় ও অটল ছিল এবং ইসলামী শিক্ষা ও পরকালের বিশ্বাসকে অন্যদের মাঝে সম্প্রসারণ করার পেছনে তিনি কতটুকু পরিশ্রম ও মেহনত করেছেন তা যে ভাবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ও অসংখ্য ছাত্রদের কর্মময় জীবনের পদে পদে স্বাক্ষরিত হয়ে উঠেছে; তেমনি ভাবে তাঁর বক্তৃতামালা ও অজস্র বাণীর ভেতরও তা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিভিন্ন খুতবা পাঠ করে দেখুন, এতে তার জ্ঞানগত গভীরতা ও উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা এবং বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে আপনি অভিভূত হয়ে পড়বেন। তাঁর মন-মস্তিষ্কে অহরহ যে চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা ঢেউ খেলে ফিরত তা তদীয় জীবন সাধনা বিশেষতঃ শিক্ষা দানের নিমিত্ত অসংখ্য বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে উঠে। তবে বক্তৃতার ভেতর পরকালীন কামিয়াবী লাভের বাসনা মূর্ত হয়ে উঠে। আর এই পরকালীন উৎকর্ষতা সাধনের জন্যই তিনি পার্থিব রংচটা ও চিত্তাকর্ষক আহবান ও হাতছানী উন্নত মানসিকতা ও বেনিয়াজীর সাথে পরিহার করে চলতেন। বস্তু জাগতিক সফলতা ও দুনিয়ার উচ্চ ও লোভনীয় পদকে পরিত্যাগ করতে তিনি আদৌ দ্বিধাবোধ করতেন না। বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই প্রভাব ছিল যে, তিনি বিভিন্ন সময়ে স্বীয় বক্তৃতার মাঝে পরকালীন ভয়-ভাবনায় প্রকম্পিত হয়ে উঠতেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ফিকহী মতামত, প্রখর ধী শক্তি ও বিস্ময়কর প্রতিভার উল্লেখের সাথে সাথে তাঁর তাকওয়া পরহিযগারী ও জাগতিক বিলাস বিমুখীতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন

এবং এ নিয়ে তিনি "যুহদিয়্যাত" বা "একনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণতা" নামে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। আমরা বিভিন্ন কিতাব থেকে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তৃতামালা ও বাণী সংগ্রহ করতঃ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) কর্তৃক প্রণিধিত অধ্যায়ের সাথে সংযোজন করে আমাদের এ বইয়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তৃতা খুবই সংক্ষিপ্ত হত অথচ তাঁর মর্মার্থ হত খুবই ব্যাপক। সন্দেহ নেই যে এ তাঁর সাহিত্যালংকার ও বাগ-বৈদগ্ধেরই প্রমাণ বহন করে। মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও ভাল-বাসা জাগ্রত করবার জন্য তিনি অত্যন্ত মমতাসিক্ত কণ্ঠে ভাষণ দান করতেন। মানুষকে তিনি আল্লাহ তা'আলার রহমতের আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত করে তুলতেন। তাই তাঁর বক্তৃতা পাঠে মানুষের মনে আল্লাহ'র রহমত লাভের প্রেরণা জেগে ওঠে। যে সব কাজে মানুষের আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা থেকে বিরত থাকবার জন্য তিনি ব্যথা মথিত ভাষায় নসীহত করতেন। যার ফলে শ্রোতাদের আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে এবং দোযখ থেকে মুক্তি লাভের আশায় সার্বিক অপকৃষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ় সংকল্প হত।

তিনি স্বীয় বক্তৃতার জন্য ঐসব বিষয় বেছে নিতেন যে গুলো মানুষের জীবন যাত্রায় সমূহ প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। বক্তৃতার ঠাট বজায় রাখবার জন্য ভাষার লালিত্যের পেছনে পড়তেন না আদৌ। শ্রোতাদেরকে অনুরক্ত করবার জন্য তিনি ভাষার মার প্যাচ দিয়ে বাগ্মিতার যাদু প্রদর্শন করতেন না। বরং সরল সাবলীল ভাষায় তিনি স্বীয় হৃদয়ের ব্যথা তুলে ধর-তেন, যাতে শ্রোতাবৃন্দ নিজেদের ধর্মীয় ভাষার সমুৎসুক হয়ে সত্য বরণ করে নেয় ও না হককে বর্জন করে চলে। তাঁর বক্তৃতার সম্মোহনে মানুষের হৃদয় বিমূঢ় হয়ে উঠত। হিদায়াতের আনুকূল্য তিনি যেসব উপমা পেশ করতেন সে গুলো সত্যানুরাগী পথিকের অমূল্য সম্পদ—যার সংখ্যা অসংখ্য। তাঁর সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা ছিল অস্বাভাবিক হৃদয়গ্রাহী। তাঁর সুমধুর বোল ও পরিচ্ছন্ন শব্দগুচ্ছের সুচিন্তিত অভিব্যক্তিতে হৃদয় সম্মোহিত হত। মনের গহণ দেশে প্রভাব বিস্তার করত তাঁর ভাষা। তাঁর বক্তৃতামালা পড়ে দেখুন. সে-কি আকর্ষণ তাতে। শৌর্য ও মাধুর্যের সে কি অপূর্ব সমাবেশ। আশ্চর্যের কথা হল যে, এসব বক্তৃতার কোন একটি বাক্য অলংকার বিহীন নয়। উজ্জ্বল

ও অবসাদের সংমিশ্রণে ভাষার ঝংকার হারিয়ে যায়নি কোথাও। অনন্য তাঁর প্রমাণ পদ্ধতি। অনুপম তাঁর প্রকাশভঙ্গী। কোথাও কোথাও হিদায়াতের গুরুত্ব উপস্থাপনের জন্য কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এদ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি সহজ ও কঠিন উভয় প্রকার ভাষায় বক্তৃতা দানে পারদর্শী ছিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, ভাষাগত এ কাঠিন্য শ্রোতাদের পক্ষে নসীহত অনুধাবনে অন্তরায় সৃষ্টি করত না। অনেক দুরূহ শব্দকেও তিনি এমন নৈপুণ্যের সাথে বিন্যস্ত করেছেন যে অর্থগত দৈত্য ও বাচনের জড়তা কাটিয়ে শ্রবণেন্দ্রীয়ের জন্য তা মধুময় হয়ে উঠেছে। তাঁর বক্তৃতায় ছন্দবদ্ধ বাক্য অনুপস্থিত। কিন্তু কদাচিত যে সব মিত্রাক্ষর বা কাব্যিক ছন্দ পরিলক্ষিত হয় তাতে বক্তৃতার আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। বচন আরো মাধুর্য-পূর্ণ হয়েছে। ঈষৎ মিলের এসব গদ্য ছন্দকে রেশম খচিত পশমী শালের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ভাষার কমনীয়তা বিচিত্র বর্ণের গ্রন্থিম রেশম-গুচ্ছের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঠক মাত্রই তাঁর বক্তৃতা ও ভাষার মান নির্ণয়ে সক্ষম হবে।

এ বই এর পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর ফতোয়া ও মাসআলা-মাসায়েল সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সে সব ফতোয়া ও মাসআলা যদিও মানুষের জীবনের আমল ও বিশ্বাসে উভয় প্রান্তের সাথে সম্পৃক্ত তবুও আপনার মন-মানসিকতার আহার্য ও কলবের দর্পণ হিসাবে তাঁর বক্তৃতা ও বাণী-সম্বলিত এ অধ্যায়টি সংযুক্ত করে দিলাম।

بهار عالم حسنش دل و جان تازه می شود - به رنگ اصحاب صورت
رابه اور رب معنی را -

ان اصدق الحديث كتاب الله -

১. আল্লাহ্‌র কিতাবই সত্য-শ্রেষ্ঠ বাণী।

و اوثق العرى كلمة التقوى -

২. তাকওয়াই হল দৃঢ়তর রজ্জু।

و خير الملل ملة ابراهيم -

৩. হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতই সর্বোত্তম মিল্লাত।

و احسن السنن سنة محمد صلى الله عليه و سلم -

৪. মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

و خير الهدى هدى الانبياء -

৫. সে পথই উৎকৃষ্টতর যে পথের দিশা আম্বিয়া (আঃ) গণ দিয়েছেন।

و اشرف الحديث ذكر الله -

৬. আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরই [১] মহত্তর কথা।

و خير القصص هذا القرآن -

৭। আল-কুরআনই শ্রেষ্ঠতর কাহিনী।

خير الامور عواقبها -

৮. শ্রেষ্ঠতম কাজ ফলাফলের প্রেক্ষিতেই [২] নিরূপিত হয়।

و شر الامور محدثاتها -

৯. বিদআতই নিকৃষ্টতর কর্ম।

ما قل و كفى خير مما كثر و الهى -

১০. যা স্বল্প অথচ যথেষ্ট তা ঐ আধিক্যের চেয়ে শ্রেয় যা গাফিল বানিয়ে দেয়।

و نفس تنجيها خير من امارة لا تحصيها -

১১. ঐ নাফ্স যা নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয় তা ঐ বাদশাহীর চেয়ে উত্তম য-দ্বারা প্রজাবৃন্দ নিরাপত্তা লাভ করতে পারেনা।

شر العذ يلة حين يحضر الموت -

১২. মৃত্যুকালীন অজুহাত নিকৃষ্টতর অজুহাত।

و شر الندامة ندامة يوم القيامة -

১৩. কিয়ামতের দিনের অনুতাপ নিন্দনীয় অনুতাপ।

---

১. প্রতিটি স্থান ও মুহূর্তে ইসলামী হিদায়াতের অনুসরণকেই যিকির নামে অভিহিত করা হয়। যেমন পেরেশান ও অস্থিরতার সময় দু'আ পাঠ করা, প্রতিটি কর্মে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করা, বিপদাপন্ন হলে সবর ও ধৈর্য প্রদর্শন, সুখ ও সাচ্ছন্দের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা ইত্যাদি।

২. সুতরাং পরিণাম দেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করা মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য।

৩. ইরশাদ হয়েছে: كيف يهدى الله قوما كفروا بعد اسلامهم و اشهدوا ان الرسول حق
ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলের সত্যতার স্বীকারুক্তির পর যারা কুফরী করে আল্লাহ কিভাবে তাদের হিদায়াত করবেন? আল্লাহ বলেন: و الله لا يهدى الظالمين
আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে হিদায়াত করেন না। বলা বাহুল্য যে আত্মপীড়নই বৃহত্তর যুলুম।

و شر الضلالة الضلالة بعد الهدى -

১৫. হিদায়াতের পর গোমরাহী সর্ব নিকৃষ্ট গোমরাহী।

و خير الغنى غنى النفس -

১৬. হৃদয়ের ঐশ্বর্যই প্রকৃষ্ট ঐশ্বর্য।

و خير الزاد التقوى -

১৭. তাকওয়াই শ্রেষ্ঠতর অবলম্বন।

و خير ما القى فى القلب اليقين -

১৮. মানুষের অন্তরে যা কিছু উৎকীর্ণ হয় তার মধ্যে "ইয়াকীন" শ্রেষ্ঠতম।

الريب من الكفر -

১৯. আল্লাহ্‌র হিদায়াতের মাঝে সন্দেহ পোষণ কুফ্‌রের নামান্তর।[১]

و شر العمى عمى القلب -

২০. কলবের অন্ধত্বই প্রকৃত জুলমাত।

و الخمر جماع كل اثم -

২১. মদ্য পানের ভেতর সকল প্রকার গুনাহ্ নিহিত।

النساء حبالة الشيطان -

২২. নারী জাতি ইবলিসের ফাঁদ।

و الشباب شعبة من الجنون -

২৩. যৌবন উন্মাদনার অংশ বিশেষ।

و النوح من عمل الجاهلية -

২৪. মৃতের উপর মাতম করা জাহেলিয়াতের প্রতিক্রিয়া।

و من الناس من لا ياتى الجمعة الا دبرا -

২৫. কতক লোকত অনাসক্তির সাথেই মসজিদে আসে।

و لا يذكر الله الا هجرا -

২৬. আর তারা তাচ্ছিল্যের সাথে আল্লাহ্‌র যিকির করে।

---

১. সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে আল্লাহকে অস্বীকার করার মাঝেই কুফর সীমাবদ্ধ। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ ধারণা অপনোদন করে বলেন যে হিদায়াতের মধ্যে অনিশ্চয়তা জ্ঞান ও কুফরীর শামিল।

و اعظم الخطايا الكذب -

২৭, মিথ্যা কথন বৃহত্তর পাপ।

سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و حرمة ماله كحرمة دمه -

২৮. মু'মিনকে গালি-গালাজ করা ফিস্‌ক[১] এবং তাকে হত্যা করা কুফর সঞ্জাত পদক্ষেপ এবং মুসলমানের মালের মর্যাদা তার রক্তের মর্যাদার সমতুল্য।

و من يعف يعف الله عنه و من يكظم الغيظ يأجره الله و من يغفر يغفر الله له و من يصبر على الرزية يعقبه الله -

২৯. যে ব্যক্তি মানুষের অপরাধ মার্জনা করে আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার গুনাহ্‌ মাফ করে দেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় রাগ বশীভূত করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে সাওয়াব দান করেন। যে ব্যক্তি অপরাধীর ক্ষমায় হৃষ্টচিত্ত হয় আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অন্যায় ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি বিপদাপদে সবর করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

و شر المكاسب كسب الربوا و شر المأكل مال اليتيم -

৩০. সুদের উপার্জন নিকৃষ্টতম উপার্জন। আর ইয়াতীমের মাল ভক্ষণের মত কুখাদ্য আর নেই।[২]

و السعيد من وعظ بغيره و الشقى من شقى فى بطن امه -

৩১. সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যে অন্যের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর দুর্ভাগা সে যে ব্যক্তি মাতৃগর্ভেই দুর্ভাগা হিসাবে জন্ম নিয়েছে।

و انما يكفى احدكم ماقنعت به نفسه -

৩২. তোমাদের নফ্‌স যাতে পরিতৃপ্ত হয় তাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

و شر الروايا روايا الكذب -

৩৩. বানোয়াট কাহিনী নিকৃষ্টতর কাহিনী।

و اشرف الموت قتل الشهداء -

৩৪. শাহাদতের মৃত্যু মহিমান্বিত মৃত্যু।

---

১. বৃহত্তর পাপ।

২. ইরশাদ হয়েছে الذين يأكلون اموال اليتمى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا — যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা নিজেদের উদরে অগ্নি প্রবিষ্ট করে।

ومن يعرف البلاء يصبر عليه و من لا يعرفه ينكره -

৩৫. যে ব্যক্তি নিজের পরীক্ষা জেনে ফেলে সে ধৈর্য ধারণে সক্ষম হয়। আর যে ব্যক্তি তা অজ্ঞাত থাকে বিপদে সে আকুলী বিকুলী করে এবং তা থেকে পশ্চাতমুখো হয়।

و من يستكبر يضعه الله -

৩৬. যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

و من يتولى الدنيا يعجز عنه -

৩৭. যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় সে দুনিয়া কর্তৃক বঞ্চিত হয়।

و من يطع الشيطان يعص الله و من يعص الله يعذبه -

৩৮. যে ব্যক্তি শয়তানের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌র নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেন।

حب الكفاية مفتاح المعجزة -

৩৯. তুষ্টি প্রেম মু'জিযার চাবিকাঠী।

يحسب المرأ من العلم ان يخاف الله و يحسبه من الجهل ان يعجب بعمله -

৪০. খোদাভীতি জ্ঞানের পরিচায়ক আর নিজ কর্মে ঠাট প্রদর্শন মূর্খতার পরিচায়ক।

كفى بخشية الله علما و كفى بالاغترار به جهلا -

৪১. আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রকম্পিত থাকা ইলমের জলন্ত সাক্ষী আর কল্পনা-প্রবণ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চরম অজ্ঞানতা।

শিক্ষানীতি

ইলমের প্রতি উৎসাহ দান

عليكم بالعلم فان احدكم لا يدرى متى يختل اليه اى متى يحتاج الناس الى ما عنده -

তোমরা অবশ্যই ইলম শিখে নাও। তোমরা জান না যে মানুষ কখন এ ইলমের জন্য তোমাদের দ্বার গ্রস্ত হবে।[১]

১. মুখতারুস সিহাহ্।

শিক্ষক নির্বাচন

لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و من اكابرهم - فاذا جاء من قبل اصاغرهم فذالك حين هلكوا -

মানুষ ততদিন পর্য্যন্ত কল্যাণের ভিতর থাকবে যতদিন তারা রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রবীণ সাহাবীদের থেকে ইল্‌ম আহরণ করবে। কিন্তু তাদেরকে পেয়েও যারা ছোটদেরকে উস্তাদ নির্বাচন করবে তখনই ধ্বংসের সূত্রপাত হবে।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সর্বদা এ ব্যাপারে তাগিদ করতেন যে, যে সব সাহাবিগণ অধিককাল পর্যন্ত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সুহ্‌বত লাভে সমর্থ হয়েছেন তাদের থেকেই যেন দীনের সকল বিষয়ীভূত জ্ঞান আহরণ করা হয়। কেননা তারা দীনের সাধারণ-অসাধারণ নীতির মধ্যে পার্থক্য করতে সমর্থ হন। যেহেতু তারা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও রাসূলে করীম (সঃ)-এর জওক বা মনন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

ইলমের হাকীকত

ليس العلم بكثرة الرواية و لكن العلم الخشية -

অধিক পরিমাণ রিওয়ায়েত বা বর্ণনা করাই সত্যিকারের ইল্‌ম নয়। বরং যদ্বারা হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় জাগরিত হয় তা-ই প্রকৃত ইল্‌ম।[২]

শিক্ষা পদ্ধতি

قال الشعبي مر رجل بعبد الله بن مسعود فقال لاصحابه هذا لا يعلم و لا يعلم انه لا يعلم و لا يتعلم ممن يعلم -

ইমাম শা'বী বলেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মজলিস অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে দেখ, এই ব্যক্তির ইল্‌ম নেই অথচ সে তার এ অজ্ঞানতা সম্পর্কেও সচেতন নয়। এর মূল কারণ হল যে, এ ব্যক্তি আলিমদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।[২]

---

১. জামিউ বয়ানিল ইল্‌ম ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।
২. আল ইবহুল কবীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

ان الرجل لا يولد عالما و انما العلم بالتعلم -

তিনি বলেন যে, কেউ মাতৃগর্ভ থেকে আলিম হয়ে জন্মলাভ করে না। এ-ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে উস্তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে হয়।[১]

আমলের গুরুত্ব

و يل لمن لا يعلم و لوشاء الله لعلمه و يل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات -

যার ইল্‌ম নেই সে নিতান্ত দুর্ভাগা। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হলে তাকে এ দৌলত দান করতেন। কিন্তু এ ব্যক্তির চেয়ে সাতগুণ দুর্ভাগা হল ঐ ব্যক্তি যে ইল্‌ম শিখে সে কিন্তু অনুসারে আমলে প্রবৃত্ত হয় না।[২]

تعلموا العلم فاذا علمتم فاعلموا -

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমরা প্রথমে ইলেম আহরণ কর এবং পরে তদনুযায়ী আমল কর।[৩]

انى لاحسب الرجل ينس العلم كا يعلمه للخطيئة يعملها -

আমি মনে করি যে, মানুষ বেআমলীর কারণেই জ্ঞান আহরণের পর তা ভুলে যায়।[৪]

আল-কুরআন সম্পর্কে

اقرأو القران و حركوا به القلوب لايكون هم احد كم اخر السورة -

তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। আর তদ্বারা অন্তর উদ্বেলিত কর। কেবল সূরা সমাপ্তিই যেন তোমাদের লক্ষ্য না হয়।[৫]

انما هذه القلوب او عية فاشغلوها بالقران و لا تشغلوها بغيره -

মানুষের অন্তর অমূল্য পাত্র বিশেষ। তোমরা আল-কুরআন দ্বারা ইহা পূর্ণ কর। এর ভেতর অন্য কিছু প্রবিষ্ট হতে দিও না।

---

১. ইরশাদ হয়েছে و الله اخرجكم من بطون امها تكم لا تعلمون شيئا "আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে সৃজন করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না।

২. হুলিয়াতুল আউলিয়া-পৃঃ ১৩১।

৩. হুলিয়াতুল আউলিয়া

৪. বায়হাকী

৫. হুলিয়াতুল আউলিয়া, পৃঃ ১৩০।

ان هذا القرآن مأدبة الله فمن استطاع ان يتعلم منه شيئا فليفعل فان اصفر البيوت من الخير الذى ليس فيه من كتاب الله شيئ كخراب البيت الذى لا عامر له و ان الشيطان يخرج من البيت الذى تسمع فيه سورة البقرة ـ

নিশ্চয়ই এ কুরআন আল্লাহ্র দস্তরখান স্বরূপ। যার পক্ষে সম্ভব সে যেন তা থেকে কিছু আহরণ করে নেয়। যে গৃহে (অন্তরে) কুরআনের কোন অংশ নেই তা সমূহ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। সে ত ঐ গৃহের ন্যায় যার কোন আবাদ-কারী নেই। যে গৃহে সূরা বাকারার তিলাওয়াত হয় শয়তান সেথা হতে পলায়ন করে।

اتاه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن علمنى كلمات جوامع نوافع فقال عبد الله اعبد الله و لا تشرك به شيئا و زل مع القرآن حيث زال و من جاءك بالحق فاقبل منه و ان كان بعيدا بغيضا و من جاءك بالباطل فاردد عليه و ان كان حبيبا قريبا ـ

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সমীপে আরয করল, হে আবু আব্দুল্লাহ্! আমাকে পূর্ণতর কিছু উপদেশ দিন যদ্বারা আমার উপকার সাধন হবে। তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র ইবাদত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। কুরআনের নির্দেশের সম্মুখে নিজেকে সোপর্দ করে দাও। কোন সুজন বা শত্রুও যদি তোমার কাছে হক্ ও সত্য নিয়ে আসে তবে অকুণ্ঠভাবে তা কবুল কর। আর কোন সুজন বা বন্ধুও যদি তোমার সম্মুখে বাতিল নিয়ে আসে তবে নির্দ্বিধায় তা বর্জন কর।[1]

انزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا قال سعد بن ابى وقاص من قرأ خلف الامام فسدت صلاته ـ

আল কুরআন আমলের জন্য নাযিল হয়েছে, (মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনে করীম থেকে দিক দর্শন নেবে।) কিন্তু তারা তিলাওয়াতের মধ্যেই আমলকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কুরআন তিলাওয়াত করে তার নামায বিনষ্ট হয়ে যায়।

১. হুলিয়াতুল আউলিয়া ১৩৪ পৃঃ

কুরআনে করীমের আদব

اذا استطعت ان تكون انت المحدث و اذا سمعت الله يقول و يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك خير يامر به او شر ينهى عنه -

শোন। সম্ভব হলে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কথপকথন কর। আল্লাহ্‌কে যখন বলতে শুনবে يا ايها الذين امنوا (অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ) তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কেননা তখন তিনি হয়ত কোন সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন অথবা অসৎ কাজ থেকে বারণ করবেন।

عن عبد الله مسعود قال ينبغى لحامل القرآن ان يعرف بليله اذ الناس نائمون و بنهاره اذا الناس يفطرون و بحزنه اذ الناس يفرحون و ببكائه اذا الناس يضحكون و بصمته اذا الناس يخلطون و بخشوعه اذا الناس يختالون و ينبغى لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكيتا و لا ينبغى لحامل القرآن ان يكون جافيا و لا غافلا و لا صخابا و لا صياحا و لا حديدا -

قال ابن مسعود انى لاكره ان ارى الرجل فارغا لا فى عمل الدنيا و لا فى عمل الاخرة -

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, কুরআন করীমের উত্তরাধিকারী পরিচয় তো এই হওয়া উচিৎ যে, রাতে যখন সবাই নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন সে তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকবে। আর দিবসে মানুষ পানাহারে ব্যতিব্যস্ত থাকবে কিন্তু সে থাকবে রোযাদার। অন্যান্য সবাই আনন্দোল্লাসে গা ভাসিয়ে দেবে কিন্তু সে পরকালের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে থাকবে। সকল মানুষ পরস্পর সংস্রবে ব্যস্ত সমস্ত থাকবে কিন্তু সে একাকী দিন গুজরান করবে। দুনিয়ার সবাই দাম্ভিকতার পরিচয় দেবে কিন্তু সে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনয় বিগলিত হবে। আল-কুরআনের বাহক চিন্তাশীল ও প্রজ্ঞাবান হবে। সে হবে সহনশীল ও বিদগ্ধ। সে ধীর-গম্ভীর স্বভাবের অধিকারী হবে। কিন্তু তাকে নিরস ও রুক্ষ মেজাযের হলে চলবে না। সকল অবসাদ, হৈ চৈ ও চিৎকার বিনাদ তাকে বর্জন করতে হবে। সে লৌহ-কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হবে না

আদৌ যে ব্যক্তি বেকার সময়ের অপচয় করে জাগতিক বা পরকালীন কোন কাজে লিপ্ত থাকে না তাকে আমার মোটেই পছন্দ নয়।[১]

১. হুলিয়াতুল আউলিয়া, পৃঃ ১৩০।

জীবন দর্শন

১. জীবিকা নির্বাহের গুরুত্ব

كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت -

একজন মানুষের গুনাহ্গার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় অবলম্বন বিনষ্ট করে দেবে।[১]

২. পরিশ্রম

لا الفين احدكم جيفة ليل قطرب نهار -

তোমাদের কেউ যেন রাত্রে মৃতলাশ এবং দিবসে বেকার প্রাণী হিসেবে জীবন যাপন না করে।

৩. মিতব্যয়

النفقة فى غير حق هو التبذير -

অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ই তাবজীর বা নিরেট অপচয়।[২]

৪. উপার্জনে সহনশীল হওয়া প্রয়োজন

فرغ من الخلق الخلق و الرزق و الاجل فليس احد اكسب من احد -

চারটি বিষয় আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন। এতে কারুর কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। (ক) সৃষ্টি ও সৌন্দর্য, (খ) আখলাক, (গ) জীবিকা (ঘ) আয়ু।[৩] সুতরাং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত রিযিকের অধিক উপার্জনে সক্ষম হবে না এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও তা কারুর হাতে আসবে না। তাই জীবিকা নির্বাহের সাথে তাওয়াক্কুল একান্ত আবশ্যক। কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বা সফলতায় বিলম্ব হলে দমে যেতে নেই, তখন ধৈর্যের পরিচয় দেয়া উচিৎ।

৫. আখিরাত প্রসঙ্গ

سمع عبد الله رجلا يقول اين الزاهدون فى الدنيا الراغبون فى

---

১. বায়হাকী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫।

২. বায়হাকী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬২।

৩. বায়হাকী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬২।

الا خرة فقال عبد الله اولائك اصحاب الجواثة الا ش-رط خمس مائة من المسلمين ان لا يرجعوا حتى يقتلوا فحلقوا رؤسهم و لقوا العدو فقتلوا الا مخبر عنهم -

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, বর্তমানে দুনিয়া বিমুখ আখিরাতের অনুসন্ধানীরা কোথায়? তিনি তার উত্তরে বললেন যে, তারাতো ঐ জাবিয়াবাসী যাদের পাঁচশ' মুসলিম সম্মিলিতভাবে শপথ করল যে তারা শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধরত থাকবে; কেউ পশ্চাদ-মুখী হবে না। অনন্তর তারা মাথা মুণ্ডন করতঃ শত্রুর মুখোমুখী হল এবং সংবাদবাহী ব্যতীত আর সকলেই শাহাদত বরণ করল।[১]

৬. আখিরাতের প্রতি উৎসাহ

قال انتم اكثر صياما و اكثر صلاة و اكثر اجتهادا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هم كانوا خيرا منكم قالوا و لـم يا ابا عبد الرحمن قال كانوا ازهد فى الدنيا ارغب فى الاخرة -

তোমরা যত নামায পড় ও রোযা রাখ আর যে পরিমাণ মেহনত মুযাহাদা কর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এতকিছু করতেন না। অথচ তাঁরা তোমাদের চেয়ে লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। তাঁরা (শিষ্যবৃন্দ) জিজ্ঞেস করল, হে আবু আবদুল্লাহ্! এর হেতু কি? তিনি বললেন কারণ, তারা জাগতিক বিষয়ে খুবই বেনিয়াজ ছিলেন আর পরকালের ব্যাপারে তাদের উৎসাহের কোন অন্ত ছিল না।

ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله فمن كانت راحته فى لقاء الله فكان قد -

মুসলমানদের হৃদয় আল্লাহ্‌র দীদার ব্যতীত প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভে আশাবাদী তার সে আশা ব্যর্থ যাবে না।

৭. খাঁটি মুসলিম হলে

و الله الذى لا اله غيرة ما يضر عبدا يصبح على الاسلام و يمشى عليه ما اصابه فى الدنيا -

---

১. হিলিয়াতুল আউলিয়া পৃঃ ১৩৩।

ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি একক ও অদ্বিতীয়। মানুষ যতদিন নিজেকে ইসলামের উপর কায়েম রাখবে, ততদিন দুনিয়ায় কেউ তাঁর অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না।

৮. দুনিয়া ও আখিরাতের পরস্পর তুলনা

من اراد الدنيا بالآخرة اضر و من اراد الآخرة اضر بالدنيا فاضروا بالفانى للباقى -

দুনিয়াই যার লক্ষ্য তার পরকালীন জীবনের ব্যর্থতা অনিবার্য। আর যে ব্যক্তি আখিরাতে সফলতা প্রত্যাশা করে, পার্থিব জীবনে সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সুতরাং চিরস্থায়ী জীবনের সফলতার জন্য তোমরা ধ্বংসশীল এ পার্থিব জীবনকে পরিত্যাগ কর।[১]

৯. আখিরাতের ভয়

لو وقفت بين الجنة و النار فقيل لى نخيرك ايهما تكون احب اليك او تكون رمادا لاخترت ان اكون رمادا -

আমাকে যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে দাঁড় করিয়ে বলা হয় যে, এ দুয়ের মধ্যে যেটি তোমার পছন্দসই, সেখানে প্রবেশ কর। অথবা ইচ্ছা হলে মৃত্তিকায় পরিণত হতে পার। তখন আমি মাটির সাথেই মিশে যেতে চাইব।

১০. সৎসাহসের প্রয়োজন

ان الجنة حفت بالمكارة و ان النار حفت بالشهوات فمن اطلع و اقع ما وراءه -

জান্নাত কষ্ট ও যাতনা দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর জাহান্নামকে পদাবৃত করা হয়েছে কামনা চরিতার্থ দ্বারা। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে সে জাহান্নামে পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট বরণ করে নেবে সে জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে।

১১. মানুষ যেন জানতে না পারে

اذا اصبح احدكم صائما فلا يترجل و اذا تصدق بصدقة [illegible]

১. হিলিয়াতুল আউলিয়া পৃঃ ১৩৮।

يخفيها عن شماله و اذا صلى صلاة او صلى تطوعا فليصليها فى داخله -

তোমরা রোযা রাখলে তা প্রকাশ হতে দিও না। মাথায় তেল লাগাবে। চুল পরিপাটি করবে। যাতে তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা দর্শনে রোযাদার বলে অনুভূত না হয়। এমনি ভাবে দান-খয়রাত করলে তা যেন ডান হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাম হাত যেন সে ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে। আর নফল নামায সর্বদা গৃহাভ্যন্তরে পড়বে। মানুষ যেন তা জানতে না পায়।[1]

১২. সমাধানের উপায়

داووا مرضاكم بالصدقة و حصنوا اموالكم بالزكاة و اعدوا للبلاء الدعاء -

তুমি রোগাক্রান্ত হলে দান-সদকাকে প্রতিষেধক হিসেবে গ্রহণ কর। যাকাতের মাধ্যমে স্বীয় ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান কর। আর তুমি যদি বিপদাপন্ন হতে থাক তবে আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি জানাও। মোদ্দাকথা জীবনের আপতিত সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ্‌র থেকেই চেয়ে নেবে।[2]

১৩. তাকওয়া

كنا ندع تسعة اعشار الحلال مخافة الحرام -

আমরা নয়-দশমাংশ হালাল বস্তুও এই ভয়ে পরিত্যাগ করতাম যে, কি-জানি কোন অগোচরে হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

কেননা মানুষের প্রবৃত্তি তো এমন যে, তার একটা পূরণ হলে দ্বিতীয় আরেকটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেটিও যদি পূর্ণ হয়, তবে তৃতীয় আরেকটা এসে হাযির হয়। মানুষের কামনা ও বাসনা অনন্ত। তার চাহিদার কোন শেষ নেই। যতই তা চরিতার্থ হবে ততই তার লালসা লেলিহান হয়ে ওঠবে। যখন হালাল উপায় নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন সে হারামের চৌহদ্দীতে প্রবেশ করবে। সুতরাং হালাল হলেই কামনার পেছনে পড়তে নেই। কামনা ও লালসাকে বশীভূত করাই মানুষের কর্তব্য।

১৪. আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সহজ উপায়

من استطاع منكم ان يجعل كنزه فى السماء حيث لا ياكل السوس

১. হুলিয়াতুল আউলিয়া পৃঃ ১৩২।
২. মাবসুত, কৃত ইমাম সারাখসি (রঃ) ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।

و لا يناله السراق فليفعل فان قلب الرجل مع كنزه -

সম্ভব হলে তোমরা তাবৎ ধন-সম্পদ আসমানে গুদামজাত কর সেখানে তস্কর যেতে পারবে না। কীটও তার উদরস্থ করতে সক্ষম হয় না। উপরন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পেয়ে যাবে। কেননা মানুষের মন ধন-বৈভবের ভালবাসায় প্রমত্ত। সেগুলো যদি আকাশে উঠিয়ে দিতে পার তবে স্বভাবতঃই তোমার মন উর্ধ্বগামী হয়ে আকাশের প্রভুর ভালবাসায় বাঁধা পড়ে যাবে।

১৫. দুয়ার একদিন খুলবেই

قال ما دمت في صلاة فانت تقرع باب الملك و من يقرع باب الملك يفتح له -

তুমি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হও, তখন যেন তুমি শাহানশার দ্বারে করাঘাত করছ। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি শাহী দুয়ারে করাঘাত করতে থাকে একদিন না একদিন সে দুয়ার খুলবেই।[১]

১৬. নামাযের গুরুত্ব

قال امشوا الى الصلاة فقد مشى اليها من هو خير منكم ابو بكر و عمر و المهاجرون و الانصار قاربوا الخطى و اكثروا ذكر الله عزوجل. و لا عليك ان لا تصحب احدا الا من اعانك على ذكر الله -

তোমরা নামাযের জন্য মসজিদে চল। তোমাদের চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন সেই হযরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), মুহাজির ও আনসার তাঁরা সবাই নামাযের জন্য পাগলপারা ছিলেন। মসজিদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল অতি গভীর। চলার পথে ছোট ছোট কদম রাখবে। পা সংকুচিত করে চলবে। আল্লাহ্‌র যিকিরের সাথে চলবে। এতে যদি তুমি পিছনে পড়ে যাও তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। বরং অধিক সওয়াব পেয়ে তুমিই লাভবান হবে।[২]

আখলাক প্রসঙ্গ

১৭. শৈশব কালই মূলতঃ গড়ে তোলবার সময়

حافظوا على ابناءكم في الصلاة ثم تعود الخير فانما الخير بالعادة -

১. বায়হাকী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮৩

২. বায়হাকী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯

তোমরা নিজ সন্তানকে নামাযে অভ্যস্ত করে তোল। শিশুকালেই তাকে আখলাক ও আদর্শের উপর গড়ে তোল। মনে রাখবে আদর্শ মানবের জন্য শৈশবকালীন অভ্যাস অপরিহার্য।১

১৮. আখলাকের বুনিয়াদ

قولوا خيرا تعرفوا به و اعملوا به تكونوا من اهله و لا تكونوا عجلا مذاييع بذرا -

উত্তম ও মনোজ্ঞ কথা বল তবে ভাল লোক হিসাবে পরিচিত হবে। উৎকৃষ্ট আমলে রত থাক, একজন প্রকৃষ্ট মানুষ হতে পারবে। বুদ্ধি-গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা কর ব্যস্তবাগীশ হয়ো না। মন্দ প্রচার থেকে বিরত থাক। কারুর গোপন বিষয় বা স্বীয় সংকল্পের কথা প্রকাশ করো না।

১৯. আমানত সংরক্ষণ

اول ما تفقدون من دينكم الامانة و اخر ما تفقدون الصلاة وسيصلى قوم لا دين لهم -

তোমাদের দীন থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয় অবগত হবে তা হল আমানত। আর সবশেষে তোমরা সালাত পরিত্যাগ করবে। ফলে দুনিয়ার তাবৎ মানুষ একটা বেদীন প্রাণী হিসেবে বিচরণ করবে—জাহান্নাম যাদের শেষ মনযিল।

القتل فى سبيل الله يكفر كل ذنب الا الامانة يؤتى بصاحبها و ان كان قتل فى سبيل الله فيقال له اد امانتك فيقول رب ذهبت الدنيا فمن اين اوديها فيقول اذهبوا به الى الهاوية حتى اذا اتى به الى قرار الهاوية مثلت له امانته كيوم دفعت اليه فيحملها على رقبته فى اثرها ابدا و قرا عبد الله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

একমাত্র আমানতের খিয়ানত ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন তাকে হাযির করে নির্দেশ দেয়া হবে, তোমার আমানত পরিশোধ করে জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে প্রভু! তুমি তো পার্থিব জীবনের যবনিকা টেনেছ। আমি কিভাবে তা আদায় করব? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেবেন, এ-কে দোযখে নিয়ে যাও। তাকে যখন

জাহান্নামের পাদদেশে হাযির করা হবে, তখন তার দায়িত্বভুক্ত সে আমানতকে অবিকল মূর্তিতে উপস্থিত করা হবে। তা সে অনন্তকাল স্বীয় স্কন্ধে বহন করবে। এর পরে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পাঠ করে শুনালেন "তোমরা সকল আমানত তার মালিকের হাতে পেঁাছিয়ে দাও।"[১]

২০. তাকদীরে বিশ্বাস

নবুওয়াতের পর একমাত্র তাকদীরে অবিশ্বাসের ফলেই যত সব কুফরত ও দলালাতের উদ্ভব হয়েছে।[২]

ما كان كفر بعد نبوة قط الا كان مفتاحه التكذيب بالقدر -

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এমন এক যুগের জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে দিন আমাদের কারুর মৃত্যুতে কেউ দুঃখিত হবে না। আর কোন নবজাতকের উপর কেউ আনন্দ প্রকাশ করবে না।[৩]

اياكم وحزائز القلوب وماحز فى قلبك من شئى فدعه -

কলবের সন্দিগ্ধ বিষয়ে সাবধান হও। যে ব্যাপারে তোমার মনে সংশয় জাগে তা বর্জন কর।

لا يشبه الزى بالزى حتى تشبه القلوب القلوب -

হৃদয়ের মিল ব্যতীত কখনো আচার ভঙ্গীর সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়।

২১. লোক দেখানো নয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান

من راى فى الدنيا راى الله به يوم القيامة و يسمع الدنيا يسمع الله به يوم القيامة و من يتطاول تعظيما يضعه الله و من يتواضع تخشعا يرفعه الله -

যে ব্যক্তির আমলের উদ্দেশ্য হল দুনিয়াবাসীকে আকর্ষিত করা, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার সাথে অসার লৌকিকতামূলক আচরণ করবেন।[৪] যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করবে হাশরের মাঠে

১. বায়হাকী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।
২. ইকদুল ফরীদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।
৩. ইকদুল ফরীদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।
৪. তাকে একটা চাকচিক্যময় স্থানে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হবে সে তাকে জান্নাত জ্ঞান করত উৎফুল্লের সাথে ভিতরে প্রবেশ করবে। কিন্তু যার রাষ্টা সে মহল দোযখের লেলিহান শিখা হয়ে তাকে বিদগ্ধ করবে নিদারুণ ভাবে।

আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করবেন সর্ব সম্মুখে। যে ব্যক্তি নিজেকে সকলের বড় প্রমাণ করতে চাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইতর প্রমাণিত করে ছাড়বেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিনয়াবনত হবে নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করবে; আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।

২২. বংশ গৌরব নয় আল্লাহ্‌র ক্ষমাই মৌল বিষয়

لوددت انی اعلم ان الله غفرلی ذنبا من ذنوبی و انی لا ابالی ای ولد ادم ولدنی -

আমার জীবনেরও একই কামনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পাপ ক্ষমা করেছেন। এতটুকু কথা যেন জ্ঞাত হতে পারি।[১] আমি কার সন্তান বা কোন বংশে আমি জন্ম নিয়েছি এসবের কোন মূল্য নেই আমার কাছে।[২]

২৩. অধ্যাবসায়ে মত্নবান হও।

قول المعقرلت من الاعمال قول قوم نزلوا منزلا ليس به حطب و معهم لحم فلم يزالوا يلقون حتى جمعوا ما نضجوا به لحمهم -

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলের উদাহরণ এই যে, একটা কওম এমন এক স্থানে অবতরণ করল, যেখানে জ্বালানী বলতে কিছুই নেই অথচ তাদের কাছে গোশ্‌ত রয়েছে। তাদেরকে এগুলো পাকাতেই হবে। অনন্তর তারা খণ্ড খণ্ড কাঠ সংগ্রহে লেগে গেল শেষ পর্যন্ত তাদের রন্ধনযোগ্য জ্বালানী প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের আর কোন ভয় থাকল না। এমনি ভাবে একটা লোক নিয়মিত ভাবে অল্প বিস্তর আমল করতে থাকলে একদিন সে মনযিলে মাকসাদে পৌঁছেই যাবে।

---

১. ইরশাদ হয়েছে من زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز যাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল সেইত সফলকাম।

২. আল্লাহ্ তা'আলা ত বলেই দিয়েছেন يا ايها الناس انا خلقنا كم من ذكرو انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اكرمكم عند الله اتقاكم. হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে নর-নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পার। কিন্তু মনে রাখবে তোমাদের মধ্যে যেজন অধিক মুত্তাকী সেই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক মর্যাদাবান।

২৪. আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা

ان الله يعطى الدنيا من يحب و من لا يحب و لا يعطى الايمان الا من يحب فاذا احب الله عبدا اعطاه الايمان -

এই পার্থিব ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় অপ্রিয় সকলকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু ঈমানের দৌলত একমাত্র মাহ্বূব বান্দাই পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে ঈমানের দৌলতে মহিমান্বিত করে তোলেন।[১]

و الذى لا اله غيره ما اصبح عند ال عبد الله ما يرجوا ان يعطيهم الله به خيرا او يرفع عنهم سوءا الا ان الله قد علم ان عبد الله لا يشرك به شيئا -

তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ, আমার খান্দানে এমন কিছুই নেই, যদ্বারা আমি এ আশা করতে পারি যে, আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ করবেন অথবা তাদের কোন অমঙ্গল দূর করবেন। তবে আমার এতটুকু ভরসা আছে যে, আমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করি না।

فقال ما منكم من احد الا ان ربه تعالى سيخلو به كما يخلو احدكم بالقمر ليلة البدر فيقول يا ابن ادم ما اجبت المرسلين ؟ يا ابن ادم ماذا عملت فيما علمت ؟

তোমরা যেমন পূর্ণ চাঁদের মুখোমুখি হও তেমনিভাবে তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্র সম্মুখে নীত হবে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, বল, তোমরা কিভাবে আমার সম্পর্কে প্রবঞ্চনার শিকার হলে যে, আমার ও রাসূলের আহ্বানে কেবল মৌখিক সাড়া দিয়েই ক্ষান্ত হলে? আজ কৈফিয়ত দাও। তোমরা যা কিছু শিখেছিলে তার কতটুকু আমল করেছ?

يعرض الناس يوم القيامة على ثلاثة دوا وين ديوان فيه الحسنات و ديوان فيه النعيم و ديوان فيه السيئات فيقابل بديوان الحسنات ديوان النعيم فيستفرغ النعيم الحسنات و تبقى السيئات و مشيئتها الى الله ان شاء الله عذب و ان شاء غفر -

১. আল-আদাবুল মুফরাদ—ইমাম বুখারী।

কিয়ামতের দিন মানুষের সম্মুখে তিন খানা নথি পেশ করা হবে। প্রথমটিতে নেক আমল লিপিবদ্ধ থাকবে, দ্বিতীয়টিতে প্রদত্ত সব নিয়া-মতের হিসাব নিকাশ থাকবে, আর তৃতীয়টিতে থাকবে গুনাহ্‌র ফিরিস্তী। এগুলোকে পরস্পর তুলনা করে দেখার নির্দেশ হবে। তখন দেখা যাবে যে তার সৎ কর্মগুলো তাকে দেয়া নিয়ামতের পরিমাণ ডিঙিয়ে যেতে পারবে না। অবশেষে যা বাকী থাকবে তা শুধু গুনাহ্‌র পাহাড়। এখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে তাকে সে গুনাহ্‌র শাস্তি প্রদান করবেন আর ইচ্ছা হলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

و درث انی صوالحت علی تسع سیئات و حسنة -

"আমি আশা করি যেন আমার একটি নেকীর পরিবর্তে দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।"

انی لا اخاف علیکم فی الخطاء و لکن اخاف علیکم فی العمد انی لا اخاف علیکم ان تتقلوا اعمالکم و لکن اخاف علیکم ان تستکثروها -

তোমরা ভুলবশত কোন অন্যায় করে ফেললে আমি ভয় করি না কিন্তু সেচ্ছায় যদি পাপাচারে লিপ্ত হও তবে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তোমরা যদি নিজেদের সৎ কর্মকে যৎ-সামান্য মনে কর তবে তাতে ভয়ের কিছু নেই পক্ষান্তরে নিজেদের আমলকে যদি পর্যাপ্ত মনে কর তবে সেতো ধ্বংসাত্মক মানসিকতা।

المؤمن یری ذنبه کانه صخرة یخاف ان تقع علیه و المنافق یری ذنبه کذباب و قع علی انفه فطار فذهب -

মু'মিন সর্বদা নিজ গুনাহ্‌কে পাহাড় বৎ মনে করে। আর এজন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে যে কোন মুহূর্তে সে পাহাড় তার উপর ভেঙে পড়বে। পক্ষা-ন্তরে যারা মুনাফিক তারা পাপাচারকে মশা-মাছির মত মনে করে। যেগুলো নাকের ডগায় বসে আবার উড়ে যায়।

لا یستر الله علی عبد فی الدنیا الا ستر علیه فی الاخرة -

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে যে বান্দাহ্‌র সংগোপনে রেখেছেন, তার সম্পর্কে আসা করা যেতে পারে যে পরকালেও তার দোষ ত্রুটি পর্দার অন্ত-রালেই থকবে।[১]

১. হুলিয়াতুল আউলিয়া ১৩৭ পৃঃ।

ما احد من الناس يوم القيامة الا يتمنى انه كان ياكل فى الدنيا قوتا و ما يضر احدكم على ما اصبح و امسى من الدنيا الا ان تكون فى النفس حزازة و لان يعض احدكم على جمرة حتى تطفى خير من ان يقول الامر قضاه الله ليت هذا ـ

কিয়ামতের দিন সকলেই পার্থিব ধন-সম্পদের উপর আফসোস প্রকাশ করবে। তারা বলবে, হায় দুনিয়াবী যিন্দেগীতে আমি দরিদ্র হলেই ভাল ছিল। সকাল-সন্ধায় তোমাদের অবস্থাদির যে উত্থান-পতন হয় মূলত তাতে তোমাদের কোন ক্ষতিই হয় না। অনর্থক তোমরা অন্তরে হাহুতাশ করতে থাক। মনে রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তকদীরে যা ফায়সালা করেছেন তাতে আপত্তনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার চেয়ে জলন্ত কয়লা চুষে চুষে নিভিয়ে ফেলাও অনেক শ্রেয়।

২৫০ জীবে দয়া

عن ابى عثمان عن ابن مسعود انه كان يجالسه بالكوفة فبينما هو يوم فى صفة له و تحته فلانة فلانة امرأتان ذواتا حسب و جمال و له منهما ولد كاحسن الولدان شقشق على رأسه عصفور ثم قذف اذى بطنه فنكت بيده و قال لان يموت ال عبد الله ثم اتبعهم احب الى من ان يموت هذا العصفور ـ

আবু উসমান বলেন যে, কুফায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মজলিসের সন্নিকটেই আমার মজলিস অনুষ্ঠিত হত। একদিন হযরত ইবনে মাসুউদ (রাঃ) স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। পার্শ্বেই তার সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী দুই স্ত্রী বসা ছিলেন। তাদের মাঝখানে হযরতের একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু খেলা করছিল। ইত্যবসরে একটা পাখী এসে তার মাথার উপর বুক ফাটা চিৎকার শুরু করে দিল। মুহূর্তেই পাখিটি হযরতের শরীরে মলত্যাগ করল। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই স্বহস্তে সে পায়খানা মুছে ফেললেন এবং বললেন, অবোধ পাখীর এ কাজের উপর রাগ করে আমি তাকে মেরে ফেলব। তার চেয়ে আমার পরিবারের সবাই মরে যাক আর আমিও তাদের সহগামী হই সে অনেক শ্রেয়।১

---

১. হুলিয়াতুল আউলিয়া ১৩৩ পৃঃ

২৬. ফিতনা ফাসাদ

ذهبت صفو الدنيا و ابقى كدرها فالموت اليوم تحفة لكل مسلم -

পৃথিবীর তাবৎ কল্যাণ ও পরিচ্ছন্নতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট রয়েছে শুধু অমঙ্গল ও ময়লা আবর্জনা। আজ মৃত্যুই মুসলমানদের উৎকৃষ্ট তুহফা।[১] অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের যুগ অতিক্রম হওয়ার ফলে আজ চারিদিকে ফিতনা ও বিশৃংখলার সূত্রপাত হয়েছে। কোথাও আর মঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দৃষ্ট হচ্ছে শুধু ধ্বংসের হাতছানী। মৃত্যু ছাড়া এসবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

২৭. জিন্দেগানীর পথ ?

لا يجعل الله عز و جل من له سهم فى الاسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبد فى الدنيا الا تولاه يوم القيامه ولا يحب رجل قوما الا جاء معهم -

যার মাঝে ইসলামের কোন হিস্যা আছে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঐ ব্যক্তির মত করবেন না যাঁর ভেতরে ইসলামের কোন ছাপ নেই। পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভালবেসেছে পরকালে আল্লাহ্ পাক তাকে ছেড়ে অন্যকে ভালবাসবেন তা কখনো হতে পারে না। যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে কোন কওমকে ভালবাসবে সে কওমের সাথেই তার হাশর হবে।[২]

انكم فى ممر الليل و النهار فى اجال منقوضة و اعمال محفوظة و الموت ياتى بغتة فمن يزرع خيرا يوشك ان يحصد رغبة و من يزرع شرا يوشك ان يحصد ندامة و لكل زراع مثل مازرع لا يسبق بطئى بحظه و لا يدرك حريص مالم يقدر له فمن اعطى خيرا فالله تعالى اعطاه ومن وقى شرا فالله تعالى وقاه المتقون سادة و الفقهاء قادة مجالستهم زيادة -

তোমরা রাত-দিনের আগমন নিষ্ক্রমনের পথে জীবন-যাপন করছ। তোমাদের আয়ু নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমল মাহ্ফুজ থাকবে। একদিন হঠাৎ মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। পরকালের এশর্য্য ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বীজ বপন করেছে, সেতো উত্তম ফসল আহরণ করবে। পক্ষান্তরে যে

১. হলিয়াতুল আউলিয়া। পৃঃ ১৩১
২. ঐ পৃঃ ১৩৭

ব্যক্তি নিকৃষ্ট বীজ রোপন করেছে লজ্জা আর লাঞ্ছনা ছাড়া তার ভাগ্যে কিছুই আসবে না। কৃষক যা বপন করে তাই পায়। চাষাবাদে যে ব্যক্তি বিলম্ব করে সে কখনও তাড়াতাড়ি ফসল পেতে পারে না। লোভী ব্যক্তি যতই চেষ্টা করুক সে তার ভাগ্যলিপি ডিঙিয়ে যেতে সক্ষম হবে না। যে ব্যক্তি কল্যাণের অধিকারী হয়েছে সে-তো আল্লাহ্রই দান। আর যার কোন মুছিবত দূর হয়েছে, মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তা দূর করেছেন। যারা মুত্তাকী তারাই আমাদের নেতা। ফকীহ্গণ আমাদের পথের দিশারী। তাদের সাহচর্যে নেকী বৃদ্ধি পায়।

২৮. জীবনের স্বরূপ

ما منكم الا ضيف و ماله عارية و الضيف مرتحل و العارية مرادة الى اهلها -

ঐ পৃথিবীতে তোমরা সবাই অভ্যাগত। পৃথিবীর তাবৎ ধন-সম্পদ তোমরা ধার হিসাবে পেয়েছ। মেহমানকে অবশ্যই অতিথিশালা পরিত্যাগ করতে হয়। আর কর্জের অর্থ তার প্রকৃত মালিকের হাতে ফেরত দিতে হয়।

و دوت انى من الدنيا فرد كالغادى الراكب الرائح -

আমিতো চাই যে দুনিয়ার সবকিছু থেকে সম্পর্কছেদ করে একাকী জীবন-যাপন করি। যেভাবে সকাল-সন্ধ্যায় মুসাফির নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়।

২৯. বিনয়ের পরিচয়

ان من رأس التواضع ان ترضى بالدون من شرف المجلس و ان تبدأ بالسلام من لقيت -

উচ্চস্তরের বিনয়ের পরিচয় হল যে, মজলিসে অকুণ্ঠভাবে তুমি নিম্নাসনে বসতে পার। আর যার সাথে তোমার মুলাকাত হয় তাকে অগ্রে সালাম দেয়ার চেষ্টা কর।

৩০. মু'মিনের শান

المؤمن مالف و لا خير فى من لا يألف و لا يؤلف -

মু'মিনের বৈশিষ্টই হল যে, সে প্রেমময় হবে। যে ব্যক্তি ভালবাসতে জানে না আর তাকেও কেউ ভাল বাসে না তার ভাগ্যে কল্যাণের কোন হিস্যা নেই।

৩১. নিজের ভাবে চলতে নেই

الحق ثقيل مرئي و الباطل خفيف رأي و رب شهوة تورث حزنا طويلا -

'হক্ক' এর পথ অত্যন্ত কঠিন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তার মাধুর্য অনুভূত হয়। বাতিলের পথ খুবই মুৎসই মনে হয়। ইহার অপযশ খুবই বিলম্বে প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির সামান্য দাসত্বের ফলে সুদীর্ঘ ভোগান্তি পোহাতে হয়। সুতরাং নিজের ভাবে না চলে তিক্ত হলেও সত্যের দামান আঁকড়ে ধরা উচিৎ।

৩২. আমলে অধ্যাবসায়ী হও কলাফলকে দূরের মনে করো না

لا تفتروا فتهلكوا -

আমলে আলস্য করো না। গাফলতীর পরিমাণ ধ্বংস বৈ নয়।

كل ما هو ات قريب -

যার আগমন অবশ্যম্ভাবী তাকে দূরত্ব মনে করো না। সে-ত আসবেই। সুতরাং সে নিকটতম।

৩৩. অবসাদ মুহূর্তে আমলে প্রবৃত্ত হয়ো না

ان للقلوب شهوة و اقبالا و ان القلوب فترة و ادبارا فاغتنموها عند شهوتها و دعوها عند فترتها و ادبارها -

হৃদয়ে অনেক সময় উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। তখন সে কাজের প্রতি সহজেই ধাবিত হয়। বহু সময় মন অবসন্ন থাকে। তখন সে কোন আমলে মনোযোগী হতে পারে না। সুতরাং অন্তর যখন প্রফুল্ল থাকে, তখন ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। আর যখন অবসন্ন থাক তখন কোন কাজে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা গাফলতি বিজড়িত কাজের ফলাফল কখনো শুভ হয় না।

৩৪. অহেতুক মেলামেশা ও বাক-বিতণ্ডা বর্জনীয়

قال رجل لعبد الله اوصني يا ابا عبد الرحمن قال و ليعك بيتك واكفف لسانك و ابك على ذكر خطيئتك -

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে কিছু উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, তোমার নিজ গৃহ যেন তোমাকে বন্দী করে রাখে। সর্বদাঃ রসনা সংযত রাখবে। নিজ পাপ-পঙ্কিলের কথা স্মরণ করে ক্রন্দনরত থাকবে।

قال و الله الذى لا اله الا هو ما على ظهر الارض شئ احوج الى طول سجن من لسانك -

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ পৃথিবীতে সর্বাধিক বন্দী করে রাখবার জিনিস হল জিহবা।

৩৫. হিংসা

لا تعادوا نعم الله قيل له و من يعادى نعم الله قال الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله -

তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের সাথে শত্রুতা করো না। জিজ্ঞেস করা হল, কে আবার আল্লাহ্‌র নিয়ামতের সাথে দুশমনী করে? তিনি বললেন, ঐ সব লোক যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কৃত বান্দার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে।

৩৬. বিদআত

الا قتصاد فى السنة احسن من الا جتهاد فى البدعة -

সুন্নতকে স্বাভাবিকভাবে ধারণ করা বিদআতের ভেতর মুজাহাদা করার চেয়ে অনেক শ্রেয়।

৩৭. আত্মমর্যাদাবোধ

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الايدى ثلاثة ايد فيد الله العليا و يد المعطى تليها و يد السائل اسفل الى يوم القيامة فاستعفوا من السؤال ما استطعتم -

হাত তিন খানা। আল্লাহ্‌র হাত সর্বোচ্চে আর দাতার হাত আল্লাহ্‌তা-'আলার হাতের সাথে সংযুক্ত। সর্বনিম্নে হল ভিখারীর হাত (অর্থাৎ অপরের সম্মুখে যে ব্যক্তি প্রার্থনায় নতজানু হয়) কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত সে নীচু হয়েই থাকবে। সুতরাং যতদূর সম্ভব কারুর সম্মুখে হাত বাড়িয়ো না। শুধরে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোল।

لا تعجبوا بحمد الناس و لا بذمهم فان الرجل يعجبك اليوم يسوءك غدا و يسوءك اليوم و يعجبك غدا و ان العباد يغيرون و الله يغفر الذنوب يوم القيامة و الله ارحم لعباده يوم تايته من ام و احد فرشت له فى ارض فئى ثم قامت تلتمس فراشه بيدها فان كانت لدغة كانت بها و ان كانت شوكة كانت بها -

মানুষের সামনে প্রশংসায় ফ্বলে যেও না। আর কার্বর নিন্দাবাদ দিতে যেও না। মান্বষের মন অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। আজ যে ব্যক্তি তোমার উপর উৎসর্গ প্রাণ। আগামী কাল সে তোমার প্রতি রুষ্ট হয়ে যাবে। এমনিভাবে আজ যে ব্যক্তি তোমার জীবন শত্র্ব। কালকেই সে হবে তোমার একনিষ্ঠ সুহৃদ।

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল গ্বনাহ্ মাফ করে দেবেন। বান্দার উপর আল্লাহ্ ও ঐ মায়ের চেয়েও বেশী দয়াবান যে মা তার শীতল ছায়ায় চাদর বিছিয়ে তার সন্তানকে শ্বইয়ে রেখেছে। নীচ থেকে যাতে কোন বিষদুষ্ট জানোয়ার ছোবল দিতে না পারে এ জন্য সে নিজের হাত সন্তানের পৃষ্ঠদেশে পেতে রেখেছে। অগত্যা যদি দংশন করে তবে তা যেন সন্তানের উপর না লেগে তার নিজ হাতেই লাগে। আর কোন কাঁটা থাকলে তা যেন তার হাতেই বিদ্ধ হয়।

৩৮০. অন্ধ অনুকরণ করো না

তোমরা আলেম হও বা ইলমের অন্বসন্ধান কর। 'ইম্মাআহ' সেজো না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল হে আব্ব আবদ্বর রহমান ইম্মাআহ কি? তিনি বললেন 'ইম্মাআহ' তো ঐ ব্যক্তি যে মান্বষকে বলে যে আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। তোমরা যদি সৎ পথে চল তবে আমিও সৎ পথের পথিক, আর তোমরা যদি বিভ্রান্ত হও তবে আমিও পথহারা। সাবধান। তোমরা এ ধরনের অন্ধ অন্বকরণ করো না। তোমরা নিজেদেরকে এভাবে গড়ে তোল যে সকল মান্বষ যদি কুফরীর দিকে ধাবিত হয়। তব্বও তুমি সত্যেরই ঝাণ্ডাবাহী হবে। কুফরীর কাছও ঘেঁষবে না।

আখিরাতের কামিয়াবীই ইল্ম ও আমলের একমাত্র উদ্দেশ্য

عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا البستكم فتنة يربوا منها الصغير و يهرم فيها الكبير و اذا ترك منها شئ

قيل تركت سنة قالوا متى ذالك يا رسول الله قال اذا كثر قراءكم
و قلت علماءكم و كثرت امراءكم و قلت امناءكم و التمست الدنيا
بعمل الآخرة و تفقه لغير الله قال عبد الله فاصبحتم فيها ـ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন ফিতনা বেষ্টিত হবে তখন কি পদক্ষেপ নেবে? শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে আর বড়রা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কোন জিনিস ছেড়ে দিলে বলা হবে যে সুন্নত পরিত্যক্ত হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো যে, তা কখন হবে? হুযুর পাক (সাঃ) বললেন, তোমাদের ভেতর যখন কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে। আমীর উমরাহ বেড়ে যাবে। বিশ্বাসী বলতে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জাগতিক উৎকর্ষের লোভে মানুষ পরকালীন আমলে লিপ্ত হবে আর গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইল্‌ম হাসিল করবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমাদের ভেতর আমি এসবের লক্ষণ দেখছি।

মৃতের মূল্যায়ন

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ان البر بالميت ان يصل
من كان يصل اباه ـ

মৃতের সাথে সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি হল এই যে, মৃত পিতার সাথে যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করত মৃতের সন্তান যেন তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে।

ক্ষমতাসীনের দায়িত্ব

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সমীপে এক ব্যক্তি তার মদ্যপায়ী ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে আসলে তিনি যুবকটির নেশা দূর হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এর পর তিনি একখানা বৃক্ষ শাখা হাতে নিয়ে তার পাতাগুলো ছিঁড়ে জল্লাদের হাতে দিলেন। তাকে নির্দেশ দিলেন যে, একে আশিটি আঘাত করবে। লক্ষ্য রাখবে যাতে তোমার হাত স্বাভাবিক উঁচুতে থাকে। গায়ের খাটাবার চেষ্টা করবে না। সুতরাং জল্লাদ তার নির্দেশানুসারে বেত্রাঘাত করতে লাগল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) স্বয়ং একের পর এক গুণে যেতে লাগলেন। আশিটি পূর্ণ হলে তিনি জল্লাদকে ক্ষান্ত হতে

বললেন। বিচার শেষ যুবকটির চাচা আরয করল যে, হে আবু আবদুর রহমান। এই যুবকটি ব্যতীত আমাদের আর কোন সন্তান নেই। একথা শুনে তিনি বললেন :

شر العم و الی الیتیم انت کنت و الله ما احسنت ادبه صغیرا ولا سترتره کبیرا ۔

'তুমি অতি নিকৃষ্ট চাচা। ইয়াতীমের অযোগ্য মুরুব্বী। আল্লাহ্‌র কসম তুমি একে শিশুকালে আদব শিক্ষা দাওনি যার ফলে সে এ নোংরামীর শিকার হয়েছে। আর তার যৌবনকালীন এ পদস্খলনকে গোপন রাখবার মত এতটুকু উদারতাও তুমি দেখাতে পারলে না। তুমিই তাকে উচ্ছৃংখল বানিয়েছ আর তুমিই আজ তাকে লাঞ্ছিত করলে। এর পর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম এক চোরের উপর শরয়ী কানুন জারী হয়েছিল। চোরকে ধরে রাসূল করীম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির করা হল। হুযুর (সাঃ) তার সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে যখন তার হাত কর্তনের নির্দেশ দিলেন তখন সে অত্যন্ত নৈরাশ মাখা চোখে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে রইল। কতক সাহাবার মনে এর খুবই প্রতিক্রিয়া হল। তারা দয়ামদির কণ্ঠে রাসূল করীম (সাঃ)-এর কাছে ক্ষমার সুপারিশ জানালো। তখন তিনি ইরশাদ করেছিলেন :

افلا کان هذا قبل ان تاتونی به فان الا مام اذا انتهی الیه حد فلیس لاحد ان یغلطه ۔

"আমার কাছে আনবার পূর্বে কেন তোমরা এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করলে না। বিচারকের কাছে যখন কোন মুকদ্দমা পেশ করা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণে অভিযুক্তের দোষ প্রকাশ পায় তখন যথাযথ শাস্তি বিধানই তার কর্তব্য। এখানে কারুর কোন আপত্তি তোলবার অবকাশ থাকে না।

সার্বক্ষণিক সুহবত-ধন্য সাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ

রাসূল করীম (সাঃ)-এর জীবন চরিত বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة ۔

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর মাঝে তোমাদের জন্য সুমহান আদর্শ বা উওসয়া রয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথের অভিযাত্রীকে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। কেউ যদি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে চায় তবে তার জন্য মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্য প্রদর্শন অপরিহার্য। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

من يطع الرسول فقد اطاع الله -

যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর ইতাআত করে নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্‌রই ইতাআত করল। এ জন্যেই সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সর্বকালে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে ভালবাসা প্রগাঢ় সীমাহীন। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) প্রেম ও ভালবাসার নজীর পেশ করতে মানবেতিহাস ব্যর্থ হয়েছে। যুগ যুগান্তর ধরে মুসলিম উম্মাহ্ তাদের নবীর সাথে ইশকের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে তা অনুপম অতুলনীয়। পর্যায়ক্রমে তারা তাদের প্রিয় নবীর জীবনালেখ্য, তার জীবনের প্রতিটি ছন্দ পতন, ক্ষণ ও লহমার প্রতিটি নকল হরকত যেভাবে সংরক্ষণ করে আসছে কোথায় এর তুলনা ?

ক্ষেত্র বিশেষে নবী জীবনের আমল ও বাক্যমালায় যে সব পর পর বিরোধ এবং ইখতিলাফ পরিদৃষ্ট হয় তাও সাহাবায়ে কিরামের অমনযোগিতা নয় বরং গভীর অনুরাগের প্রোজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। স্থান-কাল বিবেধের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত সকল ইখতিলাফ তা মৌলিক হোক বা শাখাগত সব কিছুই সাহাবায়ে কিরাম পরিপূর্ণভাবে হিফাজত করেছেন।

প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে মহানবী (সাঃ)-এর সকল কর্ম ও বাণী ভাব ও ভঙ্গী এবং স্বাভাবিক অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ডকে সমান্তরালের সাথে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তাই ঐশ্বরিক শৃংখলা বিধান ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন জন মহানবী (সাঃ)-এর বিভিন্ন দিক বুকের মণিকোঠায় আগলে রেখেছে। এক এক সাহাবী তাঁর এক একটি কথা ও কাজকে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করেছেন। একজনে হয়ত কোন এক কথা বিস্মৃত হয়েছেন কিন্তু দ্বিতীয় আরেকজন তা মানস দর্পণে জাজ্বল্যমান করে রেখেছেন। এভাবে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ-জীবনাদর্শ সাহাবায়ে কিরামের জামাআত সম্মিলিভাবে সংরক্ষণ করে আমাদের উপর যে ইহসানের বোঝা চাপিয়েছেন এ ঋণ কোন দিন শোধ হবে না।

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবন চরিতের কোন ক্ষেত্র উম্মতে দৃষ্টির

অগোচরে নেই। বিভিন্ন মুহূর্তে তিনি যা কিছু বলেছেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সবকিছুই সাহাবায়ে কিরামের সূত্র ধরে উম্মতের পূর্ব-সূরিগণ উত্তরসূরিদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। পরবর্তিগণ অবশ্য তাঁর আমল ও কালামের ভিতর পর্যালোচনা করে কেউ এক প্রান্তে অধিক জোর দিয়েছেন এবং অন্য কতক জন অন্য প্রান্তের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উত্তরকালে ইহাই ইখতিলাফী মাসআলার রূপ ধারণ করেছে। এসব মাসআলা ইবাদত-আখলাক, অর্থনীতি ও সমাজনীতি তথা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, যুদ্ধনীতি ও সন্ধী-পদ্ধতি কোন কিছুই বাদ পড়েনি এসব মাসআলা থেকে।

ঈমানের পর ইসলামী জিন্দেগীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল সালাত। এর ভিতরও আমরা যে সব ইখতিলাফ বা মতভেদ দেখতে পাই তাও মূলত সাহাবায়ে কিরামের সূত্র ধরেই এগিয়ে এসেছে। নামাযে রফ্‌ঈ ইয়াদাইন অর্থাৎ হস্তদ্বয় উত্তোলন করা সুন্নত। প্রশ্ন হল যে ইহা শুধু তাকবীরে তাহরীমার সাথেই সীমিত? নাকি নামাযের প্রতিটি উঠা বসার সাথে হস্তত্তোলন উত্তম? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত বারা'বিন আযিব (রাঃ) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূল পাক (সাঃ) একমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময়ই রফ্‌ঈ ইয়াদাইন করতেন অন্যত্র নয়। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে রুকু সিজদায় যাওয়া আসার সাথে রফ্‌ঈ ইয়াদাইন এর কথা বর্ণিত রয়েছে। কোন কোন সাহাবী তো একথাও বর্ণনা করেছেন যে রাসূল পাক (সাঃ) সালামের সময়ও হস্ত উত্তোলন করেছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে দু'ধরনের রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। (১) গোটা সালাতের ভেতর রাসূল করীম (সাঃ) মাত্র একবার অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময়ই রফঈ ইয়াদাইন করতেন। ইমাম মালিক (রাঃ) এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। (২) রুকুতে যাওয়া আসার সময়ও হস্তত্তোলন করতেন। এই দ্বিতীয় রিওয়ায়েতটি হযরত ইবনে উমর থেকে বিখ্যাত তাবেঈ সালিম এবং তার থেকে ইমাম জুহরী বর্ণনা করেছেন। মতভেদী মাসআলা হিসাবে ভারতবর্ষে এ মাসআলাটি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শাফেঈ মাযহাবের অনুসারিগণ রুকুর সাথে রফ্‌ঈ ইয়াদাইনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তারা তাদের সপক্ষে উল্লিখিত সনদটি (ইবনে উমর

থেকে সালিম এবং তার থেকে ইমাম জুহরী) উপস্থাপন করে থাকেন। তারা দাবী করেন যে অন্যান্য মাযহাবের কাছে "সিলসিলাতুজ্জাহাবের" এই সনদটির মত শক্তিশালী কোন সনদ নেই। হানাফী ও মালিকী মাযহাবের অনুসারিগণ এর উত্তরে বলে থাকেন যে, সনদটি যদিও খুবই শক্তিশালী কিন্তু এই সনদেই কেবল তাকবীরে তাহরীমার সাথে রফঈ ইয়াদাইনের কথাও বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং اذا تعا رضا تساقطا অর্থাৎ একই সনদে বর্ণিত মাসআলা দুটির পরস্পর বৈপরিত্যের ফলে হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী উভয় রিওয়ায়েত পরিত্যক্ত হবে। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত বারা'বিন আযিব থেকে স্ববিরোধী কোন রিওয়ায়েত নেই। এ ছাড়া রুকুর সাথে রফঈ ইয়াদাইনের অন্য কোন সনদও তাদের সনদের সমপর্যায়ের নয়।

মাসআলাটিকে পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরবার জন্যে আমরা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি পর্যালোচনা করব।

আবু দাউদ শরীফের ১ম খন্ডে ১১৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে

قال عبد الله بن مسعود الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فلم ارفع يديه الامرة و احدة -

"হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নামায পড়ে দেখাব? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং মাত্র একবারই তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।

তিরমিযী শরীফের ১ম খন্ডে ৩৫ পৃষ্ঠায়ও এ হাদীসটি প্রণিধিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) ইহাকে হাসান বলেছেন। এমনিভাবে নাসাঈ মুসনাদে আহমদ এবং মুয়াত্তা গ্রন্থেও এ হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে। অবিকল এ রিওয়ায়েতটিই বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর উভয় রিওয়ায়েতের রাবীও অভিন্ন। সুতরাং এক রিওয়ায়েতকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিবার কোন প্রশ্নই আসে না। মুল্লা আবেদ সিন্দী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ আলমাওহিবুল্লতীফায় বলেন:

قلت و قد و رد فى معنى حديث ابن مسعود ايضا ما اخرجه البيهقى فى خلافيات ته من حديث مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر ان

رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه اذا افتتح في الصلاة ثم لا يعود قال الحاكم و البيهقى حديث ابن عمر هذا باطل موضوع لا يجوز ان يذكر الا على سبيل التعجب او القدح فيه فعدودنا بالاسانيد الزهرة عن مالك خلاف هذا ـ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইহা ইমাম বায়হাকী তার খিলাফিয়্যাতের ভেতর এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মালেক জুহরী থেকে তিনি সালিম থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক (সাঃ) একমাত্র নামাযের প্রারম্ভ ছাড়া কখনো রফ্‌ঈ ইয়াদাইন করতেন না। অবশ্য ইমাম হাকিম এবং বায়হাকী বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর এ হাদীসটি অলীক ও বানোয়াট এ হাদীসটি প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তবে হ্যাঁ বিস্ময় প্রকাশ বা যাচাই করবার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদে আমরা ইমাম মালেক (রঃ) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা পেয়েছি।

قلت تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكم و انما يثبت ببيان وجوه الطعن و حديث ابن عمر الذى رواه البيهقى فى خلافيا به رجاله رجال الصحيح فما ارى له بعد ذالك ـ

ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করার পর আবেদ সিন্দী (রঃ) বলেন যে "মুখে মুখে কোন হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করলেই তা দুর্বল হয়ে যায় না। বরং এজন্য যথাযোগ্য কারণ পেশ করা অপরিহার্য। ইমাম বায়হাকী (রঃ) তার খিলাফিয়্যাতে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। তাদের বর্ণিত হাদীস বুখারী ও মুসলিমে প্রণিধিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করবার কোন হেতুই থাকতে পারে না।

اللهم الا ان يكون الراوى عن مالك مطعونا لكن الاصل العدم فهذا الحديث عندى صحيح لا محالة و غاية ما يقال فيه ان ابن عمر رأى النبى صلى الله عليه وسلم حينما يرفع فاخبر عن تلك الحالة و احيانا لا يرفع و اخبر عن تلك الحالة و ليس فى كل من حديثه ما يفيد الدوام ولا ستمرار على شئى معين منهما و لفظ كان لا تفيد الدوام

و الا ستمرار لا على سبيل الغالب فقد ورد انه صلى الله عليه و سلم كان يقف عند الصخرات السود بعرفة و لم يحج بعد الهجرة الا حجة الوداع و لا سبيل الى تضعيفه فضلا عن وضعه و الله اعلم ـ

এরপর আবেদ সিন্দী (রঃ) বলেন, যে হতে পারে যে ইমাম মালেক (রঃ)-এর নিম্নস্থ রাবী সমালোচনাযোগ্য। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত অঙ্গুলী নির্দেশ করবার মত কোন দুর্বল রাবীর সন্ধান পাননি। সুতরাং নিঃসন্দেহে হাদীসটি নির্ভুল ও সত্য। আধিক্যের সাথে এতটুকু বলা যেতে পারে যে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) রাসূলে পাক (সাঃ)-এর রফঈ ইয়াদাইন এবং হস্ত-উত্তোলন থেকে বিরত থাকা উভয় অবস্থাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং উভয় অবস্থাকেই রিওয়ায়েত করেছেন। উভয় রিওয়ায়েতের ভেতর এমন কোন শব্দ নেই যাদ্বারা বিশেষ একটির উপর অধ্যবসায় প্রমাণ হয়। كان ক্রিয়াপদটি যদিও অধ্যবসায় জনিত কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে নয়। প্রমাণ স্বরূপ প্রণিধানযোগ্য যে এক হাদীসে বর্ণিত আছে—كان يقف عند الصخرات অর্থাৎ রাসূলে পাক (সাঃ) আরাফাতের মাঠে কালো পাথরের কিনারায় বসতেন। এখানে كان ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ হিজরতের পর তিনি জীবনে মাত্র একবারই হজ্জ করেছেন এদ্বারা প্রমাণিত হয় كان শব্দটি সর্বক্ষেত্রে অধ্যবসায়কে বুঝায় না। তদ্রূপ, রফ্ঈ ইয়াদাইন সম্পর্কীয় হাদীসে যে كان ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয়েছে তাও অধ্যবসায়ের ইঙ্গিত করে না। সুতরাং রফ্ঈ ইয়াদাইন করা সম্পর্কীয় রিওয়ায়েতকে অধ্যবসায় জনিত আমলের স্বপক্ষে নিয়ে রফ্ঈ ইয়াদাইন না করা সম্পর্কীয় হাদীসকে মিথ্যাতো দূরের কথা দুর্বল সাব্যস্ত করাও নেহায়েত অন্যায়।

و استدل لابى حنيفة بحديث لا بأس بسنده ذكر البيهقى فى الخلافيات من حديث محمد بن غالب حدثنا احمد بن البرائى ثنا عبد الله بن عون الخزاز ثنا مالك عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه اذا فتح الصلاة ثم لا يعود قال البيهقى و لما لم ير الحاكم ما يرفعه به قال هذا باطل فقد روينا بالاسانيد الصحاح عن مالك خلاف هذا ـ

আল্লামা মুগলতাঈ ইবনে মাজা'র ভাষ্যগ্রন্থে রফ্ঈ ইয়াদাইনের পর্যালোচনায় বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাবের স্বপক্ষে এমন

একটি হাদীস পেশ করা হয় যার সনদে কোন ত্রুটি নেই। ইমাম বায়হাকী হাদীসটি তার খিলাফিয়্যাতের ভেতর এইভাবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ বিন গালিব আহমদ বারাঈ থেকে তিনি আবদুল্লাহ্ বিন আউন আল খারূরাজের থেকে, তিনি ইমাম মালিক থেকে, ইমাম মালিক ইমাম জুহরী থেকে, ইমাম জুহরী সালিম থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূল করীম (সাঃ) নামাযের প্রারম্ভে রফ্'ঈ ইয়াদাইন করতেন, অন্যত্র নয়। হাকীম (রঃ) এ হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করার কোন উল্লেখযোগ্য কারণ না পেয়ে দাবী করে বসলেন যে হাদীসটি মিথ্যা, কেননা নির্ভরযোগ্য সনদে আমরা ইমাম মালিক (রঃ) থেকে এর বিপরীত রিওয়ায়েত পেয়েছি।[১]

তালখীছুল হাবীর গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) বলেন যে হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর এ হাদীসটি পরিবর্তিত ও বানোয়াট। কিন্তু হাফেজ সাহেবের এ উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তিনি প্রকৃত পক্ষে হাদীসটির মৌলিক কোন ত্রুটি খুঁজে পান নি। কেবল নিজ মানসিকতা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কেননা হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) যেহেতু হাফেজ হাদীসের আক্ষরিক ও সনদগত সবকিছুই তার আদ্যপ্রান্ত জানা। সেহেতু বাস্তবিক পক্ষে হাদীসটি

---

১. আল্লামা জুরকানী বলেন যে সিলসিলাতুয্যাহাবের সনদে বুখারী ও মুসলিম শরীফে রফ্'ঈ ইয়াদাইন করা সম্পর্কীয় ইবনে উমর (রাঃ)-এর যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম মালিক (রঃ) ইহা কেন বর্জন করেছেন এর কারণ হিসাবে আছীলি বলেন যে, ইবনে উমর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ শিষ্য না'ফে (রঃ)-এর বর্ণনা মতে হাদীসটি মওকুফ অর্থাৎ ইহা ইবনে উমর (রাঃ)-এর নিজস্ব মত। ইহা রাসূল করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) শিষ্যবৃন্দের মধ্যে না'ফে (রঃ) শীর্ষস্থানীয়। তাঁর দ্বিতীয় অন্যতম শিষ্য হল স্বীয় পুত্র সালিম। না'ফে' ও সালিমের মধ্যে যে বর্ণনা চতুষ্টয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে রফ্'ঈ ইয়াদাইনের এ বর্ণনাটি তার অন্যতম। এর দ্বিতীয়টি হল من باع عبدا و له مال فما له للبائع —যে ব্যক্তি কোন গোলাম বিক্রয় করে তবে যে গোলামের যদি কোন সম্পদ থাকে তবে তা বিক্রেতার প্রাপ্য। তৃতীয়টি হল الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة মানুষ হল ঐ উটের মত যার ভিতর শতকরা একটিও সাওয়ারী পাওয়া যায় না চতুর্থটি হল فى ما سقت السماء و العيون العشر আকাশ ও নালা দ্বারা যে জমিন প্রবাহিত হয় তাতে উশর আছে। সালিম এ রিওয়ায়েত চতুষ্টয়কে মারফূ অর্থাৎ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বাণী হিসাবে উল্লেখ করেন কিন্তু নাফে এগুলোকে মওকুফ বলেছেন। না'ফে ও সালিমের পরস্পর মতানৈক্যের কারণেই রফ্'ঈ ইয়াদাইন করা সম্পর্কীয় হযরত ইবনে উমরের রিওয়ায়েত যে ইমাম মালিক (রঃ) বর্জন করেছেন। ইমাম নববী (রঃ) বলেন যে هو اشهر الروايات عن مالك অর্থাৎ যথার্থ ইমাম মালিক (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাযের উঠাবসা কোথাও হস্তত্তোলনের কথা আমি পাইনি। নাইলুল ফিরকাদাইন ১০১ পৃষ্ঠা।

দুর্বল হলে তিনি রাবীর দোষ-ত্রুটি খোলাখুলি বর্ণনা করতেন। সুতরাং কোন রাবী সম্পর্কে তার মুখাব্যাদান না করাই প্রমাণ করে যে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য। মূলত তিনি প্রশ্ন উত্থাপনের কোন সুযোগ না পেয়েই সাধারণভাবে বলে দিয়েছেন যে হাদীসটি বানোয়াট ও পরিবর্তিত। কে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন বা কার মিথ্যা হাদীস তৈরীর অভ্যাস আছে সে সবের নিকটেও যান নি। কেননা কারো সম্পর্কে নির্ভুল অভিজ্ঞান ব্যতীত কোন মন্তব্য করা মুহাদ্দিসের নিকট চরম অন্যায়। ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান বলেন যে, "ইমাম জুহরী যেহেতু হাফেজ সেহেতু প্রত্যেক রাবী সম্পর্কে তিনি আদ্যন্ত অভিজ্ঞ। সুতরাং তিনি যদি কোন সনদে কারুর নাম উল্লেখ না করেন তবে বুঝতে হবে যে সে ব্যক্তির ভেতর কোন না কোন ত্রুটি অবশ্যই আছে। সে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই সনদের ভেতর তার নাম উল্লেখ করা তিনি বৈধ মনে করেন নি। এ নিয়ম হাফেজ ইবনে হাজার আস্‌কালানীর বেলায়ও প্রযোজ্য। এখানেও বলা যেতে পারে যে, ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রফ্‌ঈ ইয়াদাইন না করা সম্পর্কীয় হাদীসটি নিঃসন্দেহে নির্ভুল এবং তা ইবনে হাজারের নিকটও। সনদে উল্লেখিত কোন রাবীর ভেতর উল্লেখযোগ্য কোন ত্রুটি পাননি বলেই তিনি নির্ধারিত কারুর সমালোচনা করার সাহস করেননি। কেউ যদি এ দাবী করে যে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রফঈ ইয়াদাইন করা সম্পর্কীয় রিওয়ায়েতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হওয়াই যদি এর কারণ হিসাবে উত্থাপন করে তবে বলব যে এ নিতান্তই ছেলেমানুষী! কেননা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হলেই যে কোন হাদীস অন্যসব নির্ভরযোগ্য হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন হাদীস তখনই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যখন তার সনদ অধিক শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হবে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসগুলো এজন্যেই নির্ভরযোগ্য যেহেতু এর সনদসমূহ সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং কোন হাদীস যদি বুখারী ও মুসলিমে উল্লিখিত নাও হয় তবুও তার সনদ নির্ভরযোগ্য হলে তা বুখারী-মুসলিমের সমান মর্যাদা পাবে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রফ্‌ঈ ইয়াদাইন করা এবং বর্জন করা উভয় রিওয়াতেই এক ও অভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। সেহেতু একটি আরেকটির উপর প্রাধান্য পেতে পারে না।

বায়হাকীর কিতাবু মা'রিফাতিস্ সুনানিওয়াল আসারে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে :

حدثنا الحاكم ابنا ابوبكر بن مكرم ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا ابو بكر بن عياش عن فصين عن مجاهد قال مارئيت ابن عمر يرفع يديه الا فى اول مايفتتح الصلاة -

"হাকিম বলেন যে, আবু বকর বিন মুকাররম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন যে, আহমদ বিন আব্দিল জাব্বার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আর আহমদ বিন আব্দিল জাব্বার বলেন যে আবু বকর বিন্ আইয়াশ মুঈন থেকে এবং তিনি মুজাহিদ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন্ যে "একমাত্র নামাযের প্রারম্ভ ব্যতীত হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-কে আমি কখনো রফ্‌ঈ ইয়াদাইন করতে দেখিনি।

ইমাম তহাবী স্বীয় হাদীস গ্রন্থ শরহুমায়ানীল আসারে মুজাহিদের এ হাদীস বর্ণনা করবার পর বলেন :

حديث الر يع منسوخ على هذا -

অর্থাৎ এ হাদীস দ্বারা রফ্‌ঈ ইয়াদাইন করা সম্পর্কীয় হাদীস রহিত হয়েছে।

কাজী আবু বকর হাজেমী স্বীয় গ্রন্থ "আল ই'তিবার ফিন্নাসিখি ওয়াল মানসুখ ফীল আসার" এর মধ্যে এক হাদীসকে অন্য হাদীসের উপর তার-জীহ্ বা প্রাধান্য দেবার ৫০টি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন আর এর সব ক'টিই রাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কোন বিশেষ কিতাবে বর্ণিত হলেই যে কোন্ হাদীস শক্তিশালী বা দুর্বল হয়ে যাবে এমন্ কোন নীতির প্রতি তিনি ইঙ্গিতও করেননি।

فدار الامر فى الرواة على اجتهاد العلماء فيهم و كذا فى الشروط حتى ان من اعتبرشرطا و الغاة اخر يكون مارواه الاخر مما ليس فيه ذالك الشرط عنده مكا فيا لمعارضة المشتمل على ذالك الشرط و كذا فيمن ضعف راويا و ثقه الاخر -

আল্লামা ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন্ বিষয়টি রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। তাদের ব্যাপারে পর্যালোচনা করে মুহাদ্দিসগণ স্ব-স্ব বুৎপত্তি অনুযায়ী মতামত ব্যক্ত করেন। শর্তের ব্যাপারটিও এই রকম। এক মুহাদ্দিস হয়ত কোন শর্তকে যথাযোগ্য মনে করেছেন কিন্তু অন্যের কাছে সেটা পরিত্যক্ত। সুতরাং এক মুহাদ্দিস

একটা হাদীসের সমালোচনা করলেই আমরা ইহাকে অন্য মুহাদ্দিসদের বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারি না। এমনিভাবে কোন মুহাদ্দিস যদি এক রাবীকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন এবং অন্য মুহাদ্দিস তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন তবে সেখানেও উল্লেখিত নীতি প্রযোজ্য।

نعم یوجد فی مسند الامام احمد من الاسانید و المتون شئ کثیر مما یوازی کثیر من احادیث مسلم بل و البخاری ایضا و لیست عندهما و لا عند احدهما بل و لم یخرجه احد من اصحاب الکتب الاربعة و هم ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجه و کذالك یوجد فی معجم الطبرانی الکبیر والاوسط و مسند ابی یعلی و البزار و غیر ذالك من المسانید و المعاجم و الفوائد و الاجزاء ما یتمکن المتبحر فی هذا الشان بصحة کثیرة منه بعد النظر فی حال رجاله و سلامته من التعلیل الخ

মুসনাদে আহমদে এমন অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা-বুখারী, মুসলিমের হাদীসের সমপর্যায়ের। অথচ সেগুলো বুখারী, মুসলিম এবং সুনানে আরবাআহ অর্থাৎ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা কোন হাদীস গ্রন্থেই মওজুদ নেই।

এমনিভাবে মু'জামে তবরানী কাবীর, আওসাত, মুসনাদে আবি ইয়ালা, বাজ্জার তথা অন্যান্য মুসনাদ ও মুজাম ফাওয়াইদ ও আজযাহ ইত্যাদি হাদীসের ছোট বড় কিতাবসমূহে এ রকম বহু হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায় যার মতন অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের এবং সনদ অতি নির্ভরযোগ্য। তাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।

و اما ما ادعی ابن الصلاح من ان ما رواه او احدهما فهو مقطوع علی شرطهما من غیرهما ثم ما اشتمل علی شرط احدهما فالحکم لا یجوز التقلید فیه اذ الاصحیة لیست لاشتمال رواتهما علی الشروط التی اعتبروا ما اذا فرض وجود تلك الشروط فی رواة حدیث فی غیر الکتابین افلا یکون الحکم باصحیة ما فی الکتابین عین التحکم ثم حکمهما او احدهما بان الراوی المعین مجتمع تلك الشروط لیس مما یقطع فیه بمطابقة الواقع فیجوزکون الواقع خلافه و قد اخرج مسلم عن کثیر فی کتابه ممن لم یسلم عن غوائل الجرح وکذا فی البخاری جماعة تکلم

فهم فمرار الامر فى الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكذا فى الشروط حتى ان من اعتبر شرطا و الغاه اخر يكون ما رواه الاخر مما ليس فيه ذالك الشرط عنده مكافئا لمعارضه المشتمل على ذالك الشرط وكذا فيمن ضعف روايا او وثقه الاخر نعم تسكن النفس غير المجتهد ومن لم يخبر امر الراوى بنفسه الى ما اجمع عليه الاكثر اما المجتهد فى اعتبار الشروط هذه و الذى خبر الراوى فلا يرجع الا الى راى نفسه ـ

ইমাম নববী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ আত্তাকরীবে বলেন : আর ইবনে সালাহ যে দাবী "করেছেন যে, "বুখারী ও মুসলিম এবং এতদুভয়ের যে কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীস অন্যান্য কিতাবে সন্নিবেশিত হাদীসের তুলনায় অধিক সহীহ্ এরপর যে হাদীস এতদুভয়ের শর্ত মুতাবিক বা একটির শর্ত অনুযায়ী চয়ন করা হয়েছে ইহা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী"। ইহা তার নিছক দাবী মাত্র এর সপক্ষে কোন দলীল নেই। তার এ দাবীর অনুসরণ কোন ক্রমেই জায়েয হবে না। কেননা রাবীর নির্ভরযোগ্যতার জন্যে তারা যেসব শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন রাবীর ভেতর সে সব বর্তমান থাকা হইল হাদীস সহীহ্ হওয়ার মাপকাঠী। সুতরাং তাদের নির্ধারিত শর্তাবলী যদি তাদের সন্নিবেশিত হাদীসের বাইরে পাওয়া যায় তবে সেগুলো তাদের বর্ণিত হাদীসের সমমর্যাদা হবে না কেন? সর্বাধিক সহীহ্ হওয়ার জন্য হাদীসটি তাদের কিতাবেই পাওয়া যেতে হবে এর কি যৌক্তিকতা আছে? অধিকন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বা তাদের কোন একজনের এ সিদ্ধান্ত যে অমুক রাবীর ভেতর প্রয়োজনীয় সকল শর্তাবলী বর্তমান আছে ইহাও তাদের নিজ নিজ ইজতিহাদের উপর নির্ভর করেই সাধিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তো এর বিপরীতও হতে পারে। মুসলিম কেন বুখারী শরীফেও তো এমন হাদীস বর্তমান রয়েছে যার সনদের উপর উলামায়ে কিরাম যথেষ্ঠ সমালোচনা করেছেন। মূলত রাবীর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারটি উলামায়ে কিরামের ইজতিহাদাধীন। এমনকি শর্ত নির্ধারণের বিষয়টিও। কোন মুহাদ্দিস হয়ত একটি শর্ত অত্যাবশকীয় বিবেচনা করেছেন কিন্তু অন্য মুহাদ্দিস সেটিকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। শর্তটি যার কাছে অত্যাবশকীয় কোন হাদীসের ভেতর ইহা বর্তমান না থাকলে হাদীসটি তার কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু যার মতে শর্তটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় তিনি সে হাদীসটিকে সহীহ্ এবং হুজ্জতের

যোগ্য মনে করবেন। রাবীকে নির্ভরযোগ্য বা দুর্বল সাব্যস্ত করবার ব্যাপারটিও অনুরূপ। হ্যাঁ তবে মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণের ব্যাপারে ইবনে সালাহ্‌র দাবী নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য। কিন্তু যার ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতা রয়েছে—বিষয়টি সম্পূর্ণ তার ইজতিহাদের অধীন।

ইবনে সালাহ্ এর দাবীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আমীরে হাজ্জ আত্তাকরীর ওয়াত্তাহ্‌বীর গ্রন্থে বলেন :

تلقى الأمة لجميع ما في كتابيهما مقبول اما رواتهما فلما ذكر المصنف و اما المتون احاديثهما الا انه لم يقع الاجماع على العمل بمضمونها و لا على تقديمهما على معارضهما-

উম্মত্ বুখারী ও মুসলিমের সকল রিওয়ায়েত কবুল করেছেন একথা মেনে নেয়া যায় না। কেননা ইহার বর্ণনাকারিগণ সকলেই যে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য একথা ইবনে হুমাম অস্বীকার করেছেন। আর মতনের ব্যাপার হল যে এর বিষয় বস্তুতে আমল করবার উপর ইজমা'বা ঐকমত্য অনুষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া বুখারী ও মুসলিমের সব হাদীস কে তার বিপরীত হাদীস-সমূহের উপর প্রাধান্য দিবার ব্যাপারে সবাই একমত নন।

যদিও ইবনে সালাহ্ দাবী করেছেন যে বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিত-ভাবে যে হাদীস সংগৃহিত হয়েছে ইহাই হাদীসে সহীহ্‌র সর্বোচ্চস্তরে স্থান পেয়েছে। যে সব হাদীস শুধু বুখারীতে উল্লেখিত হয়েছে ইহা দ্বিতীয় স্তরে এবং যাহা শুধু মুসলিমে উল্লিখিত হয়েছে ইহা তৃতীয় স্তরে স্থান পেয়েছে। সহীহ্ হাদীসের চতুর্থ স্তরে হল ঐসব হাদীস যাহা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সংগৃহীত হয়েছে। এরপর যাহা বুখারীর শর্তানুযায়ী এবং যাহা শুধু মুসলিমের শর্ত মুতাবিক তাহা ৬ষ্ঠ স্তরের সহীহ্ হাদীস বলে বিবেচিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তার এ দাবীর সপক্ষে কোন দলীল নেই। তার পূর্বে কেউ এমন দাবী করেননি আর কেউ তার সাথে একমতও হননি।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উপর আপত্তিত প্রশ্নের পর্যালোচনা ও তার জবাব

পূর্বোল্লিখিত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস

الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فلم يرفع يديه الا اول مرة -

"আমি কি তোমাদেরকে রাসূল করীম (সাঃ)-এর নামায পড়ে দেখাব? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র রফঈ ইয়াদাইন করলেন না।" এ প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করতে গিয়ে হাফেজ আবূ বকর আহমদ বিন ইসহাক বিন আইউব নিশাপুরী[১] বলেন যে, মূলত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলে পাক (সাঃ) এর রফঈ ইয়াদাইনের কথা ভুলে গেছেন। আর তাঁর ভুল কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কেননা আরো কয়েকটি বিষয়ে তাঁর ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে হাফেজ আবূ বকর ছয়টি বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি দাবী করেন যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) উল্লেখিত ছয় ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা ভুলে গেছেন। আমরা এখানে তাঁর দাবীর যথার্থতা পর্যালোচনা করব। মূলত রফঈ ইয়াদাইনের চুলচেরা তাহকীক আমার উদ্দেশ্য নয়। ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উপর আপতিত প্রশ্নের পর্যালোচনা ও জবাব দেয়াই এখানে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

হাফেজ আবূ বকর আহমদ বিন ইসহাক নিশাপুরী তার বাক্যে ব্যবহৃত নিসইয়ান বা "ভুল" শব্দটি দ্বারা যে অর্থই বুঝাতে চাক তার কোনটাই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বেলায় প্রযোজ্য নয়। ভুলে যাওয়া বা মনে না থাকাও নিসইয়ানের এক অর্থ হতে পারে। যেমন আল-কুরআনে হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে فنسى و لم نجد له عزما "অতঃপর

---

১. হাফেজ আহমদ ইবনে ইসহাক নিশাপুরী হিজরী ২৮৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আল্লামা সুবকী তাঁর খুব প্রশংসা করেছেন। মুক্তাদীর ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে তার মত ছিল যে, যে ব্যক্তি রুকূ' পেয়েছে কিন্তু সূরা ফাতিহা পড়ার মত সময় পায়নি তবে তার ঐ রাকআত গণ্য হবে না। আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে প্রথমত মাসআলার এরূপ সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন, অবশ্য পরে তিনি ইহা থেকে মতান্তর করেছেন। (আওনুল মা'বুদ ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) কুকুরের লেহ্য সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল যে পানি দিয়ে ধৌত করার পর শেষে মাটি দিয়ে মর্দিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা সুন্দর ঘটনা আছে। একদা তিনি কোথাও আহার পড়েছিলেন। এতে তার কাবায় এমন কিছু ক্লেদ লেগে যায় যাতে কুকুর পদচারণা করেছিল। তিনি দাসীকে তা ধৌত করতঃ সব শেষে মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করবার নির্দেশ দেন। দাসী বিস্ময়ের সাথে বলল, আপনার কাবার এ কাঁধায় কি মাটি নেই, তখন হাফেজ আবূ বকর ন্যায়ের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি বললেন احسنت انت افقه منى যথার্থ বলেছ। তুমি আমার চেয়ে বড় ফিকাহবিদ। —তাবাকাতুশ' শাফেঈয়্যাহ কৃত আল্লামা সুবকী ১ম খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা।

আদম তা ভুলে গেল, আর আমরা তার মাঝে দৃঢ়ব্রত পেলাম না" এই নিসইয়ান উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের ভেতরও এসেছে। কিন্তু যেসব মাসআলায় হাফেজ আবু বকর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্তির দাবী করেছেন সে সব মাসআলায় আমরা যদি ন্যায়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে তার এ দাবীর অসারতা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর মন্তব্য ও প্রশংসা বাণী যার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সে কখনও তার এ দাবীর যথার্থতা বিলক্ষণ মেনে নিতে পারবে না। রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

اقتدوا باللذين من بعدى من اصحابى ابو بكر و عمر و اهتدوا بهدى عمار و تمسكوا بعهد ابن ام عبد۔

"আমার পরে তোমরা আমার সাহাবাদের মধ্যে আবু বকর ও উমরের অনুসরণ কর। আর আম্মারের দিক নির্দেশনা গ্রহণ কর এবং ইবনে উম্মে আব্দ (ইবনে মাসউদ (রাঃ))-এর সিদ্ধান্ত মজবুত ভাবে ধারণ কর।[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে

ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه۔

ইবনে মাসউদ যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করে তা বিশ্বাস কর।[২] তিরমিযীর অন্য রিওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বলেন, একদিন হযরত হুজায়ফা (রাঃ) আমাদের কাছে আগমন করেন। আমরা তার কাছে আরয করলাম ঃ

حدثنا باقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه و سلم هديا ودلا و سمتا فنأخذ عنه و نسمع منه قال كان اقرب الناس هديا ودلا و سمتا برسول الله صلى الله عليه و سلم ابن مسعود حتى يتوارى منا فى بيته و لقد علم المحفوظون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ابن ام عبد هو من اقربهم الى الله زلفى۔

আমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বাতলিয়ে দিন যিনি স্বভাব-চরিত্র ও চলন ভঙ্গীতে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর সর্বাধিক নিকটতম। তবে আমরা তার আদর্শ গ্রহণ করব এবং তাঁর কাছ থেকে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীস শ্রবণ

১. তিরমিযী ২য় খণ্ড ২২৯ পৃঃ।
২. ঐ ,,

করব। হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেছেন বর্তমানে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর স্বভাব চরিত্রের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল ব্যক্তিত্ব হল ইবনে মাসউদ। যতক্ষণ না সে গৃহাভ্যন্তরে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। (অর্থাৎ তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাত আর আমাদের জানা নেই। কিন্তু যতদূর জেনেছি তাতে তিনিই জীবিত সাহাবাদের মধ্যে সর্বোত্তম) রাসূল করীম (সাঃ)-এর মাহফুজ বা সংরক্ষিত সাহাবাগণ অবশ্যই জানেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলামের ৬ষ্ঠতম ব্যক্তি। পূর্ণ বিশটি বছর তিনি নবী (সাঃ) সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। রাসূল করীম (সাঃ)-এর নবুওত লাভের পর তিরোধান পর্যন্ত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কখনও তার সাহ-চর্য ত্যাগ করে দূরে যান নি। নির্জনতা ও লোক সমাবেশে সর্বদা তিনি রাসূল পাক (সাঃ)-এর সুহবতে থাকবার অনুমতি লাভে ধন্য হয়েছিলেন। বহিরাগত সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে এবং তাঁর আম্মাকে নবী (সাঃ) পরিবারেরই সদস্য মনে করতেন। এতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব তাঁর সম্পর্কে এমনতর ভ্রান্তির ধারণাপোষণ জুলুম নয় তো কি?

বিদ্বান ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে সঠিকভাবে ওয়াকিফহাল হতে না পারেন সেক্ষেত্রেও সম্মানার্থে 'নিসইয়ান' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে অজ্ঞতার অভিযোগ করা কোন ক্রমেই সমীচীন নয়। রাসূল পাক (সাঃ) তার সম্পর্কে ইরশাদ করেন: انك لغلام معلم নিশ্চয়ই তুমি মহাপণ্ডিত শিক্ষাদাতা ما اقرأكم ابن مسعود فاقرؤا ইবনে মাসউদ তোমাদের সম্মুখে যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে তোমরা সেভাবে তিলাওয়াত কর।[১] হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে ইসলামের গভীর কূপ বলে আখ্যায়িত করেন। কূফাবাসীদেরকে সম্বোধন করে তিনি লেখেন, নিজস্ব প্রয়োজনকে দাবিয়ে রেখে আমি তোমাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিলাম যার ফলে আমি ইবনে মাসউদকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি। এমন দিকপাল পণ্ডিত সম্পর্কে অজ্ঞতার ইলজাম দেয়ার কোন অবকাশ আছে কি?

একথা তো সর্বজনবিদিত যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঐ সব প্রথম-সারির সাহাবাদেরই একজন রাসূল পাক (সাঃ) যাহাদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন যে, সমঝদার ও বিচক্ষণরা যেন নামাযে আমার নিকটে দাঁড়ায়। এ কেবল রাসূল কারীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই নয়, তাঁর ইন্তিকালের পর

১. তিরমিজী ২য় ২২২ পৃঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁদের পিছনে প্রথম সারিতেই নামায আদায় করতেন। কেবল সতর রাকআত ফরয নামায নয় বরং রাসূল পাক (সাঃ) ও শায়খাইন (রাঃ) (হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)) দৈনিক যেসব নফল নামায আদায় করতেন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অধ্যবসায়ের সাথে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং নামাযের মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ের তাবৎ জ্ঞান হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক আর কার হতে পারে? তিনিই যদি নামাযের মাসআলায় এভাবে ভুলের (?) পরিচয় দেন তবে নামাযের পরিচ্ছন্ন রূপ কার কাছে পাওয়া যাবে? হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হযরত হুজায়ফা (রাঃ)-সহ জমহুর সাহাবায়ে কিরাম যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইলমের উত্তুঙ্গ পর্বত শৃঙ্গ হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) যিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইনতিকাল করেন—লোকেরা যখন তার ইন্তেকালের সময় পরবর্তী উস্তাদ নির্বাচনের ব্যাপারে অসিয়তের দরখাস্ত করেন তখন তিনি বলেন যে, তোমরা আমায় বসিয়ে দাও। লোকেরা তাকে উপবিষ্ট করলে তিনি বলেন :

العلم و الايمان مكانهما فمن ابتغاهما وجدهما التمسوا العلم عند اربعة عند عويمر ابى الدرداء و عند سلمان الفارسى و عند عبد الله ابن مسعود و عبد الله ابن سلام -

ইলম ও ঈমানের একটা কেন্দ্রস্থল থাকে সেখান থেকে উহা আহরণ করতে হয়। যারা এর সন্ধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তারা এগুলো ঠিকই পেয়ে যায়। তোমরা চার ব্যক্তির থেকে ইলম হাসিল কর। ১. আবুদ্দারদা ২. সালমান ফারসী ৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ৪. আবদুল্লাহ্ বিন সালাম।[১]

তার সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন ফতহুলবারী গ্রন্থে বলেন :

وكان من العلماء الصحابة و ممن اشتهر علمه بكثرة اصحابه و الاخذين عنه -

হযরত ইবনে মাসউদ বিদ্বান সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। শিষ্য ও

১. মুসনাদে আহমদ ৫ম খণ্ড ২৪৩ পৃঃ

হাদীস গ্রহণকারীদের আধিক্যের প্রেক্ষিতে যারা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ তাদের অগ্রগণ্য।[১]

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اذا اشتدة فلا زمته لاجل هذه الامور ينبغي ان يكون هنده من العلم
ما يستغني طالبه عن غيره -

তিনি যেহেতু অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সাথে রাসূল করীম (সাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তাই তিনি এত অধিক ইল্‌মের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তার শিষ্যবৃন্দ অন্য কারুর ইলমের মুখাপেক্ষী ছিল না।

এক ব্যক্তি হযরত ফারূকে আজম (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করল যে কূফায় এক ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীমত কুরআনুল করীমের তাফসীর করে একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) গোস্বায় ফেটে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ অভি যুক্তকে ডেকে তিনি শাস্তি দেবার মনস্থ করলেন। কিন্তু তার নাম জিজ্ঞাসান্তে লোকটি যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করল তখন খলীফাতুল মুসলিমীনের রাগ পড়ে গেল। তখন অত্যন্ত মর্যাদার সাথে তিনি ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ইলমের প্রশংসা করলেন এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে নিজের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিলেন। জানি না যে এতবড় জলীলুল কদর ও মহিমান্বিত সাহাবীর উপর ভ্রান্তির অভিযোগ কতটুকু বৈধ হবে অধিকন্তু তাও নামায প্রসঙ্গে।

পর্যালোচনা

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে হাফেজ আবু বকর নিশাপুরীর সকল অভিযোগসমূহ আমরা এক জায়গায় সন্নিবেশিত করছি। এরপরে আমরা তার জবাব দেবার প্রয়াস পাব।

১. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুরআনুল করীমের ভেতরে ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। হাফেজ নিশাপুরী বলেন ঃ

وليس في نسيان ابن مسعود لذالك ما يستغرب قد نسي ابن مسعود
من القران ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذ تان ونسي
ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق ونسي كيف قيام الا ثنين خلف الامام

১. ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ২০ পৃঃ

و نسی مالم یختلف العلماء فیه ان النبی صلی الله علیه وسلم صلی الصبح یوم النحر فی وقتها و نسی کیفیة جمع النبی صلی الله علیه وسلم بعرفة و نسی و مالم یختلف العلماء فیه من وضع المرفق و الساعد علی الارض فی السجود و نسی کیف کان یقرأ النبی صلی الله علیه وسلم و ما خلق الذکر و الانثی ـ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর থেকে এরূপ ভুল সংগঠিত হওয়া কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কেননা তিনি কুরআনের এ রকম আয়াতও বিস্মৃত হয়েছেন যা কুরআনের আয়াত হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের কোন মতভেদ নেই। আর তা হল সূরা নাস ও সূরা ফালাক। (২) উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতানুসারে রুকুর তাতবীক রহিত হয়েছে। অথচ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও তা স্মরণ রাখতে পারেননি (৩) মুক্তাদী দুজন হলে ইমামের পেছনে কিভাবে দাঁড়াবে তাও তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। (৪) বিদায় হজ্জে রাসূলে পাক (সাঃ) ফজরের নামায নির্ধারিত সময়েই আদায় করেছেন এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই অথচ তিনি বর্ণনা করেন যে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রাসূল করীম (সাঃ) ফজরের নামায আদায় করেছিলেন (৫) আরাফাতে রাসূলে করীম (সাঃ) জোহর ও আসরের নামায কিভাবে একত্র ভাবে আদায় করেছিলেন তা-ও তিনি ভুলে গেছেন। (৬) উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পেঁৗছেছেন যে সিজদার সময় কনুই ও বাহু মাটির সাথে মিলিয়ে রাখতে হয় অথচ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইহাও মনে রাখতে পারেন নি (৭) وما خلق الذکر و الانثی কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি রাসূলে করীম (সাঃ) কিভাবে তিলাওয়াত করতেন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তা সঠিকভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হননি।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত ৭টি অভিযোগের মধ্যে কতগুলো সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। আর কতগুলো অভিযোগকারীর ভুলবুঝাবুঝির বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। মাত্র দুটি মাসআলায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অন্যান্য সাহাবাদের সাথে মতবিরোধ করেছেন। মূলত ইহাও হাদীসের ইখতিলাফের ভিত্তিতে সাধিত হয়েছে। দীনের একই বিষয়ের উপর এক সাহাবী রাসূলে পাক (সাঃ)-এর এক হাদীসের উপর আমল করেছেন পক্ষান্তরে অন্য সাহাবী প্রিয়নবী (সাঃ)-এরই অন্য আমলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং ইহা কোন অভি-যোগের বিষয়ই নহে। অথচ হাফেজ আবু বকর নিশাপুরীর ২য় ও ৩য় নং

প্রশ্ন এরই অন্তর্ভুক্ত। তার ১,৪,৫, ও ৬ নং অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ৭নং প্রশ্নটি কিরআতের ইখতিলাফ সম্পর্কীত। এ ব্যাপারে নিসইয়ান বা ভুল শব্দটির প্রয়োগ কোনক্রমেই সহীহ্ নয়।

এক রাবীর বর্ণনা ও মাসআলা উদ্ঘাটন যদি অন্য রাবীর বিপরীত হয়, তবে নির্বিবাধে একটিকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যটিকে ভুল সাব্যস্ত করা যে কি প্রকারের ইনসাফ তা আমাদের বোধগম্য নয়। দীনের কোন বিষয় অধিক চর্চার ফলে যদি সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয় তবে রাসূল করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত সে বিষয়ের দ্বিতীয় কোন রূপ কি সূত্রের কাতার থেকে বাদ পড়ে যাবে? কোন বর্ণনাকারী যদি জনসম্মুখে তা তুলে ধরে তবে কি তার উপর ভ্রান্তির অভিযোগ সঙ্গত হবে? হাফেজ আবু বকর নিশাপুরী রফঈ ইয়াদাইনের মাসআলাটি প্রমাণ করতে গিয়ে যখন দেখলেন যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি তার দাবীর অনুকূলে নয় তখন ইজতিহাদের নামে তিনি এক দুঃসাহস করে বসলেন যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকেই ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বিষয়টিকে দৃঢ় করে তোলবার জন্য তিনি এর সাথে আরো কত-গুলো মাসআলা জুড়ে দিলেন। দাবী করলেন যে সেগুলোতেও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ভুলের পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র মুহাম্মদ বিন আবদুল হাদী ব্যতীত পূর্ব-পরের কোন মুহাদ্দিসই তার উল্লিখিত ইজতিহাদের সমর্থন করেননি। বরং সকলেই ইহাকে অহেতুক অভিযোগের পর্যায়ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিস্ময় জাগে যে, আল্লামা বায়হাকী (রঃ)-এর মত এত বড় বিচক্ষণ মুহাদ্দিসও পূর্বাপর চিন্তা না করে উল্লেখিত ইজতি-হাদটি কিভাবে তদীয় সুনানে কুবরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে বসলেন। অথচ প্রকারন্তরে উহা দ্বারা রাসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রখ্যাত সাহাবীর নির্ভরযোগ্যতার উপর আঘাত হানা হয়। মুহাদ্দিস হিসাবে আল্লামা বায়হাকীর বিষয়টিকে আগাগোড়া পর্যালোচনা করা উচিত ছিল বৈকি। সাহাবীর উপর আপতিত অভিযোগের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া মূলত একজন মুহাদ্দিসের নৈতিক কর্তব্য এবং দীনী দায়িত্বও বটে। বলা-বাহুল্য যে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ দায়িত্বকে আদায় করবার প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হয়েছেন। আল্লামা শওক-নিমূভী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ আসারুস্‌সুনানে উল্লিখিত অভিযোগের যথেষ্ট হিসাব-নিকাশ নিয়েছেন এবং তা খণ্ডনের যুক্তিযুক্ত প্রয়াস পেয়েছেন।

আল্লামা শাব্বীর আহম্মদ উসমানী (রঃ) ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে আল্লামা নিমূভী (রঃ)-এর তাহকীক নকল করেছেন। ফতহুল মুলহিমের ২য় খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তার মতামতের একাংশ নিম্নরূপ।

ولا سبيل الى معرفة ان عبد الله بن مسعود علمه ثم نسيه بل العقل يستغربه ولا يجوز بل الحق ان نسبة النسيان الى عبد الله بن مسعود لا تخلو من اساءة الادب -

অর্থাৎ একথা জানার কোন উপায় নেই যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিষয়টি জেনে ভুলে গেছেন। অধিকন্তু ইহাতে আকল বিস্ময় মানে। বিবেক এরূপ ধারণা পোষণকে জায়েয মনে করে না। যথার্থ কথা হল যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উপর এরূপ ভুলের অভিযোগ দেয়া চরম বেআদবী আস্পর্ধার নিদর্শন।

আল্লামা তুর্কিমানী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আলজাওহারুন্নাকী'তে বলেনঃ

ورد لحديث ابن مسعود فى الاقتصار على الرفع بمجرد احتمال بعيد ولا يلزم من نسخ الاقتصار على الرفع فى التكبيرة الاولى ولا دليل عليها ولا طريق الى معرفة ان ابن مسعود علم ذالك ثم نسيه الادب فى هذه الصورة ان نسب فيها النسيان ان يقال لم يبلغه -

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অন্যান্য স্থানের রফঈ ইয়াদাইনের কথা ভুলেই তবে রফঈ ইয়াদাইনকে একমাত্র তাকবীরে তাহ্‌রীমার সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন ইহা অমূলক উক্তি বৈকি। বাস্তবতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রুকূর তাতবীক নছ্‌খ হয়েছে বলে একবার রফঈ ইয়াদাইনের নির্দেশও যে রহিত হয়ে যাবে এর কোন বাধ্যবাধকতা ও যৌক্তিকতা নেই। অন্যান্য স্থানের রফঈ ইয়াদাইনের কথা জ্ঞাত হবার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তা বিস্মৃত হয়েছেন এর কোন প্রমাণ নেই বা ইহা জানবারও কোন উপায় নেই। এ ব্যাপারে আদব ও সৌজন্যমূলক মন্তব্য হবে যে, অন্যান্য স্থানের রফঈ ইয়াদাইনের কথা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জানতেন না। বা তাঁর কাছে পৌঁছেনি।

রফঈ ইয়াদাইনের ব্যাপারে মুহাদ্দিস বায়হাকী (রঃ) যে বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে তো একজন সাহাবীর উপর ভুলের অভিযোগ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না আদৌ। একজন প্রখ্যাত সাহাবীর নির্ভরযোগ্যতায়

আঁচড় না কেটেও নিজ মাযহাবের পক্ষে আসক্তি জাহির করবার যথেষ্ঠ উপায় রয়েছে। অবশ্য ইমাম বায়হাকী (রঃ) এ ব্যাপারে একটা সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এসব অভিযোগের বোঝা নিজ মাথায় না নিয়ে সবটুকুই হাফেজ আবু বকর নিশাপুরীর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। ইনসাফ ও দীনদারীর কথা হল যে কোন ইলমী বিষয়ের উদ্ধৃতি দেবার সময় বক্তব্যের অদ্যন্ত যাচাই করে নেয়া দরকার। সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে মুখস্থ একটা উদ্ধৃতি দিয়ে দেয়া কোন উদারতার পরিচায়ক নয় বরং তা দ্বীনি খেয়ানতেরই নামান্তর। বক্ষমান আলোচনায় আমরা হাফেজ বায়হাকী প্রণিধিত আবু বকর নিশাপুরীর অভিযোগ সম্পর্কের সত্যমিথ্যা নিরূপণ করব।

১. হাফেজ আবু বকর নিশাপুরীর একটা অভিযোগ হল যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) সিজদায় কনুও ও বাহু রাখার ব্যাপারে ভুল ফতোয়া দিয়েছেন। উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল যে বাহু মাটি থেকে পৃথক রাখতে হবে। অথচ তিনি মাটির সাথে মিলিয়ে রাখার ফতোয়া দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হাফেজ নিশাপুরী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর দুটি রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার ১৭৫ ও ১৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সে রিওয়ায়েত দুটি হল এই :

ابو موسى عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن عامر ابن عبدة عن عبد الله بن مسعود قال هيئت عظام ابن ادم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق -

আমের বিন আবদাহ থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন আদম সন্তানের হাড় সিজদার জন্যে বানানো হয়েছে সুতরাং তোমরা সিজদা কর এবং কনুইসহ কর।

وكيع عن شعبة عن عبد الملك عن ابى الاحوص قال قال عبد الله اذا سجدتم فاسجدوا حتى بالمرافق يعني بمرفقيه -

... আবুল আহওয়াছ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ... যখন সিজদা কর তখন এভাবে সিজদা করবে যাতে কনুই বাদ না ... উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েত দুটির উপর হাফেজ নিশাপুরী স্বীয় অভিযোগের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

প্রশ্ন হল যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তব্যে হাফেজ নিশাপুরী

কনুইকে সিজদার সাথে সংযুক্ত করবার মনগড়া কল্পিত তরীকায় ইঙ্গিত কোথায় পেলেন ? কনুইকে সিজদার সাথে শামিল করবার নির্দেশ অনস্বীকার্য। কিন্তু তার বক্তব্য মাটির সাথে কনুই বিছিয়ে রাখবার আদৌ কোন ইশারা নেই। সিহাহ্ সিত্তার সব কিতাবেই হযরত ইবনে মাসউদের সিজদা সম্পর্কিত রিওয়ায়েতের উল্লেখ রয়েছে। আল-মুগনী, শারহুল কাবীর, মাবছুত ই সরখছী, বুরহান, আলবাহরুর রুখার, ইলামুল মু'কিঈন, হিদায়াতুল মুজতাহিদ ইত্যাদি গ্রন্থকারগণ সাহাবায়ে কিরামের ইখতিলাফী মাসআলাসমূহ বর্ণনায় যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কেউ হাফেজ নিশাপুরী বর্ণিত মাসআলার ধারে কাছেও যাননি। আল্লামা যায়লাকীর প্রতি আশ্চর্য হয় যে তাবৎ ইমাম ও মুহাদ্দিসগণকে উল্লংঘন করে কিভাবে তিনি হাফেজ আবু বকর নিশাপুরীর মন্তব্যে নতজানু হয়ে গেলেন। যার ফলে তিনিও ভিত্তিহীন এ মাসআলাটিকে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতামত বলে আখ্যায়িত করলেন। উল্লিখিত মাসআলাটি সম্পর্কে এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল।

قال رجل لابن عمر اضع مرفقى على فخذى اذا سجدت فقال سجد كيف تيسر عليك -

(অসুস্থতাবশত) আমি যদি সিজদার সময় কনুদ্বয়কে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখি তবে নামাযের কোন ত্রুটি হবে কি ? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জবাব দিলেন। যেভাবে তোমার সুবিধা হয় সেভাবেই সিজদা করো।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর বক্তব্য শুধু সিজদার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নিষ্প্রয়োজনে সুন্নতসিদ্ধ তরীকা বর্জন করবার আদৌ কোন অনুমতি তিনি দেননি। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার রাসূলে পাক (সাঃ) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে।

عن عثمان بن ابى عياش شكوا الذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الادعام و الاعتماد فى الصلاة ارخص لهم ان يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه او فخذيه -

উসমান বিন আবি আইয়াশ বর্ণনা করেন যে, লোকেরা রাসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে ওজরবশত নামাযে অনেক সময় ভর করবার প্রয়োজন পড়ে সুতরাং ইহা নামাযের জন্য ক্ষতিকর হবে কিনা ?

রাসূল কারীম (সাঃ) তাদেরকে অনুমতি দিলেন যে এরূপ ক্ষেত্রে তারা কনুই দ্বারা হাটু বা উরুর উপর ভর করতে পারে।

উল্লেখিত রিওয়ায়েত দুটিতে রুগ ও মা'জুরকে কিছুটা ব্যপ্তি দেয়া হয়েছে। কোন সুস্থ সবল ব্যক্তির জন্যে এ ব্যাপকতার অবকাশ নেই। কিন্তু মাজুর সম্পর্কিত এ ব্যাপকতা বর্ণনার জন্যে যদি কেউ হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্তির অভিযোগ উত্থাপন করে তবে তাতে অভিযোগকারীর নেহাত মূর্খতা বা ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। তার অভিযোগের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবে না। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে এমনতর অভিযোগ যদি দূষনীয় হয়, তবে প্রবীণ সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উপর আনিত ভিত্তিহীন অভিযোগ কি দূষনীয় হবে না? ২. তাঁর উপর দ্বিতীয় একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে

و قد نسی فی القرآن و هی المعوذ تان -

তিনি কুরআনে করীমের দুটি সূরা অর্থাৎ সূরা নাস ও সূরা ফালাকও বিস্মৃত হয়েছে।

আমাদের জিজ্ঞাসা হল যে হাফেজ আবু বকর নিশাপুরী কি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নিকট সংরক্ষিত আল কুরআনের কপিটি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন? তিনি কি তার ভেতর সূরা দুটি অনুপস্থিত পেয়েছেন? হাফেজ সাহেব সুস্পষ্টভাবে কোথাও একথা বলেন নি যে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিজস্ব কপিটি দেখেছেন। অধিকন্তু তিনি যদি প্রত্যক্ষ করত সূরা দুটির অনুপস্থিতির কথা দাবীও করেন তবুও একথা প্রমাণিত হবে না যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সূরা দুটি ভুলে গেছেন বা তিনি উহাকে কুরআনে করীমের অংশ মনে করতেন না। তার নিকট সংরক্ষিত কপিটিতে সূরা ফাতিহা লিখিত ছিল না বলেও অনেকে দাবী করেছেন।[১] কিন্তু ইহা দ্বারা কি একথা প্রমাণ করা যাবে যে সূরা ফাতিহাকে তিনি কুরআনে করীমের অংশ বলে স্বীকার করতেন না বা তিনি উহা বিস্মৃত হয়েছিলেন? ফিকাহ্ শাস্ত্রের সাথে যাদের এতটুকু ও সম্পর্ক আছে তারা সকলেই অবহিত আছেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নামাযে

১. চতুর্থ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে নজীম দাবী করেছেন যে, তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কপিটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাতে তিনি সূরা ফাতিহা দেখতে পাননি। -আল ফিহরিস্ত ৪০ পৃঃ।

সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতেন এবং শিষ্যদেরকেও ইহা শিক্ষা দিতেন। সুতরাং তার কপিতে সূরা নাস ও ফালাকের অনুপস্থিতি দ্বারা কখন একথা প্রমাণিত হবে না যে তিনি ইহা বিস্মৃত হয়েছিলেন বা তিনি উহাকে কুরআনে করীমের অংশ মনে করতেন না। তিনি সূরা লিখেন নি বলে যদি ভুলে যাওয়া বা কুরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় তবে, আরো যেসব পুণ্যাত্মা সাহাবিগণ গোটা কুরআনকেই লিখেননি বা লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না তাদের সম্পর্কেও কি একথা প্রযোজ্য হবে না যে তারা গোটা কুরআনকেই ভুলে গিয়েছিলেন ? বা সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান ছিলেন ? নাউজুবিল্লাহ।

আল্লামা ইবনে হাজাম বলেন ঃ

كل ما روى عن ابن مسعود من المعوذتين وام القرآن لم يكونا فى مصحفه فكذب موضوع لا يصح وانما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود فيها ام القرآن والمعوذتان۔

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তার কপিতে সূরা নাস—ফালাক এবং ফাতিহা ছিল না ইহা মিথ্যা ও উদ্ভট দাবী মাত্র। ইহা সত্য নয়। তার বিখ্যাত শিষ্য জুর’বিন জায়শ থেকে আসিম যে কিরআত বর্ণনা করেছেন তার ভেতর সূরা ফাতিহা ও মুআওয়াজাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক) এর উপস্থিতি সর্বজন বিদিত।[১] বলা বাহুল্য আসিমের কিরআত আজ দুনিয়া জোড়া প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

اجمع المسلمون على ان المعوذتين والفاتحة من القرآن وان من جحد منهما شيئا كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح۔

আল্লামা সুয়ুতী বলেন যে, সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে সূরা ফাতিহা ও মুআওয়াজাতাইন কুরআনে করীমের অংশ। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে এর খিলাফ যে মতামতের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে মিথ্যা। ইহা কোনক্রমেই সহীহ্ নয়।

আল্লামা জাজারী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বিখ্যাত তের জন শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। তারা সকলে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কাছে পূর্ণ কুরআন শ্রবণ করেছেন। তাঁর সূত্রে তারা সকলে কুরআন রিওয়ায়েত

---

১. আল মহল্লা।

করেছেন। সন্দেহ নেই যে ইহার ভেতর সূরাত্রয় বর্তমান রয়েছে। আল্লামা জাহারী কথিত সে তেরজন শিষ্যের নাম হল এই ১. আসওয়াত বিন ইয়াজীদ নখঈ ২. তামীম বিন খাদলাজ ৩. হারিস বিন কাইস ৪. জুর বিন জায়েশ ৫. উবাইদ বিন কাইস ৬. উবাইদ বিন নাদলাহ ৭. আল কামাহ ৮. উবাইদাহ আস্ সালমানী ৯. আমর বিন শুরাহ বিন ১০. আবু আব্দুর রহমান আস সালামী ১১. আবু আমর আশ শাইবানী ১২. জায়েদ বিন ওহাব ও ১৩. মাসরুক।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রমযান মাসে প্রতি তিন দিনে কুরআনে করীম খতম করতেন। এছাড়া অন্যান্য মাসে তিন সপ্তাহে এক খতম দিতেন। ইবনে আবি লাইলা বলেন যে, প্রতি দিন তার শিষ্য ও বন্ধু-বান্ধব তার মজলিসে জামায়াত হলে তারা কুরআনে করীম খুলে তিলা-ওয়াত করতেন এবং তিনি তা ধারাবাহিক ভাবে তাফসীর করতেন। মাসরুখ বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মসজিদে আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন ثم نجلس بعد نثبت للناس অতঃপর আমরা মানুষের অন্তরে তা সুদৃঢ় করার জন্য বসে পড়তাম।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রথমত কুরআন লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলন। হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) ও প্রথমে হযরত উমর (রাঃ) সাথে এ ব্যাপারে একমত হতে পারছিলেন না। কিন্তু তাই বলে কি তাদের সম্পর্কে বিস্মৃতি বা সন্দেহের অপবাদ দেয়া হবে ? অথবা এইরূপ মন্তব্য করা কি কারুর সাহসে কুলোবে ? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তো শুধুমাত্র মুত্যাওয়াজাতাইনকেই স্বীয় প্রতিলিপিতে সন্নিবিষ্ট করেননি। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে কি প্রকারে এ-ধরনের অপবাদ দেয়া বৈধ হবে যে, তিনি ইহা বিস্মৃত হয়েছিলেন ? বা কুরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে ইহাতে তাঁর সন্দেহ ছিল ?

তিনি স্বয়ং রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে সরাসরি কুরআন শিখেছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) যে ব্যক্তি চতুষ্টয় থেকে কুরআনুল করীম শিক্ষা করার জন্যে সাহাবায়ে কিরামকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনের মুয়াল্লিম পদে রচিত হয়েছিলেন। রাসূলে পাক (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

اقرأكم ابن مسعود فاقرأوا

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমকারী সুতরাং তার কাছে কুরআন শিক্ষা কর।[১] রাসূলে করীম (সাঃ) প্রতি রমযানে কুরআনুল করীমের দাওর করতেন। ইহাতে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ও তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করতেন। জীবনের শেষ রমযানে প্রিয়নবী (সাঃ) কুরআনে কারীমের যে দাওর করেছিলেন হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ তাতে উপস্থিত ও শরীক ছিলেন।

قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرض عليه القران فى كل عام فى كل شهر رمضان فلما كان العام الذى مات فيه عرضه عليه مرتين فشهد عبد الله مانسخ و بدل -

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : রাসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর সারা বছর কুরআনের যে অংশ নাযিল হত প্রতি রমযানে তা হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সম্মুখে পেশ করতেন। ইন্তিকালের বছর হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সাথে দু'বার কুরআনুল কারীমের দাওর করেন। হযরত ইবনে মাসঊদ তাতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কুরআনে করীমের যে সব আয়াত পরিবর্তিত বা রহিত হয়েছে তা-ও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

হযরত আবু জবইয়ানকে আবদুল্লাহ্ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তুমি কিভাবে কুরআন পাঠ কর? তিনি উত্তরে বললেন যে হযরত ইবনে উম্মি আব্দ যে ভাবে পাঠ করে থাকেন। একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস বললেন যে, তাই করবে। কেননা ইহাই শ্রেষ্ঠতর কিরআত। যেহেতু রাসূলে করীম (সাঃ)-এর শেষ তিলাওয়াতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। উল্লিখিত বর্ণনানুসারে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কুরআনে করীমের কোন আয়াত তার অজানা ছিল না। বা এতটুকুও তিনি বিস্মৃত হননি। সুতরাং মুআওয়াজাতাইন সম্পর্কে তার উপর অভিযোগ উত্থাপন সম্পূর্ণ অবান্তর।

ধারাবাহিক সূত্রে আমরা একথা পেয়েছি যে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) উল্লিখিত সূরাদ্বয়কে কুরআনে করীমের অংশ মনে করতেন। কিরআতের ইমামগণ হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে একথা নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। প্রসিদ্ধ কিরআতের ইমাম আসিম, হামজা, কাছাঈ ও খালফ

---

১. তিরমিজী ২য় খণ্ড ২২২ পৃঃ।

এর সনদের নির্ভরযোগ্যতার উপর আইম্মা কিরাম ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। মুসলিম বিশ্বে আজ তাদেরই কিরআত প্রচলিত। উল্লিখিত চার ইমাম হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে যে কিরআত বর্ণনা করেছেন তার ভেতর সূরা দু'টির উপস্থিতি কার না দৃষ্টিগোচর হয়? আমরা নিম্নে উক্ত চার ইমামের সনদ চিত্রিত করে দিলাম।

উবাইদ বিন নাদলাহ, আলকামাহ, আসওয়াদ, জুররাবিন ফুজলাহ ↑ জুররাবিন আয়েশ আসাদী

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)

উল্লিখিত শক্তিশালী সনদের উপর দুর্বল সনদের কিই বা গুরুত্ব আছে? হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে শক্তিশালী সনদে কুরআনুল করীমের যে কিরআত আমরা পেয়েছি এবং যার উপর উম্মতের ঐকমত্য সাধিত হয়েছে তা বর্জন করে আমরা কি তাদের থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত কিরআতকে অধিক গুরুত্ব দেব? তা যদি না হয় তবে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কেও আমরা দৃঢ়তার সাথে একথা ঘোষণা করছি যে শক্তিশালী সনদে তার থেকে বর্ণিত কিরআতের উপর দুর্বল সনদের কোন স্থান হতে পারে না। সেগুলো ভিত্তিহীন ও মনগড়া। উম্মতের উলামায়ে কিরাম একথা জোরের সাথে ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী এবং ইবনে হাজাম (রঃ)-এর মন্তব্যে পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। ইবনে হাজাম আরো বলেন:

و اما قولهم ان مصحف عبد الله بن مسعود خلاف مصحفنا فباطل و كذب و فك مصحف عبد الله ابن مسعود انما فيه قراءته بلا شك و قراءته هي قراءة عاصم المشهورة عند جميع اهل الاسلام في مشرق الدنيا و غربها نقرء بها كما ذكرنا۔

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মাছহাফ সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে যে উহা আমাদের প্রচলিত কুরআন থেকে স্বতন্ত্র। ইহা তাঁর সম্পর্কে অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। সাত ক্বারীর প্রসিদ্ধতম ক্বারী আসিমের কিরআতের সাথে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মাছহাফের কোন বৈসাদৃশ্য নেই। বর্তমান দুনিয়ায় তার কিরআতই প্রসিদ্ধ, হ্যাঁ তবে উভয়ের মাঝে যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে মূলত তা কিরআতের পদ্ধতিগত পার্থক্য ব্যতীত অন্য কিছু নয়।[১]

আল্লামা নববী (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শারহুল মুহাজ্জাবে বলেন :

اجمع المسلمون على ان المعوذ تين و الفاتحة من القران و ان من جحد منها شيئا كفر و ما نقل عن ابن مسعود غير صحيح -

মুসলিম উম্মাহ্ এব্যাপারে একমত যে মুআওয়াজাতাইন কুরআনে কারীমের অংশ। অনুরূপভাবে সূরা ফাতিহাও। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এর বিপরীত যে মতামত বর্ণিত হয়েছে মূলত তা সহীহ্ নয়।[২]

কাজী আবুবকর ইবনে আরাবী বলেন :

لم يصح عنه انها ليست بقران ولا حفظ عنه -

ইহা কুরআনুল করীমের অংশ নয় একথা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে প্রমাণিত হয়নি। মূলতঃ ইহা সত্য নয়।[৩]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন :

و الا غلب على الظن ان نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل

"হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা অমূলক ও ভিত্তিহীন।"

نسبة انكار كونها من القران اليه غلط فاحش و من اسند الانكار الى ابن مسعود فلا يحيا باسناده عند معارضة هذه الا سانيد الصحيحة بالاجماع المتلقاة بالقبول عند العلماء الكرام بل و الامة كافة كلها فظهر ان نسبة الانكار الى ابن مسعود باطل -

তাঁকে উক্ত সূরাদ্বয়ের অস্বীকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা মারাত্মক ভুল। যে সনদের ভিত্তিতে তাঁর উপর এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয় সে ত প্রক্ষেপের

১. কিতাবুল ফসল ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা।
২. শারহ মুহাজ্জাব।
৩. কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী।

অযোগ্য। অধিকন্তু যখন তা মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী নির্ভরযোগ্য সনদের বৈসাদৃশ। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে হযরত ইবনে মাসউদের উপর উক্ত সূরাদ্বয়ের অস্বীকৃতির অভিযোগ উত্থাপন মিথ্যা অপবাদের শামিল বৈ নয়।[১]

বাহরুল উলূম গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতানুসারে আল-কুরআনের সকল সূরা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। অনেকে অবশ্য দাবী করেছেন যে ইহা সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুসারে সাধন করেছেন। ইবনে কায়েস এ দাবীর পক্ষে মাযহাবের পরস্পর বৈসাদৃশ্য দ্বারা দলীল দিয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত প্রতিলিপির বিন্যাসে সূরা নাযিলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কপিটির বিন্যাস প্রচলিত কুরআনের অনুরূপ ছিল না। মূলত তাদের এ দাবী যথার্থ নয়। প্রথম মতটিই নির্ভুল। যেসব রিওয়ায়েত দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের সংরক্ষিত প্রতিলিপিসমূহের পরস্পর বৈপরীত্য প্রতীয়মান হয় সেগুলো সবই বানোয়াট ও মনগড়া। উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থে তার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে আজ পর্যন্ত আল-কুরআনের বিন্যস্ত যেরূপ চলে আসছে তার বিপক্ষে ওসব কল্পিত রিওয়ায়েতের কোনই মূল্য নেই। এই অবিচ্ছিন্ন ও অবিসম্বাদিত সূত্র একথার জলন্ত সাক্ষী যে আল-কুরআনের সকল সূরাসমূহকে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর ইরশাদ অনুসারেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। কেননা যে দশজন ক্বারী স্ব-স্ব সনদে রাসূলে পাক (সাঃ) থেকে আজকের প্রচলিত বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনুল করীম বর্ণনা করেছেন। তাদের সনদ মুতাওয়াতির। তার নির্ভরযোগ্যতায় উপর উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য সাধিত হয়েছে। এ সনদের উস্তাদ ও শায়খ পরম্পরা প্রতিযুগের শ্রেষ্ঠতম ক্বারী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[২] সুতরাং রাসূলে পাক (সাঃ)-এর আমরণ সঙ্গী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর প্রতিলিপিতে আজকের প্রচলিত কুরআনের ধারাবাহিকতা বর্তমান ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই উল্লিখিত সূরা দু'টির ব্যাপারে হযরত

১. বাহরুল উলূম ২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ।
২. বাহরুল উলূম ২য় ১০ পৃঃ।

ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উপর অভিযোগ উত্থাপন নিতান্ত মূর্খতা বা বাতুলতার বহিঃপ্রকাশ।

৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উপর আরেকটা প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে

و نسى ما لم يختلف العلماء فيه ان النبى صلى الله عليه و سلم صلى الصبح يوم الجمع فى وقتها -

দশম জিলহজ্জে রাসূলে করীম (সাঃ) ফজরের সালাত তার নির্ধারিত ওয়াক্তেই আদায় করেছিলেন। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কোন ইখতিলাফ নেই। অথচ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইহাও ভুলে গেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে পাক (সাঃ) ওয়াক্তের পূর্বেই সেদিন ফজরের নামায আদায় করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত হয়েছে। মূলত হাফেজ আবু বকর নিশাপুরী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার অর্থই বুঝেননি। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে

صلى الفجر قبل ميقاتها

ফজরের নামায রাসূলে করীম (সাঃ) সাধারণত যে সময়ে আদায় করতেন, সেদিন তার পূর্বেই আদায় করেছিলেন। ইহার অর্থ এ নয় যে তিনি ওয়াক্ত আসার পূর্বেই নামায পড়েছেন। কিন্তু হাফেজ সাহেব ইহা বুঝতে না পেরে দুঃসাহসিক ভাবে বলে ফেলেন যে نسى ابن مسعود হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ভুলে গেছেন। বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে। যেখানে রয়েছে যে

ثم صلى الفجر حين طلع الفجر و القائل ان يقول لم يطلع الفجر -

রাসূলে পাক ফজরের নামায ওয়াক্ত আসার পরে এত তাড়াতাড়ি আদায় করেছিলেন যে, ভালভাবে লক্ষ্য না করলে কেউ বলেই ফেলবে যে তিনি ফজরের ওয়াক্ত আগমনের পূর্বেই নামায পড়েছেন।

হাফেজ আবুবকর নিশাপুরী অন্ততঃ বুখারী শরীফেও যদি ভালভাবে দৃকপাত করতেন তবে হয়ত এ বিভ্রান্তির শিকার হতেন না। কেননা বুখারী শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে - فلما طلع الفجر او حين بزغ الفجر অর্থ যখন ফজর উদয় হল বা ফজর আগমন করল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তো সেই সে ব্যক্তিত্ব যার সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ما حدثكم ابن ام عبد فصدقوه

ইবনে উম্মি আব্দ (ইবনে মাসউদ) তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করে তা সত্য জানবে।[১]

রাসূলে পাক (সাঃ) অন্যত্র ইরশাদ করেন

رضيت لكم ما رضى لكم ابن ام عبد

যে বিষয়ে ইবনে উম্মি আব্দ সন্তুষ্ট হয় আমিও তাতে সন্তুষ্ট।[২]

সুতরাং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি না করে যথেচ্ছা মন্তব্য করে দেয়া উচিত নয়। কেননা তাঁর পক্ষে নববী সত্যায়ন রয়েছে।

৪. তার উপর আপত্তির তৃতীয় আপত্তি হল যে, রাসূলে করীম (সাঃ) আরাফাতে জোহর ও আসরের নামায কিভাবে একত্রে আদায় করেছিলেন তা তিনি মনে রাখতে সক্ষম হন নি। মূলতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযোগ দুটি একই দিনের ঘটনা। ঐদিন রাসূলে করীম (সাঃ) জোহর ও আসরকে জোহরের ওয়াক্তে একত্রে আদায় করেছিলেন। এমনিভাবে মাগরিবের নামাযকেও সেদিন ইশার ওয়াক্তে পড়েছিলেন। তবে মাগরিব ও ইশার নামায মুজদালিফায় আদায় করেছিলেন। মাগরিবকে ইশার ওয়াক্তে আদায় করাকে জমঈ তা'খীর বলা হয়। শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী সফর ইত্যাদিতে ইহা বৈধ। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের প্রথমাংশে ইহার উল্লেখ রয়েছে। হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি ফজরের নামায সাধারণ সময়ের পূর্বে আদায় করা সম্পর্কিত। হাফেজ আবু বকর নিশাপুরীর মতে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে ভুল করেছেন। এমনি ভাবে তার এ হাদীসে জমঈ তাকদীমের বর্ণনা নেই। তার মতে ইহাও আরেকটি ভুল। আমাদের প্রশ্ন হল যে, জমঈ তাকদীমের ব্যাপারে তিনি ভুল করলেন আর জমঈ তা'খীরের অংশটুকু তাদের পক্ষে বলেই কি তারা তাকে আরেকটা ভ্রান্তির অভিযোগ থেকে রক্ষা করলেন? যাক আমরা তাতে খুশীই প্রকাশ করি। কেননা এর ফলে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীর জীবন চরিত্র অন্তত পক্ষে একটা ক্ষত থেকে রক্ষা পেল।

অভিযোগটির হাকীকত হল যে, আরফার দিন রাসূলে পাক (সাঃ) জোহর ও আসরের নামাযকে জোহরের সময় একত্রে আদায় করেছিলেন। জোহরের

১. তিরমিযী ২য় খণ্ড, ২২১ পৃঃ।
২. মুস্তাদরাকে ৩য় খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ।

নামায যদিও ইহার নির্ধারিত সময়েই পড়েছিলেন কিন্তু ওয়াক্তের প্রথমভাগে পড়েছিলেন। সেদিন আসরের নামায তার ওয়াক্ত আসবার অনেক পূর্বে জোহরের সাথে মিলিয়ে আদায় করেছিলেন। মাগরিবের সময় হলে তিনি আরাফাত ত্যাগ করে মুজদালিফায় গিয়ে ইশার ওয়াক্তে তা আদায় করেছিলেন। কিন্তু পদ্ধতিটি জোহর ও আসরের নামাযের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কেননা এ সময়ে ইশার নামায তার যথাসময়েই আদায় হয়েছিল কিন্তু মাগরিবের নামায ওয়াক্তের অনেক পরে পড়া হয়েছিল। সুতরাং সেদিনের মাগরিবের নামায কাযার ভেতর গণ্য। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তার হাদীসের বর্ণনা করতে চেয়েছেন যে রাসূলে পাক (সাঃ) কখনো নামায ওয়াক্তের পড়ে কাযা করে আদায় করতেন না। বরং প্রত্যেক নামায তার যথা সময়েই আদায় করতেন। কিন্তু সেদিনের মাগরিব যেহেতু কাযা হয়েছিল তাই তিনি বললেন :

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها -
الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها -

আমি রাসূলে করীম (সাঃ)-কে কখনো ফজরের নামায ইহার যথার্থ সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তবে একদিন দু'নামাযে ব্যতিক্রম করেছেন। মাগরেব ও ইশারকে তিনি মুজদালাফায় এক ওয়াক্তে পড়েছিলেন এবং সেদিন ফজরের নামায স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই আদায় করেছিলেন।

কিন্তু সেদিনের আসর সম্পর্কে কাযার প্রশ্নই আসে না। কেননা ওয়াক্তের পূর্বে নামায পড়া কখনো কাযা বলে গণ্য হতে পারে না। কাযা তো বলাই হয় ওয়াক্ত ফুরিয়ে গেলে নামায পড়াকে। সেদিন রাসূলে করীম (সাঃ) আসরের নামায ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করেছিলেন সুতরাং ইহা কাযা নয়। আর যেহেতু নির্ধারিত ওয়াক্তেও আদায় করা হয় নি সেহেতু উহা আদায় বলেও গণ্য হবে না। বস্তুত ইহা হজ্জের একটা খাছ হুকুম ছিল। ইহা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাসের শামিল নয়। বা অভ্যাসগত আলোচনায়ও উহা সংযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই। তাই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তার আলোচনায় উহা উল্লেখ করেননি। উপরন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী জীবনে নিষ্প্রয়োজনে কাযার অনুপস্থিতির কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সুতরাং এখানে আসরের কথা তিনি ভুলে গেছেন বলে অভিযোগ উথাপনের কোন অবকাশ নেই। আমরা জানি না যে হাফেজ আবু বকর কেন এ উদ্ভট অভিযোগ তুললেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ব্যতিক্রম হিসাবে যে

দু'নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা আরাফাতের আসর এবং মুজদালাফার মাগরিবও তো হতে পারে। কেননা এ দু'নামাযেই রাসূলে পাক (সাঃ) স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। একতো তিনি আসরের নামায ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করেছেন। দ্বিতীয়ত ওজর ছাড়াই তিনি মাগরিবের নামায কাযা করেছেন। আর ফজরের নামাযে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যতিক্রমই হয়নি। কেননা ইহা ওয়াক্তের ভিতরেই আদায় করা হয়েছিল। যদিও ওয়াক্তের প্রথমভাগে। সুতরাং হাদীসে উল্লেখিত صلاتين "দু'নামায" দ্বারা যদি আরাফাতে আদায়কৃত আসর এবং মুজদালাফায় আদায়কৃত মাগরিবের নামযে ধরা হয়, তবে আর কোন সমস্যাই অবশিষ্ট থাকে না। হাদীসের মাঝে এ ধরনের সংক্ষিপ্তকরণ এবং রাবী কর্তৃক তার একাধিক ব্যাখ্যা প্রদানের বহুল প্রচলন রয়েছে। যেমন تركت فيكم امرين তোমাদের ভেতর আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার সুন্নত। রাসূলে পাক (সাঃ)-এর পরে আহ্‌লে বায়তের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই ব্যখ্যাকারিগণ এখানে امرين "দুটি জিনিসের" বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাহ্‌কে দুটি ধরেছেন এবং আহলে বায়তের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আর কেউ কিতাব ও সুন্নাহ্‌কে একটা ধরে আহলে বায়তকে দ্বিতীয় গণ্য করেছেন। এমনি ভাবে ওয়াফদে কায়েসের হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে امرنا باربع "আমাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন" অথচ বিষয় রয়েছে পাঁচটি তাই এখানেও মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

যাই হোক হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসে যখন বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত ব্যখ্যার সুযোগ রয়েছে তখন অযথা ভ্রান্তির অভিযোগ তুলে সাহাবীর জীবন চরিতে আঘাত করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়।

৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) উপর আপতিত ৫ম অভিযোগ হল যে তিনি সূরা ওয়াল্লাইলের আয়াত وما خلق الذكر و الانثى এর পরিবর্তে الذكر و الانثى পড়তেন। মূলত ইহাও একটা অমূলক প্রশ্ন। কেননা এ পার্থক্য কিরআতের বিভিন্নতার অন্তর্ভুক্ত। ভুল ত্রুটির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বুখারী শরীফের ৭৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, একদিন হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর অন্যতম ছাত্র আলকামাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সূরা ওয়াল্লাইলের এ আয়াতটি তুমি কিভাবে পাঠ কর। হযরত আলকামা (রাঃ) বললেন যে, আমি و الذكر و الانثى পড়ি। তখন হযরত হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন

اني سمعت النبي صلى الله عليه و سلم هكذا الذكر و الانثى و الله لا اتابعهم -

নিঃসন্দেহে আমি রাসূলে পাক (সাঃ)-কে এভাবেই তিলাওয়াত করতে শুনেছি। অর্থাৎ তিনি و الذكر و الانثى পাঠ করতেন। আল্লাহ্‌র শপথ আমি ওদের কথা কর্ণপাত করবো না।[১]

তিনি আরো বলেন

و الله لقد اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم من فيه الى في

আল্লাহ্‌র কসম রাসূলে পাক (সাঃ) এ আয়াতটি এভাবেই আমাকে মুখে মুখে শিক্ষা দিয়েছেন।

ইবনে জিন্নী বলেন و الذكر و الانثى কেবল হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এরই কিরআত নয়। সায়্যিদিনা আলী মুর্তাজা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআতও ইহাই।[২] তাদের কারুর সম্পর্কে নিসইয়ান বা ভুলের অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। সুতরাং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে কেন এ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে? হাফেজ আবু বকর নিশাপুরী কি হযরত ইবনে মাসউদ সম্পর্কে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর ইরশাদ ভুলে গেলেন? রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন:

استقرؤا القران من اربعة من عبد الله ابن مسعود (فبدأ به) و سالم مولى ابى حذيفة و ابى ابن كعب و معاذ بن جبل -

তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন শিক্ষা কর। (১) আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (২) সালিম মাওলা আবি হুযায়ফা (৩) উবাই ইবনে কা'ব (৪) এবং মাআয বিন জাবাল[৩] প্রথমেই রাসূলে পাক (সাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন

من سره ان يقرأ القران غضا فليقرأ على قرأة ابن ام عبد -

যে ব্যক্তি তরতাজা কুরআন পাঠ করতে আগ্রহী সে যেন হযরত ইবনে মাসউদ এর কিরআতের অনুকরণ করে।[৪]

---

১. বুখারী ৭৩৭ পৃঃ
২. আল জাওহারুন্নাকী ২য় খণ্ড ৮২ পৃঃ
৩. বুখারী কিতাবুল মানাকিব। তিরমিযী ২য় খণ্ড ২২১ পৃঃ।
৪. আহমদ ৪ খণ্ড ২৭৯ পৃঃ।

হযরত আমর ইবনুল হারিস (রাঃ) বলেন ঃ

من احب ان يقرأ القرآن غضا فليقرأ على قرأة ابن ام عبد -

যে ব্যক্তি জীবনোচ্ছল তিলাওয়াতের আশা করে তার জন্য ইবনে উম্মি আবদ এর কিরআতের অনুসারী হওয়া উচিৎ।[১]

৬. তাঁর উপর আপতিত প্রশ্নাবলীর অন্যতম হল যে, তিনি রুকূতে তাতবীকের প্রবক্তা ছিলেন। অর্থাৎ রুকূর সময় হাত হাঁটুর উপর না রেখে দু'হাঁটুর মাঝখানে রাখতে হবে। অথচ আইম্মায়ে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে রুকূতে উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখতে হবে। ইহাই সুন্নত।

আমরা এখানে মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করছি। পাঠক, নিজেই ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে অভিযোগটির বাস্তবতা কতটুকু।

হযরত ইবনে মাসুদ (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধতম দু'শিষ্য আসওয়াদ ও আলকামা থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن علقمة و الاسود انهما دخلا على عبد الله بن مسعود فقال اصلى من خلفكم فقالا نعم فقام بينهما و جعل احدهما عن يمينه و الاخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا ايدينا على ركبنا -

তারা উভয়ে একদিন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন। হযরত ইবনে মাসউদ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সবাই কি নামায আদায় করে ফেলেছে? তারা উত্তর দিলেন, জী হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের একজনকে ডানে এবং অন্যজনকে বাম পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে নামাযে দণ্ডায়মান হলেন। অতঃপর রুকূতে গেলে আমরা হাত হাঁটুর উপর রাখলাম।

এর পরে তারা বলেন ঃ

فضرب ايدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و فى رواية كانى انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم -

হযরত ইবনে মাসউদ আমাদের হাতের দিকে ইঙ্গিত করত নিজের দু'হস্তকে পরস্পর সন্নিবিষ্ট করলেন এবং উহা দু'উরুর মধ্যখানে চেপে

১. আহমদ ১ খণ্ড ২৭৯ পৃঃ।

ধরলেন। নামায সমাপ্ত হলে তিনি আমাদেরকে বললেন, দেখ, রাসূল করীম (সাঃ) এভাবেই নামায পড়ছেন। (অন্য রিওয়ায়েতে আছে) তার সে এলো অঙ্গুলীগুলো যেন, আমি আজো দেখছি।

উল্লিখিত রিওয়ায়েত অনুসারে সেদিন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রুকুতে উভয় হস্ত দ্বারা হাঁটু ধারণ না করে উভয় হাতকে সংযুক্ত করতঃ উরুদ্বয়ের মাঝখানে রেখেছিলেন। মূলত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর জীবনে এ ঘটনা ঐ একবারই ঘটেছিল। সুতরাং বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার উপর এ অপবাদ দেয়ার কি যৌক্তিকতা আছে আমরা জানি না যে, তিনি রুকুর একটা সুন্নত সিদ্ধ পদ্ধতিকে অস্বীকার করেছেন বা তা ভুলে গেছেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকেও তো অনুরূপ রিওয়ায়েত উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর উপর কি তবে উক্ত অভিযোগ উত্থাপিত হবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেন :

فان شئت قلت هكذا يعني و ضعت يديك على ركبتيك و ان شئت طبقت -

ইচ্ছা হলে তুমি তোমার হস্তদ্বয় উভয় হাঁটুর উপর রাখতে পার অন্যথায় তাতবীকও করতে পার।

হাফেজ ইবনে হাজার উল্লিখিত রিওয়ায়েতকে সত্যায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে তার গবেষণার সার হল যে, রুকুতে উভয় পদ্ধতিরই অনুমতি আছে এবং উভয়টিই সুন্নত মুতাবিক। মূলত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও উভয় পদ্ধতিকে সুন্নত সিদ্ধ বলতেন। এবং উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা তিনি তাতবীকের বৈধতা প্রমাণ করেছেন। যাতে একটা বৈধ পদ্ধতিকে কেউ নাজায়েয বলে ফতোয়া দিয়ে না বসে। একই আমলের ভিতর পদ্ধতিগত পার্থক্যের ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। নামাযে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। অথচ ইহার ভিতর ও শব্দগত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আযানের শাব্দিক বৈপরিত্যের কথা কে না জানে? এসব মাসআলায় যদি কেউ একটি পদ্ধতির কথা বর্ণনা করে তবে তার সম্পর্কে কি এ অভিযোগ উত্থাপন কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত হবে যে তিনি দ্বিতীয় পদ্ধতির বৈধতা অস্বীকার করেন বা ইহা বিস্মৃত হয়েছেন।

বিভিন্ন মাসআলায় রাসূলে পাক (সাঃ) থেকে একাধিক মাসনূন পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে। যেখানে (মাযহাব অনুসারে) যে কোন পদ্ধতির উপর

আমল করবার অধিকার প্রতিটি মুসলমানের রয়েছে। এজন্যই হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাতবীকের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, উক্ত তরীকাই সুন্নত সিদ্ধ و هذا الذي وله هو المتعين এবং এই ব্যাখ্যাই সঠিক।[১]

কেননা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বিশ্বাস রাখতেন যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) দৈনিক সত্তর রাকআত ফরজ এবং ততোধিক নাওয়াফেল ও সুন্নত আদায়ের নববী তরীকা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রিয়নবী (সাঃ) তাতে রুকুর সময় স্বীয় হাটুদ্বয়ে হাত রাখতেন। এমনি ভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) কিভাবে সালাত আদায় করতেন তাও হযরত ইবনে মাসউদের অবিদিত ছিল না। এসব নামাযে তিনি তাদের সঙ্গে শরীক হতেন। সুতরাং একথা কল্পনাতীত যে তিনি তাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি ভুলে গেছেন। উপরন্তু তিনি সঙ্গী-সাথী কর্তৃক সে ভুলের ইঙ্গিত পর্যন্ত পাননি। কেউ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেননি যে 'তাতবীক' ছাড়াও রুকু আদায়ের দ্বিতীয় একটা মাসনুন পদ্ধতি রয়েছে। আমরা আল্লামা আবুবকরকে একটা প্রশ্ন করতে পারি যে, হাদীসের গ্রন্থসমূহে এমন অনেক রেওয়ায়েতের উল্লেখ পাওয়া যায় যা কেবল মাত্র একজন সাহাবী কর্তৃকই বর্ণিত হয়েছে। যা অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। আজ পর্যন্ত কি কোন আলিম বা মুহাদ্দিস তাদের সম্পর্কে এ উক্তি করবার মত দুঃসাহস করেছেন যে, তারা সেগুলো ভুলবশত বর্ণনা করেছেন? আমরা এখানে তাতবীকের সাথে সঙ্গতীপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি। ইমাম তিরমিযী স্বীয় সুনান গ্রন্থের কিতাবুল ইলমে বলেন:

و جميع ما فى هذا الكتاب هو معمول به و به اخذ اهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس ان النبى صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر و العصر بالمدينة و المغرب و العشاء من غير خوف و لا سفر و لا مطر و حديث النبى صلى الله عليه و سلم انه قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه -

"এ কিতাবে সংগৃহীত সকল হাদীসের উপর উম্মতের আমল রয়েছে। আহলে ইলম এর সমূহ হাদীসকেই অনুসরযোগ্য বিবেচনা করেছেন। তবে

১. ফাতহুল বারী, কিতাবুস্সালাত.

দুটি হাদীস ব্যতীত। তার একটি হল হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওক্কাস থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন যে, প্রিয় নবী (সাঃ) মদীনায় কোন ভয়-ভীতি, সফর ও বৃষ্টি অর্থাৎ কোন ওজর ব্যতীতই জোহর ও আসরের নামাযকে এমনিভাবে মাগরিব ও ইশার সালাতে একত্রে আদায় করেছেন। দ্বিতীয় হাদীসটি যে, রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, কেউ শরাব পান করলে তাকে দোর্রা মার। এমনি ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার। চতুর্থবারেও সে এ অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে তাকে কতল কর।

হাদীস দুটি তিরমিযী শরীফে যথাক্রমে ২৬ ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি হযরত ইবনে আব্বাস ও দ্বিতীয়টি হযরত মায়ায বিন জাবাল (রাঃ) রিওয়ায়েত করেন। সালাত ও শাস্তি সম্পর্কীয় এমন গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় সংশ্লিষ্ট যে কোন হাদীস একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে অন্য কোন সাহাবী এ হাদীস দুটির অবতারণা করেন নি। কিন্তু তাই বলে কি এ দুটি হাদীসের ক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মায়ায বিন জাবাল (রাঃ) -এর মত বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ দুই সাহাবী ভ্রমের পরি-চয় দিয়েছেন ? তাদের শ্বেতগাত্রে এমনতরা উদ্ভব অভিযোগের কলংক দাগবার দুঃসাহস কার আছে ? আল্লাহ্ আমাদেরকে হিফাজত করুন। বেবাক হয়ে যাই যে, এমনতর একাধিক উদাহরণ চোখের সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও রুকু আদায়ের মাসআলায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উপর সহজেই ভ্রান্তির অভিযোগ দেয়া হল।

৭. তাঁর উপর আপতিত ৭ম প্রশ্নটি হল যে, মুক্তাদী যদি দু'জন হয় তবে ইমামকে কোথায় দাঁড়াতে হবে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাও স্মরণ রাখতে সক্ষম হননি। এ ব্যাপারে মাসআলা হল যে, মুক্তাদী একজন হলে ইমাম তার বাম পার্শ্বে দাঁড়াবে। এবং দুই বা ততোধিক হলে ইমাম তাদের সম্মুখে দাঁড়াবে। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে মুক্তাদী দু'জন হলেও ইমাম তাদের সাথেই মধ্যখানে দাঁড়াবে। যেরূপ এক মুসল্লীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মূলত ইহা কোন ভুল বা অজ্ঞানতা নয়। বরং ইহাও জামাআতে সারিবদ্ধ হওয়ার একটা বৈধ পদ্ধতি। প্রচলিত পদ্ধতির অভ্যস্ততায় মাসআলাটি যাতে অজ্ঞানতার আবর্তে ভেসে না যায়। তাই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)

প্রচলিত পদ্ধতির সাথে সাথে শিষ্যবৃন্দকে উল্লিখিত পদ্ধতিটিও শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তিনি অধ্যবসায়ের সাথে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সান্নিধ্য আঁকড়ে ধরেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি অন্য সকল সাহাবীর অগ্রভাগে। কোন জামায়াতে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। সুহবত লাভের এ সুদীর্ঘকালে কখনো কি এমন ঘটেনি যে তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে দু'মুক্তাদী বিশিষ্ট জামাআতে শরীক হয়েছেন? বা তাঁকে এরূপ জামাআত আদায় করতে দেখেছেন? এবং প্রিয় নবী (সাঃ) তাতে ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন? এ-ত হতেই পারে না যে না দেখেই তিনি স্বকপোলকল্পিত একটা তরীকার প্রচারে লিপ্ত হয়ে যাবেন।[১]

হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ বর্ণনা করেন যে তিনি স্বীয় পিতৃব্য আলকামার সাথে একদিন দ্বিপ্রহরে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত হন। তারা তাঁর সাথেই জোহরের নামায আদায় করেন। নামাযে তারা একজন তাঁর ডান পার্শ্বে এবং অন্যজন বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সালামের পর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইরশাদ করেন যে, প্রিয় নবী (সাঃ) ইমামসহ তিনজনের জামাআতে এভাবেই সারিবদ্ধ হতেন। লক্ষণীয় যে হযরত আসওয়াদ (রঃ)-এর এ বক্তব্য একথা প্রতিভাত হয়নি, যে তারা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বিলকুল বরাবর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুধু এতটুকুই স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা দু'জন ইমামের দু'পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলতে পারি যে, তিনি ইমাম ও মুক্তাদীর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে এতটুকু সম্মুখে দাঁড়িয়েই ইমামতী করেছিলেন। হতে পারে যে, রাবী স্বীয় বর্ণনায় এ স্বাতন্ত্র্যতাকে উল্লেখ করেন নি। ইবনে শিরীন (রঃ) এ হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) যে মসজিদে অবস্থান করেছিলেন তার প্রস্থ যৎসামান্য হওয়ার ফলেই তিনি এভাবে নামায পড়েছিলেন। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জামাআতে এভাবে সারিবদ্ধ হওয়াই শরীয়তের নির্দেশ। যেমন দু'জন মুক্তাদীর একজন যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে ইমাম মাঝখানে এবং তারা দু'জন দু'পার্শ্বে দাঁড়াবে। হযরত আনাস থেকে বর্ণিত:

---

১. কে না জানে যে প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি যা করিনি বা বলিনি এমন বিষয়কে যে আমার বলে চালিয়ে দেয় সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নেয়। নবীজী (সাঃ) আরো বলেন যে কোন কথা শোনামাত্রই যে ব্যক্তি তা প্রচারে লিপ্ত হয় অথচ সে তার সত্যাসত্য যাচাই করেনি ইহাই তার মিথ্যার জন্য যথেষ্ট।

صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم انا و يتيم لنا و ام سليم خلفنا

"আমি ও আমাদের পরিবারের একটি ছোট বালক রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলাম আর উম্মু সুলাইম আমাদের পশ্চাতে ছিলেন।"

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল বাদায়ে'তে বলেন :

هو السنة الدائمة المستمرة اذا كان احد المامومين صبيا ـ

মুক্তাদীদ্বয়ের একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হলে উল্লিখিত নিয়মে দাঁড়ানোই সুন্নত। উক্ত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ৮৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন :

فالامام مخيره بان يقف في وسطها الرجل عن يمينه و الصبي عن يساره و بين ان يقفا جميعا عن يمينه ان كانت الصلاة فرضا و ان كانت نافلة جاز ان يقفا خلفه اما عليه فقال اذا كان رجل و غلام لم يدرك في صلاة الفريضة فليقم الرجل و سطهم بينهما كما فعل ابن مسعود في الفريضة ـ

নামায ফরয হলে, ইমাম ইচ্ছা করলে সারির মধ্যস্থলে দাঁড়াতে পারে, তখন ছোট বালক তার বাম পার্শ্বে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লোকটি তার ডান দিকে দাঁড়াবে যেমন হযরত ইবনে মাসউদ করেছেন। অবশ্য তারা উভয়েই ডান দিকে দাঁড়াতে পারে। আর নফল নামায হলে তারা উভয়ে পিছনে দাঁড়াবে।

কুরআন ও হাদীসের সাথে ফিকাহ্‌র সম্পর্ক

রাসূলে করীম (সাঃ) নবুওতের সুদীর্ঘ তেইশ বছর জীবনে উম্মতের কাছে যে হিদায়েত পৌঁছিয়েছেন তার সমষ্টির নাম দীন। ইরশাদ করেন :

قد تركت فيكم ما ان تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله ـ

আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা মজবুতীর সাথে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিভ্রান্ত হবে না—তা আল্লাহ্‌র কিতাব।[১]

১. বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণের এ অংশটি আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজা, ইবনে আবী শাইবা ও বায়হাকী ইত্যাদি সুনান গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে। ইমাম জাফর সাদেক স্বীয় পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রঃ)-এর মাধ্যমে হযরত জাবির বিন আব্দিল্লাহ (রাঃ) থেকে এ হাদীস খানি বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীসে শুধু "কিতাবুল্লাহ্" উল্লেখিত হয়েছে। এবং এর অনুসরণের জোর তাকীদ করা হয়েছে। তবে ইমাম তিরমিযী (রঃ)-এর সুনানগ্রন্থে হাদীসটি و عترتى اهل بيتى ("আর আমার পরিবার পরিজন আমার আহলে বায়ত")

আল-কুরআনের তাবলীগের সাথে সাথে তার ব্যাখ্যা ও তাফসীর করাও রাসূলে পাক (সাঃ)-এর দায়িত্বভুক্ত ছিল। ইরশাদ হচ্ছে

و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم -

"আমরা আপনার উপর এ কুরআন নাযিল করেছি যাতে আপনি তাদের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারেন।[১]

আয়াতে উল্লেখিত ব্যাখ্যা ও তাফসীরই হল প্রিয় নবী (সাঃ)-এর হাদীস। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه -

---

বাকী অংশ এ অংশের বৃদ্ধির সাথে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীর সনদে আকর বিন সালেক থেকে বর্ণনাকারী হলেন সায়েদ বিন হাসান আনবাতী। মুহাদ্দিসগণ তাকে যয়ীফ ও দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তদুপরি যে তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত অংশের সংযোজন থাকলেও تركت বা تركن অথবা এর সমার্থক কোন শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ১০৪ পৃষ্ঠায় দেখেন,

قد سئل عن احمد ان حنبل فضعفه و ضعفه غير و احد من اهل العلم و قالوا لا يصح -

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ)-এর নিকট এ হাদীসটি সম্পর্কে (সায়েদ বর্ণিত বর্ধিত অংশের সাথে) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এটিকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেন। তিনি ছাড়াও একাধিক মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। তারা বলেন যে হাদীসটি সহীহ্ নয়।

১. সূরা নাহ্ল

তদুপরি যে ইহা ইমাম মালিক (রঃ)-এর নিজস্ব উক্তি নয়। মুওয়াত্তা মালিকের সকল ভাষ্যকারই এ কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর বালাগাত অর্থাৎ সনদবিহীন বর্ণিত রিওয়ায়েত সমূহের চারটি ব্যতীত সবই মারফূ অর্থাৎ প্রিয়নবী (সাঃ)-এরই বাণী। উল্লেখ্য যে এ হাদীসখানি উক্ত চারটির অন্তর্ভুক্ত নয়। এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনু আব্দিলবার আত্তামহীদ গ্রন্থে বলেন

هذا حديث محفوظ مشهور عن النبي صلى الله عليه و سلم عند اهل العلم شهرة يكاد يستغني بها ان الاسناد -

"এ হাদীসটি সুরক্ষিত, প্রিয়নবী (সাঃ) থেকে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এর শুহরত এত পরিব্যাপ্ত যে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের কোন আবশ্যক নেই"। উপরন্তু—এ হাদীসখানির মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদ বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যুরকানী'র ৪র্থ খণ্ডে ৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এ হাদীসটির সনদ এরূপ

كثير ان عبد الله بن عمر و ان عوف عن ابيه عن جده -

কাছীর বিন্ আব্দিল্লাহ বিন্ আমর বিন আওফ তার পিতার মাধ্যমে স্বীয় দাদার থেকে বর্ণনা

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেন তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দুটি আঁকড়ে ধরবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত।

প্রশ্ন হল যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে নববীর পর ফিক্হার এত আবশ্যকতা কেন? যে এর অনুসরণ না করলেই নয়? অথচ রাসূলে করীম (সাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ দুয়ের অনুসরণকে লাজিম করে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন যে এদুয়ের অনুসরণের পর কোন প্রকার পদস্খলনের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে না। সন্দেহ নেই যে, প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী। তবে সাথে সাথে আমাদের যে একটা বাস্তব ও হাকীকতকে বুঝে নিতে হবে যাদ্বারা এ প্রশ্নটির অসারতা বা সারবত্তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

আল-কুরআনে ইবাদত সম্পর্কীয় অনেক হুকুম আহকাম রয়েছে। কোন কোন ইবাদতের একাধিক অংশও বর্ণনা করা হয়েছে, তবে সে সব ইবাদতের বৃহৎ ও খুটিনাটি বিষয়ের চুলচেরা বর্ণনা ও বিন্যাস আল-কুরআনুল করীমে বর্তমান নেই। আপনি কুরআন করীম তিলাওয়াত করুন। এর

করেন। আবু নঈম ইসপাহানী তারীখে ইসপাহানের ১ম খণ্ডে ১০৩ পৃষ্ঠায় সনদটি এভাবে উল্লেখ করেছেন :

حدثنا عبد الله محمد احمد بن الخطاب حدثنا طالوت بن عباد
حدثنا هشام بن سلمان عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك ان رسول
الله صلى الله عليه و سلم قال تركت فيكم بعدى ما اخذتم ان تضلو
كتاب الله و سنة نبيكم -

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب الناس
فى حجة الوداع انى قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا
كتاب الله و سنة نبيه -

মুস্তাদরাকে হাকীম ১ম খণ্ডে ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী শরীফের বাবু আদাবিলকাযী ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠায় এবং কানযুল উম্মালের প্রথম খণ্ডেও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انى قد
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله و سنة و لن يفترقا حتى
يردا على الحوض -

ভেতর 'মুয়ামালাত' ও লেন-দেন সম্পর্কীয় নীতিমালা, 'মুআশারাত' ও সামাজিকতাসহ একটা পূর্ণাঙ্গ দীনের জন্য অপরিহার্য সব কিছুই তাতে পরিলক্ষিত হবে। আরো একটু দৃষ্টিক্ষেপণ করুন দেখবেন যে এ সব নীতিমালা ও হুকুম আহকাম সব কিছুই মৌলিক পর্যায়ের এ সবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাতে অনুপস্থিত। হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন, দেখবেন যে, তাতেও শাখাগত বিষয়ের বর্ণনা থাকলেও অনেক কিছুই তাতে মূলনীতি হিসাবেই উপস্থাপনা করা হয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। সুতরাং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত স্পষ্ট হুকুম আহকামের অনুসরণকে অপরিহার্য করতঃ অন্যান্য বিষয়াবলীকে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়, তবে মনুষ্য জিন্দেগীর জন্য চলার দুটি পথই বের হয়ে আসে ১. জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সংকুচিত করত সন্ন্যাস সুলভ জীবনে অভ্যস্থ হওয়া। এভাবে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে অন্যের গলগ্রহ করে তোল, ২. ধর্মবিমুখ হয়ে প্রবৃত্তির চাহিদানুসারে গা ভাসিয়ে দেয়া। এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত না করে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে বস্তুগত উন্নতির পিছনে যেয়ে চলা। সন্দেহ নেই যে এ দুটি পথই ইসলামে চরম নিন্দনীয়। ইসলামে যেমন নিরেট বৈরাগ্যতার কোন্ স্থান নেই। তদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিতাও তার কাছে নিকৃষ্টতর জীবন্ প্রণালী। এ দু'নীতির প্রেক্ষিতেই ইসলামের স্বাতন্ত্রতা ফুটে উঠেছে।

কেবল মুসলিম নয় এটা সকল গুণী—সুধীরই দাবী যে, জীবনেরসমূহ ক্ষেত্রের জন্য সার্থক দিক নির্দেশনা একমাত্র ইসলামেই আছে। কিন্তু উল্লিক্ষিত দু'টি পথ এ যুগান্তকারী দাবীর সম্পূর্ণ মুখালিফ ও প্রতিকূলে।

বস্তুতঃ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মাসআলাসমূহের প্রতিটি এক এক বিষয়ের মূলনীতি স্বরূপ, এ মূলনীতির অনুসরণ তখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে, যখন আমরা তার সকল শাখা-প্রশাখা ও অংশগত বিষয়েও সে নীতির অনুসরণ করব। ফুকাহা ও মুজতাহিদগণ হাজার সাধ্য-সাধনা ও জাদ্দজাহ্দ করতঃ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে তার সকল শাখাগত বিষয়কে নির্ধারিত করেছেন। মূল ও শাখার সামঞ্জস্য বিধান করে তার মাসআলা বা হুকুম উদ্ঘাটন করেছেন। ফুকাহা-মুজতাহিদগণ কর্তৃক উদ্ঘাটিত এসব মাসআলার সমষ্টিকেই ইসলামী পরিভাষায় ইলমে ফিকাহ্ বলা হয়। এর অনুসরণের মাধ্যমে আমরা জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে ইসলামের আলো বিকিরণ করতে পারি। ফলে জীবনের কোন দিকই ইসলামের

আওতা বহির্ভূত থাকবে না। মনে রাখতে হবে যে, এক মাত্র এ পথেই "ইসলাম কালজয়ী" আমাদের এ দাবীর যথার্থতা প্রমাণিত হতে পারে।

কুরআন ও হাদীসের হুকুম-আহকাম সন্দেহাতীত। সাথে সাথে এগুলো সীমিত। উলামায়ে কিরাম এগুলোকে গণনা করে দেখেছেন। বলা বাহুল্য যে একমাত্র সীমিত আহকামই পরিসংখ্যানযোগ্য। এগুলো যদি সীমাহীন হত তাহলে কখনো হিসাব-নিকাশ করতঃ এর সংখ্যা নির্ধারণ সম্ভব হত না। অথচ আমাদের উলামায়ে কিরাম পরিষ্কারভাবে কুরআন ও হাদীসের সর্বমোট হুকুম-আহকামের পরিসংখ্যান নিয়েছেন। মুল্লা জিয়ন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাফসীরে আহমদিয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, আল-কুরআনের যেসব আয়াত থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাত হয় তার সংখ্যা দেড়শতের অধিক নয়। এ ধরনের হাদীসও অনুর্ধ্ব পাঁচশত।" তবে এ সবগুলোই যেহেতু মূলনীতির পর্যায়ের। তাই সীমিত এসব হুকুম-আহকাম থেকে অসীম জুযইয়্যাত বা শাখাগত বিষয়ের মাসআলা উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়। আপতিত সকল সমস্যা ও নব-অভিনব সকল শাখা-প্রশাখাকে সে সব মূলনীতির সাথে তুলনা করে সমাধানের পথ বের করা হবে। নিত্য বয়ে চলা এ জীবনে যেহেতু নুতন নতুন সমস্যাদির আপতন ঘটে—ঘটবে তাই ফিকহে ইসলামীর পরিসরও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকবে কিয়ামত কাল পর্যন্ত। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রঃ) বলেন :

وكانت الحوادث لا تأتى الى حدو لم يكن ما نص الا وانل كانوا
لجمع الحوادث فاذ نعوا الى التخرج على نصوصهم ثم جمع الفتوى
و الواقعات ثم ترجيح بعض الا قوال ولواجوه على بعض -

জীবনের প্রবাহমান ঘটনাবলীর জন্যে উদ্‌ঘাটিত মাসআলাসমূহ যথেষ্ট নয়। তাই পুরাতন মাসআলার আলোকে আপতিত সকল বিষয়ের জন্য শরীয়তের নির্দেশ উদ্‌ঘাটন করতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সকল সমস্যাদী ও উদ্ভূত ঘটনাবলীকে সংহত করতঃ সে বিষয়ভুক্ত মাসআলাসমূহকে একত্র করে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। ইখতিলাফ বা দ্বন্দ্ব দেখা দিলে একটি অন্যটির উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রাধান্য দিতে হবে।

আপতিত সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে। তা হল: আমরা পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখব যে, অভিনব এ বিষয়টি উলামায়ে কিরাম কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত মাসআলাসমূহের কোনটার সাথে অধিক

সামঞ্জস্যশীল। পরস্পর এ সামঞ্জস্য ও পার্থক্যের ভিত্তিতে যথার্থ মাসআলা উদ্ভাবনকেই ইজতিহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। খলীফাতুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাঃ) বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে যে বিচার নীতি লিখে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন :

الفهم الفهم فى ما يختلج فى صدرك مما لم يبلغك فى الكتاب و السنة اعرف الا مثال و الاشباه ثم قس الا امور عند ذالك فاعمد الى احبها الى الله و اشبهها بالحق فى ماترى -

যে ব্যাপারে তুমি পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে না পার এবং কুরআন সুন্নাহ্‌র সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাও, তাতে গভীর মনোযোগীতা এবং চিন্তা-ভাবনা সহকারে পদক্ষেপ নেবে। তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করবে এবং ইজতিহাদ করবে। দেখ, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে যা অধিক পছন্দনীয় এবং হক এর অধিক নিকটবর্তী অনুমিত হবে তাতেই তুমি সিদ্ধান্ত নেবে।[১]

হযরত উমর (রাঃ)-এর এ বাণীতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইজতিহাদ কোথায় করা যাবে এবং তার নীতি কি হবে। অর্থাৎ কুরআনে করীম ও হাদীসে পাকে যে মাসআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই কেবল সে সম্পর্কেই ইজতিহাদ প্রযোজ্য। নতুবা এতদুভয়ে উল্লেখিত মাসআলার ইজতিহাদের অনুমতি নেই। ইজতিহাদের জন্য অপরিহার্য শর্ত হল যে প্রতিপাদ্য বিষয়কে কুরআন ও হাদীসের দ্ব্যর্থহীন আহকামের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। তার সাথে যা অধিক সামঞ্জস্যশীল তার উপরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী মুতাবিক যদি বিষয়টি জারী করা হয় তবেই সে ইজতিহাদ শরীয়তে অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

الا سلام مجموع امرين الدين و الشريعه اما الدين استوفاه الله كله فى كتابه الكريم و لم يكل الناس الى عقولهم فى شئ منه اما الشريعة فقد استوفى اصولها ثم ترك للنظار الاجتهاد فى تفصيلها -

ইসলাম দুয়ের সমষ্টির নাম। ১. দীন, ২. শরীয়ত। দীন বিশ্বাস গত বিষয়ের নাম। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমের ভেতর এ সম্পর্কীয়

১. দারু কুতনী ৫১২ পৃঃ।

সব কিছুই বর্ণনা করেছেন। মানুষের জন্য কিছুই ছেড়ে দেননি। তাদের আকল ও বুদ্ধির কোন্ অধিকার নেই এ ব্যাপারে বিচার বিবেচনা বা কিছু কেন করবার। শরীয়ত বা আমল সম্পর্কীয় বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা আল-কুরআনে দেয়া হয়নি। কেবল উসূল বা মৌলনীতিই তাতে বিধৃত হয়েছে। যাতে মানুষ সে মূলনীতির আলোকে চিন্তা-গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে নিজেদের আমলের ক্ষেত্র তৈরী করে নিতে পারে। জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত করতে পারে। শরীয়তের ব্যাপারে ইজতিহাদের এ সুযোগ আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিয়ামত। মহাকালের ঘূর্ণন চক্রে অবস্থাদীর সবিশেষ পরিবর্তন ঘটে। এতে নিত্য নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। নতুনতর প্রয়োজন প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় মানুষ যদি তাদের এসব চাহিদা ও প্রয়োজন সমাধানে সক্ষম না হয় তবে দীনের উপর তুষ্ট থাকা তাদের জন্য কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের জীবনে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ তা'আলা তাই কেবল মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেছেন। সেসবের তাফছীল বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং সময়োপযোগী দিক নির্দেশনার জন্য মানুষকে ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছেন।

আল-কুরআন নামাযের নির্দেশ দিয়েছে। সুন্নত তার বিন্যাস ও রূপ নির্ধারণ করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, নামাযে আমরা যে সব আমল করে থাকি, নামাযে যতগুলো অঙ্গ-প্রতঙ্গ রয়েছে সবগুলোর মান সমান কিনা, না এসবের মাঝে পরস্পর মর্যাদাগত কোন পার্থক্য রয়েছে। ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে যেসব নফল ও সুন্নত নামাযের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং আমরা যেগুলো আদায় করে থাকি সবগুলোই কি অভিন্ন মর্যাদার অধিকারী? সবগুলোর গুরুত্ব কি সমান?

ফুকাহায়ে কিরাম উল্লেখিত অংশসমূহের ভেতর মর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, কোন্ অংশ ফরয এবং কোন অংশ্ ওয়াজিব এমনিভাবে সুন্নত ও মুস্তাহাবকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে কি আমল দ্বারা নামাযে পূর্ণত্ব আসে এবং কিসে নামায বিনষ্ট হয় বা ত্রুটিপূর্ণ হয় তাও তাঁরা বাতলে-দিয়েছেন। নামাযে সংগঠিত কোন্ কোন্ ত্রুটিকে নাওয়াফেল দ্বারা কোন কোন্ ত্রুটি সিজদাতুস্‌সহু দ্বারা এবং কোন ত্রুটিকে একমাত্র তওবা দ্বারা প্রতিকার করা সম্ভব তাও তারা যথাযথভাবে বর্ণনা করে গেছেন।

বলা বাহুল্য যে "ইজতিহাদ"ই তাদেরকে এ পথে রাহনুমারী করেছে। কেবল নামাযই নয় ইবাদত, আখলাক ও লেনদেন এবং সমাজ সংক্রান্ত সবকিছুর মাঝেই তারা উল্লিখিত শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। আর এতে ইজতিহাদই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন।

আল-কুরআন আমাদেরকে 'বায়' বা বেচাকেনার অনুমতি দিয়েছে। হাদীস এজন্য ইজাব কবুল এবং একটা বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু ক্রেতা এবং বিক্রেতা প্রত্যেকের জন্য ইজাব কবুলের শব্দাবলী উচ্চারণকে আবশ্যক করে দেয়নি। এমনিভাবে এতে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিকেও ওয়াজিব করা হয়নি। বেচাকেনার ভেতর না হলেই নয় এমন শর্তাবলী কি কি? কোন কোন শর্ত তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কি কি বিষয় এতে মুস্তাহাব পর্যায়ের এসব হাদীসে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত হয়নি। ফুকুহায়ে কিরাম এগুলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত করেছেন। ইলমে ফিকাহ্‌র মাধ্যমেই এগুলো আমরা জানতে পারি।

ব্যবহারিক জীবনে ক্রয়-বিক্রয়ের মত বিয়ে-শাদীও একটি অপরিহার্য বিষয় বায় এর মত ইহাতেও ইজাব ও কবুল জরুরী। তবে ইজাব কবুলের শব্দাবলী 'বায়'র ভেতর ক্রেতা ও বিক্রেতার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া জরুরী ছিল না। কিন্তু নিকাহ্'র ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়। এখানে বর-কনেকে অথবা তাদের স্থলাভিষিক্ত কাউকে ইজাব কবুলের শব্দ অবশ্যই উচ্চারণ করতে হবে। অন্যথায় আক্দ সহীহ্ হবে না। 'বায়'র মত নিকাহ্ সাক্ষী ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। ইহাতে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি অপরিহার্য। বলা বাহুল্য যে এসব কিছুই আমরা ফিকাহ্‌র মাধ্যমেই জানতে পাই।

কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত সুস্পষ্ট মাসআলাসমূহ এর আলোকে মুজতাহিদগণ কর্তৃক উদ্ঘাটিত মাসআলা এক পর্যায়ের নয়। ফকীহগণ এতদুভয়ের মাঝে ঈমান ও আমলগত পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

في صدر العهد العباسي لكن الاستنباط و استقرت اصوله و جعل لفظ الفقه ينتهي بالتدرج الى ان يكون غير مقصور على المعنى الاصلي الى الاستنباط من الادلة التي ليست نصوصا-

আব্বাসী যুগের প্রথম দিকেও কেবল ইজতিহাদকৃত মাসআলাকেই ফিকাহ নামে অভিহিত করা হত। যদিও আজ এ শব্দটি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমলগত হুকুম আহকাম তা কুরআন ও হাদীস দ্বারাই-

ছাবিত হোক বা ইজতিহাদ দ্বারা উদ্‌ভাবিত হোক এ সমূহের সমষ্টিকেই আজ ফিকাহ্‌ বলা হয়।[১]

و الفقه هو نصوص القرآن و السنة الظاهرة المستعملة و ما ارتضاه كبار الصحابة فاروه لهم غيرهم من الصحابة ام ما سمعوه هم و قليل من الفتوى صادرة عن ارائهم بعد الاجتهاد و البحث ـ

কুরআন ও হাদীসের উল্লেখিত হুকুম আহকাম, প্রবীণ সাহাবায়ে কিরামের মতামত, তা অন্য কোন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হলেও এবং তাদের আলোচনা পর্যালোচনা ও ইজতিহাদ দ্বারা সমাধাকৃত সবকিছুকেই পরবর্তী ইসলামী পরিভাষায় ফিকাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা চান যে তার বান্দাহগণ স্বেচ্ছায় সহজভাবে তার হিদায়াত কবুল করুক। সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করুক। এজন্য তিনি অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নতুন নতুন আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। সবশেষে হৃদয়গ্রাহী কিতাব আল-কুরআনকে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ হিসাবে নাযিল করেছেন। শ্রেষ্ঠতম ভাষা আরবীকে এর মাধ্যম হিসাবে কবুল করেছেন-যা শ্রবণেন্দ্রীয়ে শুধু মধুই বর্ষণ করে। অহরাত্র তিলাওয়াত করলেও একটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তি আসে না কারুর মনে। সাথে সাথে প্রিয়নবী (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন রহমাতুল্লিল আলামীন করে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে حريص عليكم তিনি তোমাদের ঈমানি আমলে খুবই লোভী। আল্লাহ্‌ যেমন মানুষের উভয় জাহানের মঙ্গলই চান। তেমনি ভাবে প্রিয়নবী (সাঃ'-এর মনেও এ আকাংখা ছিল অনন্ত অসীম। তাই আল-কুরআন ও হাদীসে পাকের উপস্থাপনাকে খুবই সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে। যাতে অতি সহজেই সবাই হিদায়াতের বাণী কবুল করে নেয়। বিলক্ষণ ছুটে চলে সফলতার পথে। কুরআন ও হাদীসের ভেতর মানুষের মন-জাগতিক খোরাক অজস্র। মনস্তাত্বিক শরাব-সুরার কুরআন ও হাদীস ভরপুর। তাই পাঠান্তেই মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ঝুকে পড়ে ইবাদতের দিকে। হিদায়াতের জন্যে সে পাগল পারা হয়ে ওঠে। কিন্তু সকল মানুষ সমান যোগ্যতার অধিকারী নয়। কুরআন ও হাদীসের অকূল অতল সাগর থেকে মানিক খুঁজে আনার সৌভাগ্য সবার হয় না।

১. মাবাহিস ফী তাশরীইল ইসলামী ২০৪ পৃষ্ঠা।

কদমে কদমে সকল ছন্দ পতনে কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি হিদায়েত খুঁজে আনার মত উচ্চতর প্রতিভা সবার নেই। এতটুকু অবসরও সবাই পায় না।

هذا فضل الله يؤتى من يشاء -

ইহাত আল্লাহ্র ফযল। যাকে ইচ্ছা হয় তাকে দান করেন। উলামায়ে ইসলাম উম্মতের উপর ইহসান করেছেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য কুরআন ও হাদীসের দিক নির্দেশনাকে সুসংহত করে দিয়েছেন। সেগুলোকে শ্রেণীবিবেধে বিন্যাস করত একটা পৃথক শাস্ত্রের রূপ দিয়ে আমাদের হাতে হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ফলে অতি সহজেই আমরা জীবনের প্রতিটি লহমায় ইসলামী দিক নির্দেশনার ইত্তিবা' করতে পারছি। সুতরাং আমাদের চলার পথে ইসলামী ফিকাহ্[১] এবং ফুকাহায়ে কিরামের অবদান অপরিসীম। তাদের ঋণ অশোধ্য।

১. ফিক্হ শব্দের আভিধানিক অর্থ খুলে ফেলা বা ছিড়ে ফেলা। পরবর্তীতে ইহা জানা বা বুৎপত্তি লাভ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে নেহায়া ৩য় খণ্ড ৪৩৭ পৃষ্ঠা, লিছানুল আরব ১৭ খণ্ড ৪১৮ পৃষ্ঠা। ফিক্হ মূলতঃ দীনী বুৎপত্তি লাভের নাম। তাজকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি ব্যতীত এ সৌভাগ্য কারুর নসীব হয় না। আল্লামা রশীদ রেজা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন :

ذكرت هذا اللفظة فى عشرين موضعا من القرآن تسعة عشر منها فدل علما ان المرد به نوع خاص من دقة الفهم و التعمق فى العلم الذى يترتب عليه الا انتفاع به -

আল কুরআনে ফিক্হ শব্দটি বিশ জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। এর উনিশটিই সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং গভীর ইলমের অর্থ বুঝিয়েছে। বাবারা সহীহ্ ও বিশুদ্ধ আমলের পথ খুলে যায়। হাকীম তিরমিযী বলেন : কোন বিষয়ের ফকীহ্ হওয়ার অর্থ হল, সে বিষয়ের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। সে বিষয়ের গভীরতায় পৌঁছে তার মৌলিকত্ব উদ্ধার করা। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ের কেবল বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থের ক্ষেত্রেই ঘুরপাক খায় সে কখনো ফকীহ্ হতে পারে না। তাফসীর ও লুগাতের ইমাম আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী বলেন :

الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد فهوا خص من العلم ؛

ফিক্হ অর্থ হল : কোন বিষয়ের বাহ্যিক জ্ঞানের মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান লাভ করা। সন্দেহ নেই যে ইলম একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং ফিক্হ তার একটি বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যময় অংশ।—মুফরাদাত ৩৯১ পৃঃ এজন্যই ফকীহ'র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে

الفقيه من ارفق النظر الفقيه العالم الذى يشق الا حكام و يفتش عن حقائقها و يفتح ما استغلق منها -

প্রশ্ন জাগে যে, এ কাজ যদি উলামায়ে কিরাম কর্তৃকই সাধিত হয় তবে ইহা দীন বলে বিবেচিত হবে কিনা? এর সমাধানের জন্য আমাদেরকে চারটি বিষয়ের প্রতি দৃকপাত করতে হবে।

১. ইজতিহাদ কাকে বলে? ২. শরীয়ত ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছে কিনা? ৩. এ ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি কি ছিল? ৪. কোথায় এবং কেমন স্থানে ইজতিহাদের অনুমতি আছে?

সুন্নতের অনুসারী বলে দাবী করে এমন এক সম্প্রদায় ত কিয়াস করাকে

ফকীহ্ ঐ তীক্ষ্ণদর্শী আলিমকে বলা হয়, যিনি দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়তের নির্দেশ চয়ন করেন। আহকামের হাকীকত উদ্ধার করেন এবং সকল অস্পষ্ট ও সংশয় দূরীভূত করত : শরয়ী নির্দেশের বাস্তবতা ও হকানিয়তকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন—তহ্ যবী। তৃতীয় পর্যায়ে এসে ফিক্হ'র অর্থ আরো ব্যাপক হল। যেহেতু তীক্ষ্ণতর ইল্‌ম একমাত্র আমলই যার উদ্দেশ্য এমন জ্ঞানকেই ফিক্হ বলা হয়, তাই অবশেষে ইহা ইলমে দীন এর সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে পরিগণিত হল। আল্লামা রাগিব বলেন :

وغلب على الدين لسادته و شرفه و فضله على سائر انواع العلم

ইলমে দীনের উপরই ফিক্হ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়। কেননা এ ইল্‌ম স্বীয় মর্যাদা ও ফযীলতের ফলে অন্যান্য ইলমের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। নিহায়ুল আরব ৪১৮ পৃষ্ঠা।

ইলমে শরীয়ত ও তার শাখাগত জ্ঞানকে পরিভাষায় ফিক্হ বলা হয়—নিহায়া ৩য় খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠা।

তুহ্ফাল মুহ্তাজ গ্রন্থে ও ফিক্হর অনুরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন :

وهو الوقوف على معانى نصوص الشريعة و اشاراتها و دلالاتها و مضمراتها و مقتضياتها و الفقيه اسم للواقف عليها -

কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি অর্থ ও তার ইশারা ইঙ্গিত উপলব্ধি করা অন্তর্ভুক্ত ও উহ্য বিষয়াদী অবিহিত হওয়া এবং তার দাবী ও চাহিদানুসারে এতদুভয়ের উপর গভীর পারদর্শীতা লাভই মূলত ইলমে ফিকাহ্—আল আশবা হুওয়া মাল্লাইর ১ম খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা।

উপরোল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী আমরা ফিকহর যে পরিচয় পেলাম তাতে প্রতিভাত হয়েছে যে কুরআনে করীম ও হাদীসের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। আল্লামা সুয়ূতী বলেন :

ان الفقه معقول من المنقول -

কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে সাধারণ নীতি হিসাবে পেশ করাই ফিকাহ্। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন :

ان الناس تصرفوا فى اسم الفقه فخصوه فى علم الفتوى و الوقوف على دلائلها و عللها و اسم الفقه فى العصر الاول كان مطلقا على علم الاخرة و معرفة دقائق النفوس والاطلاع على الاخرة و حقارة الدنيا -

নাজায়েয ও অবৈধ বলে ফতোয়া জারী করেছেন। অথচ খোদ কুরআনে করীমই এর ইজাযত দিয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ ও কিয়াস সম্পর্কীয় ঘটনারাবীতে ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ ভরপুর হয়ে আছে। শায়খ মুহাম্মদ খিজরী বলেন ঃ

بينما نهم (الصحابة) يعمدون الى الفترى بالرأى ان لم يكن عندهم في الحادثة نص من القرآن و السنة و الرأى عندهم اذا كان للعمل بما فروله مصلحة و اقرب للروح لتشريع الاسلامى من غير نظر الى ان يكون هناك اصل معين للحادثة اولا يكن -

সাহাবায়ে কিরাম যে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের কোন সমাধান না পেতেন সেখানে নিজস্ব ইজতিহাদ ও কিয়াসের উপর নির্ভর করতেন। হ্যাঁ! তাদের সে কিয়াস ও ইজতিহাদ দীনি মুছলিহাতের ভিত্তিতেই সাধিত হত। তা রূহে ইসলামী এবং শরীয়তের মৌল দাবীর অতীব নিকট-তম হত।

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় দীনের মূল ভিত্তি ছিল ওহী ইলাহী অর্থাৎ কিতাব-সুন্নাহ এবং প্রিয়নবী (সাঃ)-এর রায় ও ইজতিহাদের উপর। সাহাবায়ে কিরামও তখন রায় প্রদান করতেন। তাদেরও ইজতি-হাদ করবার অনুমতি ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর খিলাফতে রাশেদার যুগেও এ নীতি বিদ্যমান ছিল। কিতাব ও সুন্নাহ্র মাঝে কোন বিষয়ের সমাধান না পেলে তাঁরা কিয়াস ও ইজতিহাদের অনুবর্তী হতেন। সুতরাং কিয়াসকে নাজায়েয বলে ফতোয়া দেয়া শরীয়তে ইসলামী সম্পর্কে অজ্ঞ-তারই পরিচায়ক। সন্দেহ নেই যে এ ফতোয়া এ যুগের উলামায়ে কিরামকে পার হয়ে খিলাফতে রাশেদার পবিত্র জমানাকেও শিলাঘাত করে।

১. ইজতিহাদ কি ?

আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন আলী সাইফুদ্দীন আমেদী বলেন ঃ

اما الاجتهاد فهو فى اللغة عبارة عن استفراغ الوسع فى تحقيق امر من الامور مستلزم للطفة و المشقة و لهذا يقال اجتهد فلان فى اجتهد

উলামায়ে কিরাম ফিকহ্ শব্দে পরিবর্তন এনেছেন। তারা ফতোয়া ও তার দলীল এবং কার্যকারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার মধ্যেই ফিকহ শব্দকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন, অথচ পূর্বে সাধারণ ভাবে পরকালীন ইলমের নামই ছিল ফিকহ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং পারিক জীবনের নীচুতাজ্ঞান এ ইলমের আওতাভুক্ত ছিল।

حجر الرزازة و لا يقال اجتهد فلان فى حمل خردلة و اما فى اصطلاح
الا صوليين فمخصوص باستفراغ الوسع فى طلب الظن بشئى من الاحكام
الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه -

ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ হল কোন কর্মে সর্বশেষ শক্তি ব্যয় করা। যাতে মানুষ পরিশ্রম ও কষ্ট অনুভব করে। বলা হয়ে থাকে যে অমুকে কাপড়ের গাঠরী বহনে ইজতিহাদ করেছে অর্থাৎ এতে তাঁর অসম্ভব পরিশ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু অমুকে শর্ষেদানা তুলতে ইজতিহাদ করেছে এ কথা বলা সহীহ্ নয়। কেননা বাহকের এতে কোন কষ্ট হয় না। সে তা অনায়াসে বহন করতে পারে। পরিভাষায় আহকামে শরীয়ার কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত লাভের জন্যে সর্বশেষ ক্ষমতা প্রয়োগকে ইজতিহাদ বলা হয়।[১]

শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন। ইজতিহাদ কোন নয়া হুকুম দেয়ার নাম নয়। কেননা এমনতর অধিকার কারুর নেই। ইজতিহাদ হল কোন মাসআলা লাভের জন্যে কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং আরবী লুগাতে দলীল প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্যে নিমগ্ন হওয়ার নাম।[২]

২. ইজতিহাদ কি শরীয়ত অনুমোদিত ?

কিতাবুল আহকামে কুদাজী আমেদী লিখেছেন

قال الله تعالى و شاورهم فى الامر و المشاورة انما تكون فيما
يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق الوحى -

"আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন" আপতিত বিষয়ে তাদের সাথে মুশাওয়ারাহ করুন।" বলা বাহুল্য যে মুশাওয়ারাহ কেবল সে সব বিষয়েই প্রযোজ্য যেখানে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পক্ষান্তরে যেখানে ওহী ইলাহীর ফয়সালা বর্তমান রয়েছে সেখানে মুশাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর।

হাদীসে পাকে ইজতিহাদের বৈধতার পক্ষে অজস্র দলীল বিদ্যমান রয়েছে। খোদ রাসূলে করীম (সাঃ) ও একাধিকবার ইজতিহাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লামা কুদাজী আমেদী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল আহকামে উল্লেখ করেন ঃ

---

১. আল আহকাম ১ম খণ্ড ২১৮ পৃঃ।
২. ফাতুহাতে মক্কিয়াহ ৩য় খণ্ড ৮৫৬ পৃঃ।

و روى الشعبى انه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضى القضية و ينزل القران بعد ذالك بغير ما كان قضى به فيترك ما قضى به و التهيم بغير القران لا يكون الا باجتهاد -

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেন যে, হুযূরে আকরাম (সাঃ) অনেক ব্যাপারে ফায়সালা দেবার পর তার পরিপন্থীতে কুরআনী আয়াত নাযিল হত। তখন তিনি স্বীয় ফায়সালা বর্জন করে কুরআনী হুকুম জারী করতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে কুরআনী হুকুম নাযিলের পূর্বে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সে ফায়সালা নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমেই সংগঠিত হত।

و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم ايضا انه قال فى مكة لا يختلا خلاها ولا يعضر شجرها فقال العباس الا الاذخر فقال عليه السلام الا الاذخر ومعلوم ان الوحى لم ينزل عليه فى تلك الحالة فكان الاستثناء بالاجتهاد۔

মক্কা মুকাররমার হুরমত বর্ণনা করিতে গিয়ে রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন এর কাঁটা কর্তন করা যাবে না এবং এর বৃক্ষ ও উৎপাটিত করা বৈধ নয়। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) আরয করলেন, তবে ইজখির বৃক্ষ কর্তনের ইজাযত দিন, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেন, তবে হাঁ ইজখির বৃক্ষ কাটতে পার। বলা বাহুল্য যে ইজখির কর্তন সম্পর্কে তখন ওহী নাযিল হয় নি। তিনি ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করেই এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইরশাদ হয়েছে :

العلماء ورثة الا نبياء وذلك يدل على انه كان متعبدا بالا جتهاد و الا لما كان علماء امة وارثة لذا لك عنه وهو خلاف الخبر -

উলামায়ে কিরাম নবীদের ওয়ারিস, প্রশ্ন হয় যে তাদের উপরত ওহী নাযিল হয় না। তবে তাদের প্রতিনিধিত্বের বুনিয়াদ কিসের উপর ? সন্দেহ নেই যে, একমাত্র ইজতিহাদের ভিত্তিতেই তারা প্রিয় নবী (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী হয়েছেন[১] এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসূলে পাক (সাঃ) ও ইজতিহাদ করতেন।

খশআম গোত্রীয় এক মহিলা সাহাবী রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নিকট আরয করলেন যে, ওগো আল্লাহ্র রাসূল ! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে

১০ আলআহকাম ৪র্থখণ্ড ২২৩ পৃঃ।

গিয়েছে। তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কিন্তু সে তা আদায় করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আমি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করতে পারি কি না? উত্তর দিলেন, বলত তোমার পিতা যদি ঋণী হত, আর তার পক্ষ থেকে তুমি যদি সে ঋণ আদায় করে দিতে তবে তা শোধ হত কি না? মহিলাটি উত্তর দিল, অবশ্যই তা শোধ হত। হুযূরে পাক (সাঃ) তখন বললেন, তা হলে শোন, আল্লাহ্র ঋণ অধিক আদায় যোগ্য।

এখানে রাসূলে করীম (সাঃ) আল্লাহ্র ঋণকে মানুষের ঋণের সাথে কিয়াস করেছেন, যে মানুষের ঋণে যদি প্রতিনিধিত্ব চলে তবে আল্লাহ্র কর্জে চলবে না কেন?

হযরত উম্মে সালমার কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করল যে, কোন স্বামী যদি রোযাবস্থায় তার স্ত্রীকে চুম্বন করে তবে তার রোযা সহীহ্ হবে কিনা? হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) উত্তরে বললেন যে হ্যাঁ তার রোযা সহীহ্ হবে। পরবর্তীতে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে একথা উল্লেখ করা হলে, তিনি উম্মে সালমা (রাঃ)-কে বললেন আচ্ছা আমিও যে রোযাবস্থায় তোমাকে চুম্বন করি তা কি তার কাছে বলেছিলে? তিনি উত্তরে বললেন যে হ্যাঁ বলেছিলাম।

উল্লিখিত রিওয়ায়েত দ্বারা অনুমিত হয় যে প্রিয় নবী (সাঃ) এদ্বারা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে কিয়াসের পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

একাধিক রিওয়ায়েত থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলে পাক (সাঃ) শরয়ী হুকুম আহকামের কার্য কারণ বর্ণনা করতেন। কার্য কারণের সাথে হুকুম সাবিত হওয়া অপরিহার্য। শরয়ী কানুনের কার্যকারণ যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই সে কানুনের অনুসরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য যে, ইহাই কিয়াস বা ইজতিহাদ। উদাহরণত বলা যেতে পারে যে, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন:

كنت نهيتكم لحوم الا ضاحى لاجل الرا فة فادخر وها ـ

আমি দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্যার্থে তোমাদেরকে কুরবানীর গোশ্ত জমা রাখতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং তোমরা এখন তা জমা করে রাখতে পার। অন্যত্র তিনি বলেন:

نهيتكم عن زياره القبور الا تز وروها فا نها تذكركم الا خرة ـ

আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে বারণ করেছিলাম। তবে এখন তোমরা করতে পার, কেননা ইহা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাঁচা খর্জুরকে শুষ্ক খর্জুরের পরিবর্তে বিক্রি করা জায়েয কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূলে করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন اينقص الرطب اذايبس ? কাঁচা খর্জুর শুকাবার পর কি কমে যায় ? তারা উত্তর দিল যে হ্যাঁ কমে যায়। তখন ইরশাদ হল যে فلااذن তাহলে এভাবে বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা ইহা সুদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত।

ইহরামাবস্থায় এক ব্যক্তি উটের পায়ে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু বরণ করে। রাসূলে পাক (সাঃ) তার মাথা ঢাকতে এবং খোশবু লাগাতে নিষেধ করলেন এবং বললেন কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তি তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত হবে। অর্থাৎ এ ব্যক্তি তখন মুহরিম হিসাবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। আর মুহরিমের জন্যে মাথা ঢাকা ও খোশবু লাগানো নিষিদ্ধ। এখানে রাসূলে করীম (সাঃ) মুহরিমের মৃত্যুর পরের অবস্থাকে জীবিতাবস্থার সাথে কিয়াস করেছেন। এ দ্বারাও রাসূলে পাক (সাঃ)-এর ইজতিহাদ প্রমাণিত হয়।

ওহুদের শহীদদের দাফন প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন : তাদেরকে তাদের যখম ও রক্তসহ কাফন দাও। কিয়ামতের দিবস তাদের শিরা থেকে রক্ত ঝড়তে থাকবে। সে রক্তের রং লাল হলেও তা থেকে মিশকের ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

বিড়ালের লেহ্য পাক কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم و الطوافات -

ইহা নাপাক নয়। কেননা বিড়াল তো সর্বদা তোমাদের কাছে আনাগোনা করে। নিদ্রা থেকে জাগ্রত ব্যক্তিকে তিনি পানির পাত্রে হাত দিতে বারণ করেন। নির্দেশ দিলেন যে প্রথমে তিনবার হাত ধুয়ে পবিত্র করে তবে পাত্রের পানিতে সে হাত লাগাবে। এর কার্য কারণ হিসাবে রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন যে فانها لا يدرى اين باتت يده সে জানে না যে রাতে নিদ্রাবস্থায় তার হাত দিয়ে সে কি কি করেছে। হতে পারে যে নাপাক স্থানে লাগার ফলে তার হাতও নাপাক হয়ে গিয়েছে।

শিকার করা জানোয়ার যদি পানিতে পড়ে তবে রাসূলে পাক (সাঃ) তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন لعل الماء اعان على قتله হতে পারে যে তার মৃত্যুতে পানির সহায়তা আছে। আর পানিতে ডুবে কোন হালাল জানোয়ারের মৃত্যু হলে তা-খাওয়া বৈধ নয়। উল্লেখিত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত

হয় যে রাসূলে পাক (সাঃ) ইজতিহাদ করতেন। ইজতিহাদী মাসআলা বর্ণনার সময় তিনি তার কার্যকারণ ও বর্ণনা করতেন। তাঁর ইজতিহাদ সম্পর্কে তিনি নিজেই ইশরাদ করেন ঃ

اذا اقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي -

যে বিষয়ে ওহী নাযিল হয়নি, সে বিষয়ে আমি কিয়াস বা রায় দ্বারা সমাধান দেই। আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদী বলেন ঃ

و الرأي هو تشبيه شي بشيء و ذالك هو القياس الى غير ذالك من الاخبار المختلف لفظها المتحد معناها النازل جملتها منزلة التواتر واذكان احادها احادا -

রায় অর্থ হল একটি বিষয়কে অন্য বিষয়ের সাথে তুলনা করা। আর ইহাই কিয়াস। উল্লিখিত রিওয়ায়েতসমূহ ব্যতীত আরো অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা রাসূলে পাক (সাঃ)-এর ইজতিহাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথক পৃথক ভাবে সে সব রিওয়ায়েত খবরে ওয়াহিদ হলেও অর্থগত দিক থেকে সেগুলো মুতাওয়াতের।[১] আর খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত মাসআলা সন্দেহাতীত। তা মেনে নেয়া অপরিহার্য।

সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম অনেক ব্যাপারে রায় প্রদান করতেন। তারাও ইজতিহাদ করতেন। ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে এর হাজারো উদাহরণ রয়েছে। এ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রথম ইজতিহাদ ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর। বদর যুদ্ধে বন্দী কোরেশদের সম্পর্কে বিচারের মতামত চাওয়া হলে সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এতে রায় দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক মুহাজির নিজ নিজ নিকটাত্মীয় বন্দীকে সহস্তে হত্যা করবে। এখানে যদিও তার মতামত গৃহীত হয়নি কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ)-সহ উপস্থিত সাহাবীদের কেউ তার রায়ের নিন্দা করেন নি। উপরন্তু তার ইজতিহাদের সমর্থনে কুরআনে করীমের আয়াত নাযিল হয়েছিল।

---

১. আলআহকাম ৪র্থ খণ্ড ৪২—৪৫ পৃঃ

সাহাবায়ে কিরামের একটি বাহিনীকে রাসূলে করীম (সাঃ) বনু কুরাইশের সাথে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, বনু কুরাইযায় গিয়ে আসরের নামায আদায় করবে। কিন্তু সাহাবীদের অনেকে মনে করলেন যে রাসূলে করীম (সাঃ) ইহা দ্বারা দ্রুত যাত্রার কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং পথে নামায আদায় করলে তা আইন অমান্যের শামিল হবে না। বরং ইহা শরয়ী কানুনের যথার্থ ইত্তেবা হবে। এই মনে করে তাঁরা পথেই আসরের নামায আদায় করে নিলেন। আর অনেকে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর বাহ্য নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করে বনু কুরাইযায় গিয়েই নামায আদায় করলেন। রাসূল করীম (সাঃ) উভয় দলকেই সমর্থন জানালেন এবং প্রশংসা করলেন। সন্দেহ নেই যে, এখানে প্রথমোক্ত দল ইজতেহাদের উপর আমল করেছিলেন।

আল্লামা জাইলাই তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নসবুর রায়াহ'য় কিয়াস ইজতিহাদকে সাবেত করতে গিয়ে অসংখ্য রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রমাণ্য হল হযরত মাআয বিন জাবালের হাদীস। এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদ ও আলফাজ-এর সাথে নির্ভরযোগ্য হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও দারেমী-সহ আরো অনেক মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন এবং এর সহীহ্ হওয়াকে সত্যায়িত করেছেন। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এ হাদীটির ভাষা নিম্নরূপ :

عن معاذ بن جبل انه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن سألة النبي عليه السلام قائلا له كيف تقضي قال اقض بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله . قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد برأيي ولا آلو . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضه رسول الله .

রাসূলে করীম (সাঃ) হযরত মাআয বিন জাবালকে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। যাত্রাকালে নসীহত প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলেন মাআয! তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে। তিনি উত্তর দিলেন, কিতাবুল্লাহ্'র মাধ্যমে। প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন যদি সেখানে না পাও? তিনি বললেন, তখন আল্লাহ্'র রাসূলের সুন্নতকে দেখব। হুযূরে পাক (সাঃ) পুনরায় বললেন, সুন্নতের ভিতরেও যদি তুমি সমাধান খুঁজে না পাও তখন কি করবে?

এবারে মাআযে উত্তর দিলেন, তখন আমি নিজস্ব রায় প্রদান করব। এতে আমি ত্রুটি করব না। একথা শুনে রাসূলে পাক (সাঃ) সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন।

সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদের পক্ষে এর চেয়ে শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট দলীল আর কি হতে পারে। এই জন্যই উসূলের ইমামগণ এ হাদীসকে কিয়াসের সমর্থনে মৌল দলীল হিসাবে পেশ করেন।

৩. ইজতিহাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি

বদরে কয়েদীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামদের নিকট পরামর্শ চাওয়া হল যে তাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে, এতে বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। অবশেষে রাসূলে করীম (সাঃ) নিজস্ব ইজতিহাদ অনুসারে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেন।

হযরত আমর ইবনে আস এবং উকবা বিন আমের জুহানী (রাঃ)-এর ঘটনা তো সুপ্রসিদ্ধ। হুযুরে পাক (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা করবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে। যদি সঠিক হয় দশগুণ সাওয়াব পাবে, আর যদি তোমরা উভয়েই ভুল করে ফেল তবুও ইজতিহাদের সাওয়াব পেয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনু আবদীল বার মালেকী বলেন :

و من الرسول لولا ية فى الامصاران يجتهدوا رأيهم حتى لايجدون لصا وجاء فى القران نفسه وما حكام كاف بها المسلمون على- ان يكون سبيلهم فى طاعتها الا مقر شداد وما لعقل كما فى مسألة التوجه الى القبلة البعيد عن الكعبة -

রাসূলে করীম (সাঃ) নিজ গভর্ণরদেরকে হিদায়েত দিয়েছিলেন যে কোন মাসআলায় যদি কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে কোন স্পষ্ট সমাধান না পাও তবে নিজ নিজ রায়ও ইজতিহাদানুসারে আমল করবে। কুরআনে করীমে এমন বহু আহকাম রয়েছে যাতে মানুষকে তাদের রায়ের ভিত্তিতে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন কা'বা থেকে দূরবর্তী বাসিন্দাদের জন্য হুকুম হল যে তারা নিজেদের ইজতিহাদানুযায়ী কিবলার দিকে মুখ করবে।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে এক সম্প্রদায় যাকাতের ফরয়িয়্যাতকে অস্বীকার করে। আরেক দল যাকাত আদায়ে বাধা

হলেও তা খলীফা বা তার নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে পোঁছাতে অস্বীকৃতি জানাল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবার মনস্থ করলেন। গোড়ার দিকে অনেক সাহাবী এ ব্যাপারে তার বিরোধীতা করেন। হযরত উমর (রাঃ)ও এ ব্যাপারে তার সাথে ঐকমত্যে পোঁছতে পারছিলেন না। তিনি খলীফাকে বললেন كيف تقاتل من قال لا اله الا الله 'আপনি কিভাবে তাদের সাথে জিহাদ করবেন যারা কালিমা পাঠ করে?' হযরত আবু বকর (রাঃ) জবাবে স্বীয় ইজতিহাদ পেশ করেন। অবশেষে হযরত উমর (রাঃ)-সহ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তাঁর ইজতিহাদের যথার্থতা স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে ঐকমত্যে পোঁছেন। এ দ্বারা ইজতিহাদের বৈধতার সাথে সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দূরদর্শীতা ও ইজতিহাদী যোগ্যতার কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইন্তিকালের সময় পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ ইজতিহাদী শান বজায় রেখেছিলেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচিত করে জনসাধারণের বিশেষত প্রবীণ সাহাবীদের নিকট থেকে বয়আতের ওয়াদা নেন। এতে সবাই তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ইতিহাস সাক্ষী যে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সে ইজতিহাদ কত ফলপ্রসূ ও যথার্থ হয়েছিল।

মীরাছে দাদীর হিস্যা কতটুকু হবে তা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি যখন ঘোষণা দিলেন যে দাদী মীরাছের এক ষষ্ঠমাংশ পাবে। তখন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তা মেনে নিলেন।

তাঁর কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে প্রথমে তিনি কুরআন করীমে তার সমাধান খুঁজতেন। সেখানে না পেলে তিনি হাদীস পাকের উপর দৃকপাত করতেন। এ ব্যাপারে তিনি অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের সাহায্য নিতেন। তারা যদি কোন হাদীস সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করতে সক্ষম হতেন। তবে তার ভিত্তিতেই তিনি মীমাংসা প্রদান করতেন। সবশেষে তিনি সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ চাইতেন। এতে কখন তিনি অধিকাংশের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। আর কখন স্বীয় রায় ও ইজতিহাদের উপর-সিদ্ধান্ত নিতেন। মোদ্দাকথা কিতাব সুন্নাহ্র ভিতর আপতিত

বিষয়ের সমাধান না পেলে তিনি ইজতিহাদের মাধ্যমেই তার একটা সুরাহা করে নিতেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন ঃ

ان ابا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها اصلا ولا في السنة اثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني وا ستغفر الله -

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সমীপে একটা মাসআলা উথাপিত হল। কিতাবুল্লাহ্ বা সুন্নাতে নববীতে তার কোন্ সমাধান মিলল না। অগত্যা তিনি স্বীয় রায় ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তার একটা সমাধান দিলেন এবং বললেন আমার এ ফতোয়া যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আর যদি ভুল হয়ে থাকে তবে সে ভ্রান্তি আমারই। সেজন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

অনুরূপভাবে তার যুগে যদি অন্যকোন সাহাবী ইজতিহাদ করতেন তাও তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন।

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই খলীফা নির্বাচনের প্রশ্ন উথাপিত হল। রাসূলে পাক (সাঃ) নিজে যেহেতু কাউকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাননি তাই সাহাবায়ে কিরাম ইজতিহাদের মাধ্যমেই বিষয়টার একটা সুরাহা করতে চাইলেন। তারা লক্ষ্য করলেন যে, রাসূলে পাক (সাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর(রাঃ)-কে বিভিন্ন সময় নামাযের ইমাম পদে নিযুক্ত করতেন। এ হিসাবে তাঁরা ইমামতে কুবরা অর্থাৎ খিলাফতের মাসআলাকে ইমামতে ছুগরা অর্থাৎ নামাযের ইমামতির সাথে কিয়াস করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবিতকালে যিনি ইমামতে ছুগরার পদে নিযুক্ত হতেন। আজ প্রিয় নবী (সাঃ)-এর অবর্তমানে তিনিই ইমামতে কুবরার দায়িত্ব পালন করবেন। এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামের সম্মিলিত ইজতিহাদের ফলশ্রুতি হিসাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন পদে অভিষিক্ত হলেন।

কুরআন সংকলনের বিষয়টিও সাহাবায়ে কিরাম ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধা করেছিলেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করেছি। তিনি নিজে যেভাবে ইজতিহাদ করতেন তেমনিভাবে

অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকেও ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছিলেন। ইজতিহাদ করেই তিনি শরাবের দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি শরাবের আড্ডা হিসাবে পরিচিত একটা পল্লীকেই তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) নিজ বাড়ীতে পাহারাদার নিযুক্ত করলে, তিনি তা পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যে তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি এক্ষণি কুফায় চলে যাও। সেখানে সা'দ এর গৃহে আগুন লাগিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসবে। আর দেখ, এ ব্যাপারে কারুর কাছে কিছু বলবে না। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) খলীফার দরবার থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ কুফায় চলে গেলেন। এক কিবৃতীর দোকান থেকে কিছু জ্বালানী কাঠ খরিদ করে হযরত সা'দ এর বাড়ীতে চলে গেলেন এবং তার গৃহে অগ্নি সংযোগ করে দিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বিচলিত হয়ে বাহির ভাগে বের হয়ে আসলেন। দেখতে পেলেন যে মুহাম্মদ বিন মাসলামাই এ কাজ করেছেন, কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে আমীরুল মু'মিনীনই আমাকে এ খেদমতের নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তর শুনে হযরত সা'দ (রাঃ) কিছুই বললেন না। উপরন্তু রাহা খরচ হিসাবে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহকে কিছু দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। বললেন যে আমীরুল মু'মিনীনের ইজাযত নেই। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। খলীফা বললেন পথ খরচ নিয়েই আসতে, তিনি উত্তর দিলেন যে আপনার অনুমতির প্রয়োজন ছিল। তাই তা গ্রহণ করিনি।

প্রসিদ্ধ কবি নছর বিন হাজ্জাজ যৌন আবেদনমূলক কাসীদা রচনায় লিপ্ত হলে (আরবী ভাষায় একে তাশবীব বলা হয়) হযরত উমর তা জানতে পারলেন। তাই অবিলম্বে তিনি তার মাথা কামিয়ে মদীনা থেকে বের করে দিলেন।

সবীগ বিন আছাল নামক এক ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে আকীদা সম্পর্কীয় অনর্থক প্রশ্ন করেছিল। তিনি এতে তার বক্রমানসিকতার পরিচয় পেলেন। তাই প্রশ্নকর্তার মস্তকে তিনি কষিয়ে বেত্রাঘাত করলেন। কেননা এসব ফালতু প্রশ্ন তার দেমাগ থেকেই উত্থিত হয়েছিল।

সাত ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে একজন লোককে হত্যা করেছিল। হযরত আলী (রাঃ) কিসাস হিসাবে তাদের সাত জনকেই কতল করবার ফতোয়া দিলেন। হযরত উমর (রাঃ) বললেন এক ব্যক্তির পরিবর্তে সাতজন মানুষকে,

হত্যা করা হবে? হযরত আলী উত্তরে বললেন, যদি সাতজন লোক মিলে কোন এক ব্যক্তির মাল চুরি করে তবে তাদের সাতজনেরই কি হাত কাটা হবে না? খলীফা বললেন তাতো অবশ্যই। হযরত আলী তখন বললেন, মানুষের প্রাণের চেয়ে তাদের ধন-সম্পদের মূল্য কখনই অধিক নয়। সুতরাং সাত ব্যক্তি মিলে একজনকে হত্যা করলে কিসাস হিসাবে তাদের সবাইকে কতল করাই যথার্থ ইনসাফ। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর ইজতিহাদকে কবুল করে নিলেন এবং হত্যাকারী সাতজনকেই কতল করবার নির্দেশ দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)-এর ইজতিহাদী যোগ্যতার কথা সর্বজন বিদিত। তিনি রাফেযীদের মধ্যে যারা জিন্দীক তাদেরকে হত্যা করেছিলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) সুস্পষ্ট কাফির ব্যতীত অন্য কাউকে কতল করতেন না। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে রাফেযীদের কিছু সংখ্যক তাঁকে প্রভুত্বের আসন দিচ্ছে। এবং তাঁর ইলাহ হওয়ার মতবাদ চারিদিকে প্রচার করে বেড়াচ্ছে তখন তিনি তাদেরকে কঠিন হস্তে দমন করলেন এবং অন্য কেউ যাতে কখনও এমনতর আকীদায় লিপ্ত না হয় এজন্য তাদেরকে হত্যা করলেন। এমনকি অনেককে অগ্নি দগ্ধ করলেন। সন্দেহ নেই যে তিনি স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাই এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন! এ সম্পর্কে তিনি নিজেই ইরশাদ করেন:

لما رأيت الا مر امرا منكرا احجبت نارا ودعوت قنبرا .

বিষয়টাকে যখন আমি চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায় বলে বিবেচনা করলাম তখন আমি অগ্নি প্রজ্বলিত করলাম এবং চাকর কুম্বরকে ডাকলাম। তুহমতের শাস্তির উপর কিয়াস করে হযরত আলী শরাব পানকারীর শাস্তি আশি দোর্রা নির্ধারণ করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও অনুরূপভাবে ইজতিহাদ করতেন। কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিতর কোন বিষয়ের সমাধান না পেলে তিনিও নিজস্ব রায় প্রদান করতেন।

কোন হজ্জ যাত্রী যদি পথেই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এজন্যে সে হজ্জ আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সে কি করবে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মাসআলাটিকে শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হজ্জ যাত্রীর সাথে কিয়াস করেন। ইমাম মুহাম্মদ তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

فسئل عن رجل احصر فتهشة حية فلم يستطع المضى فقال ابن مسعود

ليبعث بهدى ويواعد اصحابه يوما من الايام فاذا انحر عنه الهدى حل
و كانت عليه عمرة فكان عمرته ـ

এক হজ্জ যাত্রীকে সর্পে দংশন করলে তিনি মক্কায় পৌঁছে হজ্জ আদায় করতে অক্ষম হয়ে গেলেন। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সে তার 'হাদী' অর্থাৎ কুরবানীর জন্য একটা দিন ধার্য করে নেবে। হাদী কুরবানী হয়ে গেলে সে ব্যক্তি হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু এ উমরার পরিবর্তে তাকে দ্বিতীয়বার উমরা আদায় করতে হবে।[১]

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) যে রকম ইজতিহাদের নীতিমালা লিখে গভর্ণরদের নিকট প্রেরণ করতেন। তদ্রূপ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও স্বীয় ইজতিহাদের উসূল শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিতেন।

আবদুর রহমান বিন ইয়াজীদ বর্ণনা করেন, একদিন লোকেরা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে দীর্ঘ আলোচনা করলো। তিনি তাদেরকে বললেন।[২] একদিন এমন ছিল যে আমরা কোন ফায়সালা দিতে পারতাম না। আর আমরা এ কাজের যোগ্যও ছিলাম না। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করলেন যার ফলে তোমরা আজ আমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ। শোন তোমাদের কারুর নিকট যদি কোন বিষয়ে সমাধান চাওয়া হয় তবে প্রথমে কিতাবুল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য করবে। সেখানে যদি সে বিষয়ে কিছু না পাও তবে রাসূলে পাক (সাঃ)-এর সুন্নাহ্‌কে দেখবে। সেখানেও যদি ব্যর্থকাম হও তবে খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবার আমল দেখবে। সবশেষে কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে নিজস্ব রায় প্রদান করবে। আমি ভয় করি। আমি ভয় করি বলে কখনো পিছিয়ে থাকবে না, কেননা হালাল ও হারাম উভয়ই সুস্পষ্ট। অবশ্য এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থলে কতগুলো অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে যাকে হালাল বলে ঝাপটে ধরা যায় না এবং হারাম বলে উড়িয়ে দেয়াও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহজনক বিষয়কে বর্জন করে যা সংশয়হীন তার উপর আমল করবে।[৩] মুসনাদে আহমদে ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর

১. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ২০৩ পৃষ্ঠা।

২. সম্ভবত ইহা ঐ সময়ের ঘটনা যখন তিনি কূফায় কাযী ছিলেন। কেননা মদীনায় একাধিক কাযী নিযুক্ত ছিল। তিনিও তাদের একজন ছিলেন কিন্তু কূফায় এ দায়িত্ব তার একার উপরই ন্যস্ত ছিল। এখানে তাঁর বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বক্তব্যস্থলে তিনি একাই কাযী ছিলেন। সুতরাং ইহা কূফায় থাকাকালীন ঘটনা বৈ নয়।

৩. নাসাঈ কিতাবুল কাযা ৫৫১ পৃঃ।

এ বক্তব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি অন্যত্র বলেন, মুসলমানগণ তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী যে বিষয়কে ভাল মনে করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেও তা উত্তম এবং তারা যাকে নিকৃষ্ট মনে করে আল্লাহ্‌র নিকটেও তা মন্দ বৈ নয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রাঃ) অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখতেন। যার ফলে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হযরত উমর (রাঃ)-এর ইত্তেবা করতেন এবং তার রায় মেনে নিতেন। কিন্তু প্রয়োজন মুহূর্তে অনেক ক্ষেত্রে তার মতামতের সাথে ইখতিলাফ করতেন। উলামায়ে কিরাম এ ধরনের ইখতিলাফ স্থলে হযরত মাসউদ (রাঃ)-এর রায়কেই অগ্রাধিকার দিবেন। হযরত ইব্রাহীম নখঈ সাধারণতঃ এ দুই সাহাবীর ঐকমত্যকে অন্যান্য সকলের মতামতের উপর প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে মতানৈক্য হলে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ফতোয়াই গ্রহণ করতেন। কেননা তিনি অন্যের সুযোগ-সুবিধাকে বড় মনে করতেন।

যেসব মাসআলায় কুরআনে করীম ও হাদীসে থেকে কোন হুকুম পাওয়া যায় না, ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে তাতে ফায়সালা দান তার মাযহাবে কেবল বৈধই নয়—মূলনীতিও বটে।[১] সব মাযহাবের উলামায়ে কিরাম ও ফকীহগণ নির্দ্বিধায় ইহাকে মেনে আসছেন। আল্লামা শাতেবী বলেন

ولا يمكن ان ينقطع الاجتهاد حتى تنقطع التكاليف وذالك عند قيام الساعة ـ

১. রাসূলে পাক (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) বিচার-আচারে যেভাবে ইজতিহাদকে কাজে লাগাতেন। তদ্রূপ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)ও কূফায় তাদের পথকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে চারিদিকে ইসলামের জয় জয়কার পড়ে গেল বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করল। এসব নও মুসলিমদের মাঝে ইসলামী রঙের ঝলক দেখা গেলও পুরাতন বদ রীতি প্রভাব তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি। বরং তাদের সংখ্যাধিক্যের ফলে তাদের—উদ্ভত সামাজিক রীতিনীতির কিছুটা ছাপ আরব মুসলিমদের মাঝে দেখা দিতে লাগল এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এতে করে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন মাসআলা ও সমস্যার সৃষ্টি হল। এসবের সমাধানের জন্য ইজতিহাদ ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। কিছু কিছু এমন জটিল মাসআলা ও দেখা দিল যা পূর্বে কেউ ভাবতেও পারেনি এসবের একটা ইসলামী সুরাহা না করা হলে মুসলিম সমাজে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) যেহেতু আরবের মূল সীমানার বাইরে কূফায় অবস্থান করতেন তাই তিনিই তুলনামূলক অধিক এসব সমস্যার মুখোমুখি হলেন। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে চিন্তা গবেষণা করে কিয়াস ও ইজতিহাদের পরিসরকে আরো বৃদ্ধি করলেন। এভাবে তিনি নবোদ্ভূত সকল জটিল থেকে জটিলতার সমস্যার সমাধান করতে লাগলেন। এক্ষেত্রে তার শিষ্য ও সহকর্মীবৃন্দ তাকে যথেষ্ট মদদ করেছেন। ফলে কূফা কিয়াস ও ইজতিহাদ তথা রেওয়ায়ী মাসলকের প্রধান মূল কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা

যতদিন মানুষের উপর আল্লাহ্র হুকুম আহকাম বলবৎ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়াস ও ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ হওয়ার নয়। আর সন্দেহ নেই যে কিয়ামতের পূর্বে কখনো এমনটি হবে না।[১]

বিখ্যাত মালেকী ফকীহ ইবনে রুশদ বলেন, বাহ্যিকভাবে কুরআন হাদীসে উল্লেখিত মাসআলা খুবই সীমিত। আর মানুষের চাহিদা ও সমস্যা অনন্ত। সুতরাং এগুলোর সমাধান কল্পে কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে ইজতিহাদ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।[২]

হাম্বলী ইমাম কুদামা বলেন

اذا حدثت حادثة نظر في كتاب الله فان وجدها والا نظر في سنة رسوله فان لم يجد نظر في القياس -

কোন নতুন বিষয় উপস্থিত হলে প্রথমে আল কুরআনের ভিতর দৃষ্টি-পাত করতে হবে। সেখানে যদি সমাধান পাওয়া যায় তবে অন্য কিছুর প্রতি দৃকপাত করার প্রয়োজন নেই। তবে সেখানে না পাওয়া গেলে তখন হাদীস পাকে এর সন্ধান নিতে হবে। সেখানেও ব্যর্থকাম হলে সবশেষে কিয়াস দ্বারা প্রয়োজন সেরে নিতে হবে।[৩]

ইমাম সাফেঈ (রঃ)-এর সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম মুজনী বলেন

الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام -

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ফুকাহায়ে কিরাম ফিকহার সমস্ত বিষয়ে কিয়াসকে ব্যবহার করেছেন।[৪]

দীনি মাসআলার ক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদ এতো জরুরী বিষয়

লাভ করে। পরবর্তী যুগের ইমামগণ এব্যাপারে কূফার বহুলাংশে মুখাপেক্ষী ছিল। কেবল হানাফী ফিক্হ নয় মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণও কূফার ইল্ম দ্বারা কেবল উপকৃত হয়েছেন তাই নয় বরং এর উপরই তারা নিজেদের ইজতিহাদের ভিত রচনা করেছেন। হ্যাঁ তবে ইরাকের অধিবাসীরা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ফিকাহ্ দ্বারা অধিক লাভবান হয়েছেন। মূলতঃ তারাই হল তার ফিকাহ্ ও ইলমের প্রকৃত ওয়ারিস। কালক্রমে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এ দৌলতকে সম্বল করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই ইহা হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের গর্ব যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-ই ছিলেন এ মাযহাবের মৌল প্রতিষ্ঠাতা এ সৌভাগ্য সরাসরি অন্য কোন মাযহাবের ঘটেনি।

১. মুয়াফাকাত ২৭ পৃঃ, তিউনিস থেকে প্রকাশিত।
২. হিদায়াতুল মুজতাহিদ ১ম খণ্ড ১ম পৃঃ।
৩. আলমুগনী ১১শ খণ্ড ৩৯১ পৃঃ।
৪. মুখতাছার জামিঈ বয়ানিল ইলম ১৭০ পৃঃ।

যে আসহাবে জাওহের পর্যন্ত তা অস্বীকার করতে পারে না, ইবনে হাজাম বলেন—রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগেও সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ রায় অনুসারে ফতোয়া দিতেন। রাসূলে পাক (সাঃ)-এর নিকট যখন তা পৌঁছত তখন যার ফতোয়া সহীহ্ হত তাকে সত্যায়িত করতেন এবং ভুল হলে তাও বাতিলিয়ে নিতেন। ইবনে হাজাম জাহেরীও এ কথা স্বীকার করেছেন বিখ্যাত সালাফী আলেম আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন ফতায়োর সাথে যার মোটামুটি সম্পর্ক আছে সে ভাল করেই জানে যে উদ্ভূত ঘটনাবলীর জন্যে পূর্ববর্তী মাসআলাসমূহই যথেষ্ট নয় তাতে সে সব মাসআলার পরিসর যতই বিস্তৃত হোক না কেন।[১]

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা যা সুস্পষ্ট হল :

ক. রাসূলে পাক (সাঃ) স্বয়ং ইজতিহাদ করতেন। কদাচিৎ যদি তাতে কোন ভুল হত তবে কুরআনী আয়াত দ্বারা তাকে সতর্কিত করা হত।

খ. তাঁর যুগে সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদ করবার অনুমতি ছিল।

গ. তাদের ইজতিহাদ সঠিক হলে রাসূলে পাক (সাঃ) তা সত্যায়িত করতেন, এবং ভুল হলে সংশোধন করে দিতেন।

ঘ. খুলাফায়ে রাশেদীন ইজতিহাদ করতেন।

ঙ. কোন সাহাবী নিজে ইজতিহাদ না করলেও অন্য সাহাবীর ইজতিহাদকে স্বীকৃতি দিতেন।

চ. ইজতিহাদ কেবল নিজ আকল প্রসূত রায়ের নাম নয়।

ছ. কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে দীনি মাসলিহাতকে লক্ষ্য করে দূরদর্শিতার মাধ্যমে আমলের রাহা তৈরীকে ইজতিহাদ বলা হয়।

ইজতিহাদের শর্তাবলী

ইজতিহাদের নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে একটা কথা অবশ্যই জেনে নেয়া দরকার। তা হল এই যে, ইসলামী আহকাম চার প্রকার।

১. ঐ সব আহকাম যা নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহাতীত দলীল দ্বারা দ্ব্যর্থহীন ভাবে সাবেত হয়। এই সব আহকামকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া ফরয। এখানে কারুর ইজতিহাদ করার অধিকার নেই। যেমন, নামাযের ফরযিয়াত, এর রাকা'আত ও বিন্যাস ইত্যাদি।

---

১. ইলামুল মুকিয়ীন ২য় খণ্ড ২৭৫।

২. ঐসব আহকাম বা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা সাবিত হয়। তবে ইখতিলাফ ও ভিন্ন ধর্মী ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে। এ ধরনের আহকামে ইজতিহাদের অনুমতি আছে। যেমন মাথা মাসেহ্ করা ফরয কিন্তু এর পরিমাণ নির্ধারণে উলামায়ে কিরাম ইখতিলাফ করেছেন। কেউতো গোটা মাথা মাসেহ্‌কে ফরয বলেছেন আর কেউ একটা অংশবিশেষকেই যথেষ্ট বলেছেন।

৩. ইজমা সংগঠিত হয়েছে এমন মাসআলা। এখানেও নতুনভাবে ইজতিহাদের অবকাশ নেই। যেমন মীরাছে দাদীর হিস্যা (ইজমায়ে সাহাবার প্রেক্ষিতে এক ষষ্ঠমাংশ নির্ধারিত হয়েছে।) অমুসলিমের সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ (ইহা হারাম হওয়া সম্পর্কে সাহাবার ইজমা সংগঠিত হয়েছে) ইত্যাদি।

৪. ঐসব মাসআলা যে সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহ্য় সুস্পষ্ট কোন ভাষ্য নেই এবং এর উপর কখনো ইজমা সংগঠিত হয়নি। শরীয়তের সীমারেখায় এখানে ইজতিহাদের অনুমতি আছে।

বলা বাহুল্য যে, ইসলাম সাধারণ ভাবে প্রত্যেককেই ইজতিহাদের অনুমতি দেয়নি। কেননা আযাদীর সাথে যে কেউ ইজতিহাদ করলে দীনের কোন নিয়ম শৃংখলা বাকী থাকবে না। দীন সকলের হাতের ক্রিড়ানকে পরিণত হবে। তাই ইসলাম একমাত্র যোগ্যতরকে এ কাজের অধিকার দিয়েছে এবং সে যোগ্যতার নির্ণয় ইসলাম নিজেই করে দিয়েছে।

ইজতিহাদের জন্য যেসব যোগ্যতা অপরিহার্য

১. কুরআনী ইল্‌ম সম্পর্কে পূর্ণ বাছীরত ও ব্যুৎপত্তি, সাথে সাথে কুরআন উপলব্ধির ঈমানী বিচক্ষণতা ও অপরিহার্য শর্ত।

২. হাদীসের শ্রেণী বিন্যাস ও সনদসহ গোটা সুন্নাহ্র জ্ঞান।

৩. পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ প্রসূত মাসআলা ও তার দলীল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া।

৪. রূহ-ই-শরীয়ত ও দীন-ই-ইসলামের মৌল দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সাথে সাথে সে দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোকে নিজেকে গড়ে তোলা।

৫. আরবী সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞান।

৬. বিশুদ্ধ আমল ও সুন্নতের অনুসারী হওয়া। কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। সগীরা গুনাহ্'র পুনরাবৃত্তি না ঘটান।

৭. হক ও সত্যের প্রকাশের মত সৎ সাহস থাকা। কোন রূপ হুমকী ও প্ররোচনায় মুখে দমে না যাওয়া।

হাসান বসরী (রঃ) বলেন একজন ফকীর জন্য অতিরিক্ত পাঁচটি গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক (ক) পার্থিব লালসা পরিহার করা (খ) আখি-রাতের উৎকর্ষতা ও কামিয়াবীর জন্যে নির্দ্বিধায় স্বীয় শক্তি ও সময় ব্যয় করা (গ) সব ব্যাপারে ইলাহী নির্দেশের পাবন্দী করা। বিশেষত মুস-লিম সাধারণের মান ইজ্জত ও হক সংরক্ষণকে স্বীয় দায়িত্ব মনে করা। (ঘ) দ্বীনি বাছীরত ও ঈমানী দূরদর্শীতার অধিকারী হওয়া (ঙ) মুসল-মানদের ফায়দার জন্য নিজ স্বার্থকে কুরবানী করতে অভ্যস্ত হওয়া। ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন পার্থিব ব্যাপারেও একজন ফকীহ্ সব সময় মাখলুকের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাকবে।

সবশেষে আমরা প্রসঙ্গক্রমে ঐসব আয়াত ও হাদীসের সহীহ্ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করব যেগুলোকে সাধারণভাবে কিয়াস ও ইজতিহাদের অবৈধতার দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দীনি মাসলিহাত সম্পর্কীয় কিয়াস ও ইজতিহাদকে শরীয়ত নাজায়েয বলেনি। বরং শরীয়ত ইহাকে প্রশংসা দৃষ্টিতে দেখেছে। ইহাকে নাজায়েয বলে ফতোয়া দেয়া নিছক গোয়ার্তুমী এবং দীনি ইলুম সম্পর্কে দৈন্যতার পরিচায়ক। কিয়াস অস্বীকারকারীদের একটা দলীল হল কুরআনে করীমের আয়াত ঃ

يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله -

'হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল ডিঙিয়ে যেও না।' তাদের দাবী হল যে যারা কিয়াস করে তারা মূলতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত মানসা' ও হুকুম জানে না। ফলতঃ প্রকৃষ্ট হুকুম অলংঘন করে নিজেদের আকল অনুসারে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়।

মূলতঃ এ আয়াতের প্রেক্ষিতে কিয়াসকে অস্বীকার করা নিতান্তই ভ্রম। কেননা এ আয়াতের উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ্ ও তার রাসূলের কোন হুকুম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব চাহিদা মাফিক কোন হুকুম তৈরী করে নেয়া। অথচ কিয়াস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা কিয়াসের একটা মৌলিক শর্ত হল যে—প্রতিপাদ্য বিষয়ে কুরআনে করীম বা সুন্নাহ্র কোন সুস্পষ্ট হুকুম না থাকা। উপরন্তু কিয়াসের হাকীকত হল যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল কর্তৃক কোন নির্দেশ বর্তমান

থাকে। কিন্তু সুস্পষ্ট কোন আয়াত বা হাদীস দ্বারা তা প্রকাশ না থাকায় ফলে হুকুমটি লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। তাই মুজতাহিদ কুর-আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে কিয়াস করতঃ হুকুমটিকে পরিচ্ছন্ন করে দেন। এবং সহীহ্ আমলের জন্যে সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত করেন যাতে মানুষ সহজে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের ইত্তিবায় ঝুঁকে পড়তে সক্ষম হয়। সুতরাং কিয়াস আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অলংঘন করা নয়। বরং তাদের আনুগত্যের এক বিরাট অবলম্বন। তাদের আরেকটা দলীল্ হল সূরা মায়েদার আয়াত—

وان احكام بينهم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكا فرون -

"আর তাদের মাঝে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আয়াত দ্বারা সমাধান দিবে। আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা ফায়সালা দেয়না তারাইত কাফির। অন্য আয়াতে আছে তারা জালিম তৃতীয় আরেকটিতে আছে তারা ফাসিক।"

বস্তুতঃ আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা তাদের এ দলীলও খণ্ডিত হয়ে গেছে। কেননা এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল যারা কুরআনের বিরোধিতা করে বা কুরআন বিমুখ হয়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে সমাধান দেয়। আর মুজতাহিদগণ মূলতঃ তাদের কিয়াস দ্বারা যে ফায়সালা দিয়ে থাকেন তা আল কুরআনেরই ইঙ্গিত বৈ কি। অতএব তারাও কুরআনে করীমের দ্বারাই ফায়সালা দেন। এর বিরুদ্ধচারীতা বা বিমুখীতা করেন না। উপরন্তু আল কুরআনের আরেকটি আয়াত দ্বারা একথা আরো শক্তিশালী হয়। ইরশাদ হয়েছে—

انا انزلنا اليك الكتاب با لحق لتحكم بين الناس بما اراك الله -

আমরা আপনার উপর সত্য ও হক সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি। যাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত রায় ও বিচক্ষণতার আলোকে মানুষের মাঝে ফায়সালা করতে পারেন।

তারা আরো দলীল দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন - ما فرطنا فى الكتاب من شئ আমরা কিতাবে কোন কিছুই বাদ দেইনি। অন্য আয়াতে আছে كل فى كتاب مبين সব কিছুই প্রোজ্জ্বল কিতাবে আছে।

অথচ কে-না জানে-উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে কিতাবের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ কুরআন মজীদ নয়। বরং লওহে মাহ্ফুজ।

তারা কুরআনে করীম থেকে আরেকটি আয়াত পেশ করে থাকে যথা

و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئى -

আমরা আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি। ইহা সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা।

আমরা বলব যে, এ আয়াত দ্বারা কিয়াস ও ইজতিহাদের বৈধতাই প্রমাণিত হয়। কেননা কুরআনে করীমে কোন কোন আহকাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোথাও বা শরীয়তের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় আরেক প্রকার আয়াত রয়েছে যাদ্বারা আহকামের ইঙ্গিত মাত্র করা হয়েছে। এ ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করেই মুজতাহিদগণ কিয়াস করে থাকেন। আর এ তিনের সমষ্টিকেই تبيان বা বিস্তারিত বর্ণনা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লামা শাতেবী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রয়োজন ও জরুরত এবং আবশ্যক বিষয়াদীর পূর্ণতা বিধানের জন্য অপরিহার্য সবকিছুই কুরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং নতুন কোন বিধান বা নীতি প্রণয়নের আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই। হ্যাঁ তবে উদ্ভূত সমস্যাদীর সমাধান কল্পে কুরআনে করীমে উল্লেখিত মূলনীতির আলোকে মাসআলা ইস্তিম্বাতের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। আর ইহা একমাত্র মুজতাহিদগণেরই দায়িত্ব। তাদের উদঘাটিত মাসআলা যেহেতু কুরআনে করীম বা হাদীসে বর্ণিত মূলনীতির আলোকেই সংগঠিত হয়ে থাকে। তাই তার অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য। কেননা প্রকারান্তরে এসব মাসআলা কুরআন ও হাদীস দ্বারাই ছাবিত হয়েছে। তাই এর অনুসরণ মূলতঃ কুরআন ও হাদীসেরই অনুসরণ।

তাদের আরেক দলীল আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ

ولا تقف ما ليس لك به علم -

"যে বিষয়ে তোমার ইলম নেই তার পিছনে পড়ো না"।

মূলতঃ এ আয়াতের সম্পর্ক আকায়েদের সাথে। আমলগত আহকামের সাথে নয়। কেননা আকায়েদী আহকাম সন্দেহাতীত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। "জন্নে গালিব" অর্থাৎ প্রত্যয়ের কাছাকাছি—এ ধরনের দলীল দ্বারা আকায়েদী হুকুম সাবিত হয় না। তবে আমলী আহকাম জারী হয়। উপরন্তু অধিকাংশ আহকামের ভিত্তিই জন্নে গালিবের উপর। কেননা অধিকাংশ হাদীস খবরে ওয়াহিদ। যাদ্বারা প্রত্যয় গঠিত ইলম হাছিল হয়

য়া তবে সন্দেহের দিক বহুলাংশে হ্রাস থাকে। ইহাকেই পরিভাষায় জন্নে গালিব বলা হয়। আমলী আহকামের জন্য যদি ইয়াকিনী দলীলকে শর্ত করা হয় তবে নিসন্দেহে আমলের সীমারেখা সংকুচিত হয়ে যাবে।

যারা কিয়াসকে নাজায়েয বলেন তারা হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-সহ আরো অনেক সাহাবীর বিভিন্ন উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে দাবী করেন যে তারা কিয়াসকে অবৈধ মনে করতেন। মূলতঃ এসব উদ্ধৃতির অধিকাংশই সহীহ্ নয়। আর সহীহ্ মেনে নিলেও আমরা বলব যে, তারা বরতত্র কিয়াসকে নাজায়েয মনে করতেন অর্থাৎ যে সব কিয়াসে ইজতিহাদ ও কিয়াসের আবশ্যকীয় শর্তাবলী পালিত হয় না সে গুলোর উপরই তারা নাজায়েযের ফতোয়া জারী করেছেন এবং নিন্দাবাদ জানিয়েছেন। নতুবা শর্ত মাফিক ইজতিহাদ ও কিয়াসকে তাঁরা অবৈধ বলেননি। আর তাই যদি হবে, তাহলে তারা নিজেরা কখনো ইজতিহাদ করতেন না। অথচ তাদের ইজতিহাদ ও কিয়াস নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। আমরা পূর্বে যার উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করেছি। উপরন্তু রাসূলে পাক (সাঃ) হযরত মাআয (রাঃ)-এর ইজতিহাদ সম্পর্কীয় জবাব পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেছিলেন। আর শুকরিয়া জ্ঞাপন বা আনন্দ প্রকাশ কেবল বৈধই নয় বরং উৎকৃষ্টতর বিষয়ের জন্যেই হয়ে থাকে।

সুতরাং ইহাই সহীহ্ জবাব যে, যে সকল সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে এ দাবী করা হয়েছে যে তারা কিয়াস পছন্দ করতেন না এবং এর সত্যায়নের জন্য তাদের বিভিন্ন উক্তি ও বাণী নকল করা হয়েছে। মূলতঃ এসব নির্ভর-যোগ্য সনদে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং "ইহা তাদের উক্তি" এ দাবীই সহীহ্ নয়। তবে তুলনামূলক সহীহ্ ও শক্তিশালী সনদে যেসব উক্তি বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের জবাব হল যে, তারা আকায়েদী বিষয়ে কিয়াস ও ইজতিহাদকে অবৈধ মনে করতেন। কর্মগত মাসআলায় নয়। অথবা তারা ঐ কিয়াসের নিন্দা করেছেন যা শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করে যেমন হযরত আলী (রাঃ) এর উক্তি এদিকে ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন, দীন যদি যুক্তি নির্ভর হত তাহলে মোজার উপর মাস্হ না করে তার তল-দেশে মাস্হ করার নির্দেশ দেয়া হত। সুতরাং যে কোন যুক্তি ও কিয়াস শরীয়তের খেলাফ দিক নির্দেশ করে তা অবশ্যই বর্জনীয়। যেমন আল্লাহ-

তা'আলা যখন ইবলিশকে নির্দেশ দিলেন যে আদমকে সিজদা কর। তখন সে কিয়াস করল যে, "নিয়ম হল যে অধম উত্তমকে সিজদা করবে। আদম মাটির তৈরী আর আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা। সে অনুসারে আমি আদম থেকে উত্তম। অতএব আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।" এখানে ইবলিশের কিয়াস সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের খেলাফ এবং খোলাখুলি আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচারণ ছিল। তাই সে আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত কুড়িয়েছে এমনিভাবে যে কোন শরীয়ত বিরোধী কিয়াস ও ইজতিহাদ পরিত্যাজ্য ও লানত যোগ্য। এ সম্পর্কেই হযরত উমর (রাঃ) বলেন, সুন্নতের দুশমনদের থেকে তোমরা সাবধান হও। যারা সুন্নতের বর্তমানে তার মুখালিফ কিয়াস করে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের মন থেকে সুন্নতকে ভুলিয়ে দেন।

অথবা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কোন বিষয়ে শরীয়তের মূল উৎস কুর-আন হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা অবস্থায় সেখানে কিয়াসকে নাজায়েয বলেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমে যে বিষয়কে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম করেছেন সেখানে তোমরা কিয়াস করতে প্রবৃত্ত হয়ো না। কেননা এর ফলে তোমরা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিবর্তিত করে ফেলবে। এমনিভাবে যে সব কিয়াস স্বীয় প্রবৃত্তি চাহিদানুসারে সংগঠিত হয়। সে সব থেকেও সাহাবায়ে কিরাম উম্মতকে সতর্কিত করেছেন। কুরআনে করীমে এ কথাই ইরশাদ হয়েছে : ولا تكن للخائنين خصيما আর খেয়ানতকারীর পক্ষে ওকালতী করো না।

সবশেষে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে মুজাহিদগণের কিয়াস ও ইজতিহাদের ফলে যেসব ইখতিলাফ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে তার সব-গুলোই শরীয়তের শাখাগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। নতুবা মৌলিক বিষয়ে তারা সকলেই একমত। আর এই ইখতিলাফ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যোগ্য ও বুদ্ধি বিবেচনা তথা মানসিকতার তারতম্যের ফলে শাখাগত বিষয়ে কখনও ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। এ জন্যেই তাতে ইত্তিফাক সাধিত হয়নি। উপরন্তু এ সব ইখতিলাফ উম্মতের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধার দুয়ার উম্মোচন করে দিয়েছে। কেননা বিশেষ ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতানুসারে এক মাযহাবের ইমাম অন্য মাযহাবের মাসআলা হিসাবে ফতোয়া দিতে পারে। তাইতো প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন : اختلاف امتى رحمة 'আমার উম্মতের ইখতিলাফ রহমত স্বরূপ।'

ইফাবা/৮৮-৮৯-প্র/৪১২১—৩২৫০/১-৭-১৯৮৮/১০১৫